মধুসূদন

[অন্তর্জীবন ও প্রতিভা]

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোপালদাস চৌধুরী অধ্যাপক'স্বরূপে
১৯২১ সালে গ্রন্থকারপ্রদত্ত বক্তৃতা]

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

বি, সি, ধর এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য ১৷৹
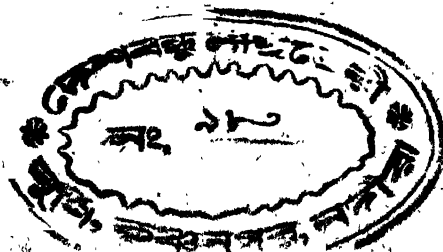
প্রকাশক—
শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি এল
৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
১২।১, চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বঙ্গভাষা

ও

বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় পঞ্জিকায়

যাঁহার নাম অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে,

বাঙ্গালী জাতির সারস্বত যজ্ঞের

প্রধান ঋত্বিক্

সেই

স্বনাম-সমুজ্জ্বল

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি

মহোদয়ের করকমলে

বঙ্গবাণীর সেবক কর্ত্তৃক

নবজাবনপ্রাপ্ত নব্যবঙ্গসাহিত্যের আদিকবির

অন্তর্জ্জীবন ও প্রতিভাধারণার

এই

অকিঞ্চন গ্রন্থ প্রযত্নে

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়

নিদর্শনরূপে

সমর্পিত

হইল

পূর্ব্বভাষ

কবির জীবনী লেখক সাধারণতঃ তাঁহার বহির্জীবনের অবস্থা এবং ঘটনাবিন্যাসের দিকেই মুখ্যভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিককে কবির অন্তর্জীবনটিই মুখ্যভাবে চিন্তা করিয়া চলিতে হয়। বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ও শিকড়ের বিস্তার করিয়া বহিঃপ্রকৃতির আলোক বায়ু রস এবং মৃত্তিকার সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধ স্থাপনে আপন জীবিকা অর্জন করে; কালক্রমে নবনবভাবে শাখাপত্র ফল পর্ণ বৃক্ষদেহের মধ্যেই অপরূপে সম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং সারাংশটুকুই তাহার বংশধারায় সংসারে দীর্ঘকালের জন্য রাখিয়া যায়। তেমনি, কবিগণও জীবনের বহির্মুখী প্রণালী হইতে নিজের ভাবাত্মা-রূপী সারাংশটুকু বঞ্চিত করেন এবং উহাকেই সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের চূড়ান্ত বিত্ত এবং প্রাপ্তিরূপে রাখিয়া যান। সাহিত্যজগতের পক্ষে কবির এই ভাবময় অন্তর্দেহ এবং বাণীক্ষেত্রে উহার উপাদানটুকুই মুখ্য বিষয়। কবি মধুসূদনের এই ভাবময় সূক্ষ্মশরীরটাই বঙ্গসাহিত্যের অমর পদার্থ; সুতরাং আমরা কবির মর্ম্মকায়াকে ধারণা করার উদ্দেশ্যেই অবহিত হইব। বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রকটিত হইয়া, সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ অবস্থার মধ্য দিয়া যেই 'ব্যক্তি' আপনার সারাংশ বর্দ্ধিত করিয়া চলিয়াছিলেন, তিনি স্বরচিত কাব্যাবলীর মধ্যে স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে অনুস্যূত করিয়া বাঙ্গালীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দ্দশপদী' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির মধ্যে, উহাদের অন্তর্গত এবং অতীত ভাবেও কবি মধুসূদন দাঁড়াইয়া আছেন—উক্ত ব্যক্তিটিকেই বাঙ্গালীর প্রকৃত দরকার।

ফলতঃ, এ আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হইবে—যেমন কবির ব্যক্তিত্বের তেমন ওই ব্যক্তিত্ব হইতে অনুপ্রাণিত তাঁহার কাব্যসমূহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি। গ্রন্থের সমস্ত ভাষা ও ভাব-পরিব্যক্তির চরিত্র মধ্যে, উহার বাহ্যিক ও আন্তরিক আকার এবং চারিত্রের লক্ষীভূত কেন্দ্রটুকুর মধ্যেই যেমন গ্রন্থের, তেমন কবিরও ব্যক্তিত্ব! এ স্থলে যেমন গ্রন্থের, তেমন কবির অন্তরাত্মার স্পর্শও অনুভব করা যায়। অতএব আলোচনায় মধুসূদন রূপী 'ব্যক্তি'কে তাঁহার সাংসারিক জীবনের ঘটনাগতি, শিক্ষা, এবং অদৃষ্টনিয়তির বিবর্ত্তফল স্বরূপে দৃষ্টি করিতেই চেষ্টা হইবে। যে নিয়তি বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালীজাতির অদৃষ্টকেও নিয়মিত করিতেছেন, মধুসূদনের সাংসারিকজীবনে এবং কবিজীবনে সেই নিয়তির প্রকৃতি এবং স্বরূপ চিন্তা করিতেই সুতরাং চেষ্টা হইবে। কবি মধুসূদন এবং তাঁহার শিল্পকার্য্যকেও বিশ্বপ্রকৃতির একটা সার্থক কার্য্যফল-রূপে ধারণা করিলেই প্রকৃত সত্যের ধারণা হইতে পারে, এবং উক্ত ফলের সাহায্যে তাঁহার প্রতিভা, কবিত্বসিদ্ধি এবং কবি-জীবনের প্রকৃতিও নিরূপিত হইতে পারে।

সুতরাং, আমাদের মূল প্রণালী হইবে, মধুসূদনের শিল্পকার্য্যের 'উত্তম-অধম' বলিয়া রায় প্রকাশ নহে, উহাকে সম্যক্ গ্রহণ। কোন Judgment নহে Interpretation। কোন বাঁধা গৎ বা স্থিরনিশ্চল শাস্ত্রশাসনের তুলাদণ্ডে তুলিয়া উহার 'ভালমন্দ'ত্বের ধারণা এবং পরিমাপ নহে; উহাকে তাঁহার অন্তর্জ্জীবন ও প্রতিভার একটা সবিশেষ বিবর্ত্তফল রূপেই ধারণা—উহার স্বরূপ ধারণা।

আমরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠকের প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে, তাহারা জানিতে চায়, সমালোচক বলিবেন 'কে শ্রেষ্ঠকবি'। 'পরের মুখে ঝাল খাইতে' চেষ্টা করিয়া পাঠকগণ এইরূপে

সমালোচকের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহে। সাহিত্যপ্রবেশের গোড়াতেই প্রত্যেক তত্ত্বপ্রয়াসী পাঠককে এইরূপ প্রশ্ন-প্রবৃত্তি হইতে আদৌ সতর্ক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এ প্রশ্নের প্রকৃত কোন সদুত্তর নাই। এ ক্ষেত্রে উত্তর মাত্রেই বক্তার স্বকীয় "রুচি" মাত্র প্রকাশ করিবে বলিয়াই উহার সদুত্তর নাই। এই হতভাগ্য প্রবৃত্তিকে 'যত পারাযায়' কশাঘাত করিয়াই চলিতে হয়। সকল প্রকৃত কবিই নিজ নিজ বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ'। 'সেকস্‌পীয়ার শ্রেষ্ঠ কবি', এ কথা মুখস্থ করিয়া কোন বালক যদি ইংরেজী সাহিত্যের মিল্‌টন ওয়ার্ডসোয়ার্থ শেলী কীটস বা ব্রাউনীংকে কোণায় ঠেলিয়া রাখে, তদপেক্ষা ভ্রান্তি এবং দুর্ভাগ্যের কথা আর হইতে পারে না। বুঝিতে হইবে, কর্ম্মফলের মোটামুটি ওজনের ক্ষেত্রেই হয়ত সেকসপীয়রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা যায়—কিন্তু সাহিত্যে, সর্ব্বপ্রকার ওজনের বেলাতেই, সংখ্যার বৃহত্ত্ব অপেক্ষা বরং গুণগত বিশিষ্টতা এবং তল্লভতাই মহার্ঘ জিনিষ। তাঁহারা যে প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে, যেমন সেকসপীয়র হইতে তেমন পরস্পর হইতেও স্বতন্ত্র এবং বড়! প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধ 'ব্যক্তি' বলিয়া, একের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা অপরের নহে আমাদের বঙ্গদেশের 'বড়' কবিগণের বিষয়েও এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে পাঠক মধু-হেম-নবীন-রবীন্দ্রের একজনকে বাদ দিল, সে চিরকালের জন্য ভাব এবং চিন্তার বিশেষ বিশেষ দিকে দরিদ্রই থাকিয়া গেল! তাহার দারিদ্র্য অপনয়ন করিবে কাহারও সাধ্য নাই! 'বড় কবি' মাত্রেই যে কোন-একটা দুর্লভ এবং বিশিষ্ট গুণেই 'বড়'—ইহা সকল সাহিত্য-প্রবেশের গোড়ার কথা। উক্ত বিশিষ্টতার উপলব্ধি এবং উহার সঙ্গে সহানুভূতি সিদ্ধিই যেমন সমালোচকের, তেমন পাঠকের সাধনা। এই আদর্শ গতিকে আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার

একটা অভিনব প্রণালী প্রচলিত হইতেছে। অতএব উক্ত প্রণালীতে মধুসূদনকে ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শক্ষেত্রে ও দেশ-কাল সম্পর্কের পরিবেশে আনিয়া সংস্থাপণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করাই বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্য হইবে।

কবির এই 'ব্যক্তিত্ব' ধারণার প্রণালী কি? বলিতে হইবে কি, যে উহা অন্তর্দৃষ্টির প্রণালী? সাহিত্য মনুষ্যের 'মানসী সৃষ্টি' বলিয়া, কবির দিক হইতে মানসিক তন্ময়তা ব্যতীত যেমন সাহিত্যের 'সৃষ্টি' হয় না, তেমন মনস্তত্বে সমাহিত বুদ্ধি এবং সহানুভূতি ব্যতীত সাহিত্যের প্রকৃত উপলব্ধি এবং সমালোচনাও হয় না। কবি এবং সমালোচক উভয়ের পক্ষেই অন্তর্দ্দর্শন অপরিহার্য্য। সমালোচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি-শক্তির কার্য্যও নিতান্ত সামান্য নহে। মনের দুইটি প্রধান ব্যাপার—সংশ্লেষণে, সমীকরণে এবং একীকরণে সৃষ্টি; বিশ্লেষণে, ব্যবকলনে এবং ব্যাখ্যাপনেই সমালোচনা। দূরদৃষ্টি এবং অদৃষ্ট বিভাবনী মনঃশক্তির পরিচালনা ব্যতীত প্রকৃত ব্যাখ্যাও দাঁড়ায় না। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, অন্তর্দ্দর্শনের প্রণালীতেই মধুসূদনের অন্তর্জ্জীবন ও প্রতিভা আলোচিত হইবে এবং উহাকে ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের পূর্ব্বাপর আদর্শ-পরিবেশে স্থাপনপূর্ব্বক উহার বিশিষ্টতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই চেষ্টা হইবে।

প্রাগুক্তরূপে আমরা, নব্য-বাঙ্গালার আদি কবি মধুসূদনের অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার প্রতিভার যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার কাব্যাদির যাহা প্রকৃত মূল্য, তাঁহার কবি-কার্য্য মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও সভ্যতার এবং বঙ্গসাহিত্যের সযত্নরক্ষণীয় ভাণ্ডারে যাহা প্রকৃত অনশ্বর

পদার্থ, কোনরূপ অতিশয়োক্তি বিনা, তাহাই ধারণা করার চেষ্টা করিব।

বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন নানাদিকেই 'আদিকবি', নূতন পথের প্রদর্শক এবং পূজ্যপদবীতে অধিরূঢ় গুরুস্থানীয়। সুতরাং, মধুসূদনকে বুঝিতে পারিলে, পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের মূলপ্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিকেও নানাদিকে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা প্রসঙ্গাধীন স্থানে স্থানে উহার সূত্র নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া চলিতে পারিব এবং উক্ত সূত্রে বঙ্গে 'পাশ্চাত্য-সাহিত্য' আদর্শের আদি প্রবর্ত্তনার ইতিহাসও নানাদিকে নির্দ্দেশিত হইয়া যাইবে।

এরূপ আদর্শে আমরা পূর্ব্বে 'বঙ্গবাণী' পত্রে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। মধুসূদনকে তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠ এবং বিস্তারিত ভাবে দৃষ্টি করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম প্রভৃতি লেখকগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা রহিল। ঐ সকল পূর্ব্বগামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মধুসূদনের জীবন বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ কবির নিজের ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের চিঠি পত্রই এ আলোচনায় আমাদের প্রধান সহায় হইবে। এবং যাঁহার বঙ্গসাহিত্য-প্রীতি ও বদান্যতার গুণে আমরা আলোচনার জন্য এই অপূর্ব্ব অবসর লাভ করিয়াছি, সেই গোপালদাস চৌধুরী মহোদয়ের নামটিও এতৎসম্পর্কে স্মরণীয় হইয়া রহিল।

পরিশেষে, প্রস্তাবিত বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার পরস্পর সহযোগ, সহানুভূতি এবং সহচিত্ততা আমন্ত্রিত করিয়া এতদ্দেশের সেই চিরাগত সংকল্প মন্ত্রটিই পাঠ করিব—

"সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ চিত্তং করবাবহৈ"।

প্রসঙ্গ সূচী

ও প্রয়োগ রীতি—নাট্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলন—কবির প্রয়োগ শক্তির গুণ ও দোষ—পদ্মাবতী নাটক—গ্রীক ভাব, বস্তু ও আবহাওয়া—গ্রীক ও ভারতীয় অদৃষ্টবাদের সম্মিলন—এরূপ দেবাধিপত্য-বাদী নাটকের প্রধান দোষ—ভাষায় বর্ণ-বৈচিত্র ও ভাবুকতায় বাহ্যিক চাক্‌চিক্য—অমিত্রচ্ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনা।

৫। বঙ্গে নবরীতির রোমান্টিক কাব্য ও তিলোত্তমা সম্ভব—ভাব বস্তু ও ছন্দের ক্ষেত্রে 'উন্নতি' তন্ত্রীর প্রচণ্ড বিদ্রোহ-সুর—যুগপৎ বিভিন্ন-ধর্ম্মী গ্রন্থ রচনা—"একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"—তিলোত্তমা সম্ভব সৌন্দর্য্য-বাদী রোমান্টিক আদর্শের আদি কাব্য—উহার অন্তস্তত্ত্ব—বঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দ ও উহার শক্তি—কবির সচেতন আদর্শ সাধনা ও মেঘনাদ—মধুসূদনে গ্রীক সাহিত্য-শিল্পতার আদর্শ—মেঘনাদ বধ ও উহার রচনাপথে সঙ্কট—সহানুভূতির বিঘটনা—রাবণ চরিত্রে ও বিজিত রাক্ষস পক্ষে সহানুভূতি—বাল্মীকির মর্ম্ম এবং আদর্শের সহিত মেঘনাদের মৌলিক পার্থক্য—মেঘনাদে শিল্পতা আদর্শ—আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের নির্ম্মল এবং দুর্লভ শিল্পি-চেতনা।

✓৬। মধুসূদন বঙ্গে ইয়োরোপীয় ভাব-জাগরণের আদি কবি—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের রীতি—মধুসূদনে ভারতীয় ও গ্রীক 'ক্লাসিক সাহিত্যের এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক 'রোমান্টিক' সাহিত্যের আদর্শ সঙ্গম—বঙ্গে কাব্যের ছন্দ ও ভাষার পরিব্যক্তি বিষয়ে প্রথম পাশ্চাত্য প্রভাব—গদ্যের রীতি ও পরিব্যক্তি মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব—কাব্যের কায়া বা গঠনরীতি বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব—কাব্যের আত্মা এবং পরিচালন তত্ত্ববিষয়ে ও পাশ্চাত্য (গ্রীক) প্রভাব—গ্রীক 'দেবযন্ত্র' ও অদৃষ্টবাদ—ভারতীয় 'অদৃষ্ট' ও 'তপস্যা'বাদের সঙ্গে উহার পার্থক্য—

মেঘনাদের শিল্পতা নিষ্পত্তির প্রাণস্বরূপ 'অদৃষ্টবাদ—রাবণ চরিত্রের রহস্যময় করুণ লক্ষণ—শিল্পের ক্ষেত্রে করুণরসের সার্থক প্রয়োগ—আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে মেঘনাদ 'গ্রীক' আদর্শের অতুলনীয় কাব্যশিল্প—উহার বিষয়ে ৬০ বৎসর যাবৎ সমালোচকগণের পরিব্যাপক ভ্রম—উহা কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক 'লেওকুন'—শিল্পক্ষেত্রে করুণরস প্রয়োগের শক্তি—মেঘনাদকাব্যে কারুণ্যপ্রয়োগের অতুলনীয় সফলতা—প্রমীলা চরিত্র ও আধুনিক ভাবকতার ক্ষেত্রে প্রেমিকের সহমরণ পান। পৃ: ১০২ — প: ১৩৭

৭। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য—বঙ্গসাহিত্যে 'ওড'রীতির অবতারণা—রোমান্টিক আদর্শের 'গীতি' কবিতার ও 'প্রেম'-কবিতার অবতারণা—'বীরাঙ্গনা' কাব্যের রীতি—উভয়কাব্যের নাটকত্ব-শক্তি—প্রকৃত 'বৈষ্ণব' ও 'ভাক্তবৈষ্ণব' আদর্শের 'প্রেম'কবিতা—বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যে শেষোক্তের প্রাবল্য—বিনেশাসের পর হইতে 'প্রেম' কবিতা ও উহার অহমিকা 'রীতি'—অহম্মুখ রীতি ও সহানুভূতির সূত্রে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'—বঙ্গে সনেট কবিতার অবতারণা—কবির অকপট বাঙ্গালিত্ব ও সার্ব্বজনীন শিল্পতাসিদ্ধি—মধুসূদনের খণ্ডকবিতায় স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের ব্যাহতি এবং উহার হেতু—কৃষ্ণকুমারী নাটক—করুণান্ত নাটকের আদর্শ ও ভারতীয় সাহিত্যতন্ত্রে উহার স্থান—'অমঙ্গল্য' নাটক বলিয়া উহার অভিনয়ে প্রতিষেধ ও তাহার ফল—কৃষ্ণকুমারীর প্রয়োগ রীতি—হাস্যরস ও রোমান্টিক ভাবুকতা বিষয়ে সংযম—বঙ্গভাষার স্থায়ী প্রবণতার দিকে লক্ষ্য—কৃষ্ণকুমারীর প্রতিষেধে কবিজীবনে স্বল্পকম্প—কবিজীবনের দুর্ব্বোধ্য চাঞ্চল্য নিয়তি—মধুর আস্বাদন, সহৃদয়তা, পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যচর্য্যার 'যজ্ঞ'-আদর্শ প্রভৃতির সঙ্গে উক্তরূপ স্থিতি-চাঞ্চল্যের আপাততঃ অসামঞ্জস্য। পৃ: ১৩৮ — ১৭০

১৮। মধুসূদনে দুইটি ব্যক্তি—উভয়ের সহযোগিতায় উপরেই তাঁহার কবিজীবন ও কবিকৃত্যের সাফল্য—সারস্বত জীবনের অহমিকা তত্ত্বের আধুনিক নামই ‘আত্মাদর’—উহা হারাইয়াই কবির অধঃপতন—মধুসূদনে কবিত্বের ‘বালক’ লক্ষণ ও ‘শাক্ত’ভাব—খণ্ডকবিতার ক্ষেত্রেও ভাবসংযত ক্লাসিক আদর্শ—উদ্ভাবনী শক্তি ও সামঞ্জস্য-সিদ্ধ ভাবুকতার কৌলীন্য—বস্তুতান্ত্রিক ট্রেজিডির আদর্শ, ভারতীয় আদর্শে উচ্চতম ট্রেজিডী কি হইবে?—ভারতীয় ট্রেজিডী রচনায় মধুসূদনের যোগ্যতা—দার্শনিকতাকে ঘৃণা। কবিতা ও শিল্পক্ষেত্রে সহজ ভাব-সংযোগের গুণে দার্শনিকতার ফল সিদ্ধি—অশেষ গ্রন্থ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সরসমধুর নবীনতার লক্ষণ—শিল্পের ক্ষেত্রে মধুসূদনের ‘বাঙ্গালী’ ব্যক্তিত্ব—প্রাচীন গ্রীক ব্যক্তিত্বের সমধর্ম্মী বাঙ্গালী ‘শাক্ত’ লক্ষণ—ছন্দোরীতি অবলম্বনে পরিস্ফুট উক্ত ব্যক্তিত্বের জন্মপরিচয়, নিশোদার মাহাত্ম্য—বঙ্গ সাহিত্যে উহার অমর পদবী।
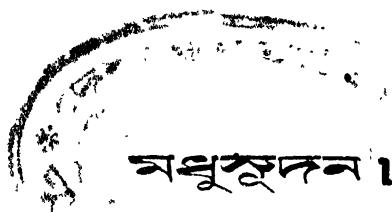
মধুসূদন।

১

কবি মধুসূদনের জীবন! এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে প্রথমেই বলিতে হয়, কবিগণের জীবন প্রায়ই কোন বাহ্যিক ঘটনার প্রাবল্যে কিংবা মাহাত্ম্যে চিত্ত আকর্ষণ করিবার দাবী করিতে পারে না। যাঁহারা ভাব জগতের অধিবাসী, ভাবই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উপজীব্য এবং যাঁহারা ভাবুকতার শক্তি দেখাইয়াই জগৎকে আকৃষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্জীবনটির দিকেই মানুষের প্রধান দৃষ্টি! মানুষ উহাই জানিতে চায়। কোন্ কাব্য কবিজীবনের কোন্ অবস্থায় রচিত হইয়াছে, আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কবি কাব্যের কোন্ উপকরণটী পাইয়াছেন, তাঁহার সত্যজীবনের সঙ্গে কাব্যটীর কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি? তাঁহার কাব্য কিরূপে শূন্যের গর্ভেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, জমাট হইয়া উঠিল, ভাবরসে কিরূপে প্রাণলাভ করিল, কিরূপে স্থিতি লাভ করিল? মনুষ্য সমাজের ইহা চিরকালের কুতূহল। দুঃখের বিষয়, উহা সকল সময় চরিতার্থ হইতে পারে না। কারণ কবিগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের সামসাময়িক সংসারে নগণ্য ব্যক্তি; কবি বলিয়া পরিচিত হইবার অথবা সম্মান লাভ করিবার পূর্ব্বে সংসারের লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইবার কোন হেতু অনেক স্থানেই থাকে না! যে জীবন যুদ্ধে নগণ্য, যে সমাজমধ্যে কোনরূপে একটা কোলাহল তুলিবার জন্য শক্তিহীন, কার এমন দায় পড়িয়াছে যে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। অজ্ঞাতভবিষ্যতের কাছে

আসবে ভাবিয়া ঐ অজ্ঞাত নামা মনুষ্যের মনোভাব বিজ্ঞাপক কথাবার্ত্তা গুলি টুকিয়া রাখে! কোনও একদিন মহার্ঘসত্যের দেশেই আলোক পাত করিবে স্থির করিয়া তাহার চিঠিপত্র গুলিও যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে! সমাজে এইরূপ ঘটনা অনেক স্থানেই সম্ভবপর হয়না। উহার ফলে, জগতের মহাকবিগণের জীবন এবং মনের গতি বিষয়ে আমাদের সত্যজ্ঞান এতই সামান্য! এমন যে সেক্সপীয়র, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ বলিয়া পৃথিবী আজ মনে করিতেছে, ইংলণ্ডবাসী যাহার নাম লইয়া আজ গৌরব করিতেছে—'তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত একেবারে শূন্য. বলিলে অত্যুক্তিহয়না। এলিজাবেথ যুগের অনেক বড় ছোট, অনেক অজ্ঞাতনামা, বিস্মৃতনামা ব্যক্তির ইতিকথায় সম-সাময়িক বাণীভাণ্ডার পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে ব্যক্তিটি ছিলেন তিনি এত বৃহৎভাবে সকলের সমস্তের সঙ্গে এত মিশিয়া চলিতেছিলেন যে মানুষ তাহার সীমা পরিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে একটা ব্যক্তি বলিয়াই ঠাওরাইতে পারে নাই, তাহাকে অভিনিবেশযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য পদার্থ বলিয়াই মনে করিতে পারে নাই। তাহার সহযোগিগণ—তাহার বন্ধুগণ, তথাকথিত অনুগ্রাহক এবং মুরব্বিগন, যাঁহারা এখন তাঁহার নাম-সম্পর্কের জোরেই ইতিহাসে নামস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারাও এই লোকটাকে এমনভাবে চিনিতে পারেন নাই যে তাঁহার বিষয়ে দুটিকথা লিখিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করেন! সকল প্রাচীন কবির বিষয়েই এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। আমাদের কালিদাসের বিষয়েই বা আমরা কি এবং কতটুকু সংবাদ রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছি! অথচ কালিদাস ত তৎকালের একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতিসভার নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন! সাহিত্যসেবীর প্রকৃতজীবনী রচিত হইবার উপযোগী সম্ভাবনাই সমাজে নাই।

কেবল, আধুনিক কালের গোঠেই সাহিত্যজগতের এই অভাব বুঝিয়া স্বয়ং কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোঠের উন্নত সামাজিক পদবী এবং প্রতিষ্ঠা গতিকেই হউক, কিংবা ভক্তিশীল সহৃদ্বন্ধুর সংঘটনা গতিকেই হউক, গোঠের সাহিত্যজীবনী এবং সাহিত্যিক মতিগতি বিষয়ে আমরা অনেক সংবাদ পাইতেছি! অন্ততঃ একজন সাহিত্যসাধকের মানসিক গতিরেখা এবং সাহিত্যকর্ম্মের ধারা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। গোঠের পর হইতেই সাহিত্যজগতে কবিজীবনী রচনা এবং কাব্যবিচার করার এক নব পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে! একে ত জগতের স্রষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে একরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়াই পরস্পর হইতে নিবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন—মানুষকে পরস্পরের অন্তর্য্যামী হইবার স্বত্ব ভগবান্ দেন নাই। যাহার সঙ্গে ইহজীবনের জন্য দুশ্ছেদ্য বন্ধনেই বাঁধা পড়িয়াছি, চিরজীবনের সঙ্গী বলিয়াই যাহাকে বুঝিতে এবং পাইতে চাই, খাওয়া-পরা চলায় এবং সুখ দুঃখে যে আমার নিত্যবন্ধু তাহার বিষয়েই যে চিরকালের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আছি! এই ঘোর অন্ধকারেই যে চলিতে হইতেছে! ইহা ত ইহজীবনের নির্ব্বাসন দণ্ড! সুতরাং বাহিরের বিষয়ে, সুদূরস্থ কিংবা অনাত্মীয়ের বিষয়ে আর কথা কি? আত্মীয় শব্দটাই ত একটা ভুল! মনুষ্য জীবনের এই সত্যনিত্য অন্ধকারকে স্বীকার করিয়াই চলিতে হয়! তবে, মানুষ একটা আত্মাবান্ পদার্থ, তাই আত্মার বিষয়ই তাহার প্রধান খাদ্য! এই জন্য ভাব ও চিন্তা তাহার অন্তরের আহার —ভাবুকতায় তাহার আনন্দ; মানুষের অন্তর্জীবনের বিষয় জানিয়াই তাহারি পরম তৃপ্তি! মানুষ যতই শিক্ষা এবং উন্নতি লাভ করে, যতই তাহার মন সমর্থ হয়, ততই তাহার আত্মার ক্ষুধা বাড়িয়া যায়, ততই সে

বাহিরের আত্মা পদার্থকে বুঝিতে এবং আপনার করিতে চায়! তাই কাব্য পাঠে মানুষের আনন্দ! কবিগণ নিজের অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে পরের ভোগযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; আপনার ভাবনা এবং চিন্তাগুলিকে জগতের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারেন; তাই কাব্য উপাদেয়। কিন্তু কাব্যপাঠের প্রকৃত রস-বোধ বলিয়া যে জিনিষ উহা সঙ্গে সঙ্গে কবিকে জানিতে পারিলে যেমনটি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না! কবি সরল, কেন না সরলতা ব্যতীত প্রকৃত কবিতা হয় না। যে কবি সরলভাবে নিজের হৃদয়ের কম্পনগুলি ভাষার মুখে এবং ছন্দের স্পন্দনের মধ্যদিয়া আমার বুকে লাগাইতে পারিলেন না, তাঁহার কবিতা চিরকাল আমার নিকট মরার মতই পড়িয়া থাকিবে। যাহার কথা আমার 'কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্পর্শ' করিল, তাহাকে এই অন্ধকারে একজন সঙ্গীর মত, একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই পাইয়া বসিলাম! তাহার বিষয়ে, তাহার কাব্যকবিতার উৎপত্তি এবং মর্ম্ম বিষয়ে, তাঁহার নিজের কথাগুলি শুনিতে এ জন্য এতই আনন্দ। উহার দরুণ আধুনিক সাহিত্যজগতে একটা বাড়াবাড়িই জমিয়া বসিয়াছে। কবিগণের সংসারজীবনের অতি সামান্য চিঠিপত্র, এমন কি বাজারের হিসাব পর্য্যন্ত মানুষ মহার্ঘ বোধে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া দিতেছে। কি জানি, যদি উহাতেও কবির প্রতিভা বুঝিবার সাহায্য হয়; আত্মীয়টিকে আর একটু নিকট ভাবে আত্মীয় করা যায়! ফলে, কবির চিঠি পত্র, কবির সামান্য আলাপ প্রলাপের বিবৃতি, তাঁহার বিষয়ে বন্ধু-বান্ধবের সামান্য মাত্র স্মৃতি—এ সমস্ত অতি যত্নে সংগৃহীত এবং রক্ষিত হইতে চলিয়াছে! এ সমস্ত হইতে যে সকল সময়ে লাভ উদ্বৃত্ত হয়, কবির বিষয়ে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান, বা ভক্তি বাড়াইয়া দিতে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাও নহে। তবু, সত্য! মানুষ সত্য

জানিতে চায়! এবং কবি ও কাব্যের বিষয়ে সত্য জানিতে হইলে, কবির নিজের কথা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাহার আলাপ ব্যবহার ও চিঠিপত্র ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে ঘনিষ্ঠতর প্রমাণ লাভ সম্ভবপর নহে! ঐ সমস্তে, কবি আপনাকে অন্ততঃ যাহা বলিয়া দেখাইতে চাহেন, তাহাই মিলিবে। কবির আপন মুখের কথা হইতেই তাঁহাকে বুঝিবার সাহায্য পাইব। কাব্যের মধ্যে কবি আমাদের সঙ্গে একরূপ প্রকাশ্য ভাবেই 'লুকোচুরী' খেলিয়া থাকেন! কোথাও বা ইষারায় আত্মপ্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই আড়ালে চলিয়া যান! মানুষের হৃদয় শিশুর মতই এরূপ লুকোচুরি ভালবাসে বলিয়া উহাও কবিতার একটি রস। পাঠকের কুতূহল জাগাইয়া, পাঠককে নিজের তরফ হইতে খুঁজিয়া বাহির করার অধিকারটি দেয় বলিয়াই পাঠক উহাতে আনন্দ পায়। এখন, মনে করুন, এই প্রসঙ্গের শিরোনামার কবি আমাদের সঙ্গে সেইরূপ লুকোচুরী খেলিতেছেন! তাহার কাব্যের মধ্যে তিনি 'গা ঢাকা' দিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের যে মূর্ত্তিগুলি আমাদের সম্মুখে 'হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাইয়া' চলিয়াছে উহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত লুকাইয়া হাসিতেছেন! উহাদের প্রত্যেকের নড়াচড়া এবং জীবন অভিনয়ের পশ্চাতে কবির উদ্দেশ্য এবং কৌশলের কলকব্জা ও বিপুল সাজসরঞ্জাম আছে। আমরা আপাততঃ তাহার কিছুই দেখিতেছি না, কিন্তু ঐ সমস্ত যে আছে তাহাতেত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! সুতরাং, মধুসূদনের 'কাব্য প্রতিভা' কিংবা 'নাট্য প্রতিভা' বলিতে ঐরূপ একটা 'পর্দ্দার আড়ালের' পদার্থই বুঝায়! প্রতিভার কার্য্য ফল ত আমরা দেখিতেছি। ঐ ফল কেন আমাদের নিকট মিষ্ট লাগিতেছে তাহা বুঝিতে গেলে যেমন একরকম 'প্রতিভা পরিচয়' হয়; তেমন ঐ ফল কোন্ কৌশলে, কি উপাদানে, কোন্ শক্তির প্রভাবে এমনটি হইল

তাহাও অন্যরূপ 'প্রতিভা পরিচয়'। বলা বাহুল্য, ফলটির বিষয় ইহাতেই সমস্ত দিকে শেষ হয় না; উহাকে বিচার করার আরও নানা প্রকার দিক আছে। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতি বর্ত্তমান আছে, ততদিন দেশে ও কালে নানা রুচির লোক আসিয়া মধুসূদনের দিকে দৃষ্টি করিবে; ওই ফলের রস গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন কথা বলিয়া যাইবে। তথাপি কিন্তু, ফলটির সমস্তটা বলার ভিতরেই আসিবে না। কারণ উহা একটা স্বভাবতরুর ফল!

স্বভাবের ফল বলিলে অনেক কথা বলা হয়—এবং বলার বাহিরেও অসীম একটা অবকাশ থাকিয়া যায়! এবং সমস্তটাই ঐ কথাটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত। গোলাপ একটা 'স্বভাবের ফল', 'সূর্য্যোদয়' একটা স্বভাবের প্রকাশ। বাল্যশিক্ষায় পড়িয়াছিলাম 'রূপসী উষা'! যে গুণে রূপসী উষা এতকালেও বৃদ্ধা হইলেন না, বা 'গোলাপ ফুল' বিরস হইয়া গেল না, তাহার নাম দিতে পারি 'স্বভাবের গুণ'। ঐ গুণেই মধুসূদনরূপী সূর্য্যোদয় কখনও পুরাণ হইবে না, মধুরূপী 'গোলাপ ফুল' কখনও বিরস হইবে না! চিরকাল মানুষ আসিবে—উহাকে আপন চক্ষে দেখিয়া, আপনার মনে উহাকে গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইবে, উহাকে দেখার এবং বোঝার কোনরূপ লেখাজোঁখা এবং অবধি থাকিবে না।

আমরা মধুসূদনকে অন্যকার প্রসঙ্গে, অন্যকার অবসরে কোনদিক হইতে কি পরিমাণে দেখিতে পারি? তাহার প্রতিভাকে বুঝিতে পারি? নিজের চোখেই দেখা উচিত; এবং কবি-দর্শনে কোনরূপ চশমা চোখে করিয়া যাওয়া আদবেই ভাল নহে। প্রত্যেক কবিরই একটা অলিখিত দাবী এই যে, "তুমি নিজের কোন শাস্ত্র অথবা নিজের কোনরূপ ওজন কাঠির বাহাদুরী লইয়া আমার সমক্ষে আসিও না।' কেন না, উহাতে বঞ্চিত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। প্রকৃত কবি মাত্রেই

তোমার পক্ষে কোন নূতন ভাবে, তোমার অজ্ঞানা এমন কি অনির্ব্বচনীয় কোন গুণেই কবি। কেবল তোমার জানার ভিতরে থাকিলে তিনি কখনও বড় কবি নহেন। হয়ত তোমার আত্মাভিমান এবং বিরূপ ভাব হইতেই কবির সদর দরজা তোমার বিরুদ্ধে চিরকালের জন্য অর্গলিত থাকিয়া যাইবে! সাহিত্যের ক্ষেত্রে, পাঠকের দিক হইতে এই অবিচার, এই দুর্ব্যবহার একটা নিয়ত দুর্ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা চিন্তা করিবার পূর্ব্বেও আমাদিগকে জানিতে হয় যে, নাট্যপ্রতিভার বিকাশই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা জ্ঞাপক পদার্থ নহে। মধুসূদন বাঙ্গলা নাটকের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিতে দেবতার সম্পর্কে যাহা বুঝায়, মানুষের সম্পর্কে তাহা কদাপি বুঝায় না। কালিদাসের যক্ষ তাঁহার প্রিয়তমাকে বিধাতার 'আদ্যা সৃষ্টি' বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যময়ীর পদবীতে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছেন—"যা তত্র স্যাৎ যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ"। কিন্তু মানুষের আদ্যাসৃষ্টি বলিতে সৌন্দর্য্য কিংবা রসের ক্ষেত্রে শিল্পি-বিশেষের শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন বলিয়া ত কোন মতেই বুঝায় না, বরং প্রথম-সৃষ্টি বলিয়া শিল্পি-হস্তের ন্যূনতা, ক্ষীণতা, এবং বৈরূপ্যের লক্ষণগুলিই সঙ্কেতিত হইয়া পড়ে। ওই হিসাবে দৃষ্টি করিয়া, কালিদাসের বিপরীত দিক্ হইতে বরং বিধাতার কার্য্যের উপরেই কটাক্ষ করিয়া, কোন অধার্ম্মিক কবি একেবারে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" আদ্যাসৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ন্যূনতা দেখানটাই পাষণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল! সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের নাটক মধুসূদনের সৃষ্টি বলিতে মনুষ্য-ভাবে যাহা বুঝায় আমরা তাহাই বুঝিব। কিন্তু, মধুসূদন কবি; তাঁহার প্রত্যেক কথায়, কার্য্যে, চেষ্টায় এবং চিন্তায় কবি। আমরা দেখিব, জীবনের সহস্র পথে,

সুপথে অপথে কিম্বা বিপথে চলা সত্ত্বেও, এবং ওইরূপে চলার সময়েও মধুসূদনের কবি-বুদ্ধি এবং কবি বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। কম্পাসের কাঁটার ন্যায় মধুসূদনের মন এবং জীবন কখনও তাহাদের ওই উত্তরদিক্ ভোলে নাই। সুতরাং, কবি মধুসূদনকে না বুঝিয়া নাটককার মধুসূদনকে বুঝিতে যাওয়াও একটা অসম্ভব অলীক ব্যাপারের মতই দাঁড়াইবে।

মধুসূদন দত্ত নামক ব্যক্তি বহুদিন হইল জীব-রঙ্গ-ভূমি হইতে লীলা-সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-লিপি, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর পর যে স্বরূপে মনুষ্যের নিকট পরিচিত থাকিতে চাহিয়াছেন তাহার একটা বিবৃতি, তিনি নিজেই রাখিয়া যান। উহাই তাঁহার অন্তিম-শয্যার পরিচয় স্তম্ভে খোদিত আছে। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম উহাই দেখিতে হয়। ওই যে মানুষটি মহাশয়ন হইতে বলিতেছেন—

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি, শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

এই আহ্বান এবং বিবৃতির মধ্যে যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আছে তাহা কেবল সমাধিক্ষেত্রের পরিচিত আবহাওয়া বা জীবন নাট্যের চূড়ান্ত অবসানের সকরুণ দীর্ঘ নিশ্বাস নহে! চারিদিকের বিজাতীয় শ্মশান জনতা এবং বিজাতীয় ভাষার আবহাওয়ার মধ্যে অকস্মাৎ এক ব্যক্তি

কেবল বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীকে আহ্বান-পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছেন। যেন জীবনযুদ্ধব্যস্ত মনুষ্যের সময়ই বা কত যে তাহার জন্য দীর্ঘকাল ব্যয় করিতে পারে! যে কবি একদিন বিশ্ব ব্যাপিনী ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া Astound the world করিতে মহা দুরাশায় দম্ভ করিয়াছিলেন, তিনিই আজ জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রে কোমল সংযত এবং সঙ্গত হইয়া, কেবল ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের ভ্রাতৃগণকে বাঙ্গালা ভাষায় আহ্বান করিয়া পরিচয় করিতে চাহিতেছেন। কি বলিয়া? কেবল কবি বলিয়া! শ্রেষ্ঠ কবি, মহাকবি, গীতিকবি, অথবা নাট্য-কবিরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়া নহে—কেবল কবিরূপে!

কবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমাধি লিপিটী আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। মধুসূদন বঙ্গের উল্লিখিত প্রদেশে ও গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন; এবং কিঞ্চিদূন ৫০ বৎসর ধরিয়া জীবন-রঙ্গের অভিনেতা ছিলেন। সমাধি লিপিতে তারিখ দেওয়া কবি হয়ত আবশ্যক মনে করেন নাই, তিনি হয়ত নিজকে কালের সম্পর্ক-বিহীন কবিরূপে অথবা চিরকালের কবিরূপে পরিচিত করিতেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে, কবি মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় প্রার্থী আমরা, ওই তারিখটাই যত মূল্যবান, ততটা বোধ করি তাহার জীবনের অন্যকোন ঘটনাই নহে! জন্ম-মৃত্যুর তারিখ গুলিই অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে মধুসূদন নামক কবিটাকে অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের বীজরূপে সকল মাহাত্ম্যে বিশেষিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে! মধুসূদনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্য কি ছিল, মধুসূদন উহাকে কোন্ নূতন জিনিষ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে তারিখের মাহাত্ম্য অমূল্য। ভারতবর্ষ সন তারিখকে যেন চিরকাল তুচ্ছ

করিয়া আসিয়াছে। বুঝি, দেশ কালাতীত গুণটাকেই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছে, মানুষের জরামরণহীন ধর্ম্মটাকেই দৃষ্টি সমক্ষে প্রবল করিতে চাহিয়াছে। উহাতে একদিকে কি অন্যায় ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা এখনই বুঝিতে পারিতেছি। গত কল্যকার ভারতবর্ষ যুগ-যুগাতীতের ভারতবর্ষের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়া একেবারে একটী খিচুরীর পিণ্ড পাকাইয়া বসিয়া আছে! এখন ঐতিহাসিকের যত পরিশ্রম, শত শত পণ্ডিত লোকের জীবনান্তকর পরিশ্রমই কেবল একটী তারিখ বাহির করিতেই ব্যয়িত হইতেছে, তবু নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না। বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তিরোধানের সন তারিখ লইয়াই কত বিবাদ! অথচ উহা স্থির না করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয়ের, উহার ইতিবৃত্ত এবং অন্তরাত্মার প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রধান খুঁটিটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে মধুসূদনের জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ এমন একটী ঘটনাকে বেষ্টন করিতেছে, যাহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে সুতরাং অনেকদিকে বাঙ্গালা জাতির পক্ষেই একটা সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা।

মধুসূদনের চরিত্রে উত্তরাধিকার নিরূপণ করিতে গিয়া তাঁহার জীবনীলেখক বলিয়াছেন যে পিতা হইতে বিদ্যানুরাগ, সাহিত্য-প্রিয়তা, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, বদান্যতা ও বাকপটুতা প্রভৃতি সদ্গুণ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, মাতা হইতে পরদুঃখ-কাতরতা ও পরম প্রেম-প্রবণতা লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনচরিত্রের যাহা যাহা প্রধান দোষ—অসংযম, বিলাসিতা, আত্মশ্লাঘা ও অপরিমিতব্যয়িতা, তৎসমস্ত ও পৈতৃক-সূত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান উত্তরাধিকারতত্ত্বকে একটা নির্ম্মম নিদারুণ সত্যরূপেই উপস্থিত করিতেছে। অবশ্য, উহার বিপরীত মতের ও অভাব নাই! এই

বৈজ্ঞানিক আদর্শে মানুষের বংশধর যেমন তাহার ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তেমন তাহার ধর্ম্ম-বুদ্ধির এবং পাপ-বুদ্ধিরও রিক্‌থ-ভোগী হইয়া থাকে! যে পাপী এবং অপরাধীকে নব-সমাজ ঘৃণা করিতেছে, রাজাও যাহাকে নির্দ্দয়ভাবে শাসন করিতেছেন, সে হতভাগ্য কেবল নিজে দায়ী নহে, তাহার পিতৃ পিতামহও দায়ী! এই ভয়ানক সত্য ভবাচার মনুষ্যের পরিণয়েচ্ছা এবং বংশধর সন্তান সন্ততির আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করা উচিত! উহার ভিতর প্রাচীন সমাজের 'পাপের আদর্শ'টুকু অপরূপ সমর্থনা লাভ করিতেছে। খ্রীষ্টজাতির বাইবেলের Original sin এবং আমাদের 'পাপসম্ভবভাব' আদর্শ এ ক্ষেত্রে মিলিয়া গিয়াছে! সন্তানের পাপ কেবল পিতৃ-পিতামহে অর্শে, এবং পিতৃ-পিতামহকে অধোগামী করে বলিলে সকল কথা বলা হয় না, ঐ পাপের জন্য তাঁহারাও বহুপরিমাণে দায়ী। তাঁহারা কি ছিলেন তাহা সেকালে সমাজের দৃষ্টি এবং শাসন এড়াইয়া গেলেও একালে আসিয়াই ধরা পড়িল। তাঁহারা প্রত্যক্ষ শাসনের বহির্ভূত হইয়া গেলেও তাঁহাদের বংশধরের ভিতর দিয়াই সমাজের ঘৃণাদণ্ড লাভ করিতেছেন। কেবল অপরাধীর দ্বীপান্তর দণ্ড হইল এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণও সমাজের প্রীতি-স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতার রাজ্য হইতে ন্যূনাধিক দ্বীপান্তর দণ্ডই লাভ করিলেন! আমি যে সচ্চরিত্র এবং ভাল হইব কেবল আমার সুনাম এবং ধর্ম্ম রক্ষার্থে নহে—আমার অধস্তন অনন্ত পুরুষের সুখ-শান্তিই আমার দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে! আমার অধর্ম্ম-প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া আমার প্রিয়তম পুত্রই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে পারেন! মনুষ্য জীবনের কত বড় দায়িত্ব! এই নিদারুণ সত্য সংসারার্থী এবং 'পুন্নাম-নরক' হইতে উদ্ধারার্থী ব্যক্তি মাত্রের চিন্তনীয় হইয়া আছে। আমার সন্তান যে "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা

পাপসম্ভবঃ" বলিয়া দেবতার দয়া ভিক্ষা করিবে, মনুষ্য জীবনের সত্যগুপ্ত স্খলন এবং পাপতত্ত্বের অতিরিক্ত অন্য কোন পাপার্থ এবং পাপসঙ্কেত যেন ঐ প্রার্থনার মধ্যে না থাকে!

মধুসূদনের কবিত্বশক্তি কোথা হইতে আসিল তাহার সূত্র নির্দ্দেশ করিতে গিয়া জীবনী-লেখক বিপন্ন হইয়াছেন! তাঁহার এক পিতৃব্যের নাকি কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি ছিল, উহার উল্লেখ করিয়া কবির পিতামহ প্রপিতামহের মধ্যেও যে উহা গুপ্ত অবস্থায় ছিল তাহার সঙ্কেত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই; বিশেষতঃ ভারতবাসীর পক্ষে! মানুষের কত খানিই বা অন্যে দেখিতে পারে! আমি স্বয়ং নিজের মনুষ্যত্ব নামক পদার্থটীর কতটুকুই বা দৃষ্টিগত করিয়াছি? জড়বাদী আধুনিক জীববিজ্ঞান মানুষকে একেবারে কাঠ পাথরের ন্যায় এবং পুঁথির ন্যায় পড়িয়া উহার তুবাকাঙ্খা প্রচার করিয়াছে। বিজ্ঞানের এই চেষ্টাকে আমরা নিন্দা করি না। কেন না, উহার ঘোষণা এবং চেষ্টা হইতে বিপুল লাভ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ দেখিয়াছে, জীবের অধিকাংশই অদৃষ্ট। ভারতবর্ষও উত্তরাধিকার-তত্ত্ব মানে বটে; কিন্তু, উত্তরাধিকার বা পরিবেশ তত্ত্বকে সবজান্তা বলিয়াও স্বীকার করে না। বরং ওই অদৃষ্টকেই, বুঝিবার সুবিধার জন্য, একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র বলিতেছে যে, জীব ওইরূপ 'জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট' বশেই, জন্মগ্রহণ করিবার সময় নিজের স্বধর্ম্মীর ক্ষেত্রে বা পিতা মাতা ও দেশ কালের সমপরিবেষে আকৃষ্ট হয়; এবং জীবনপথে ওই অদৃষ্ট এবঞ্চ পুরুষকারের দ্বারাও পরিচালিত হইয়া থাকে। আমরা মনুষ্যকে একদিকে অদৃষ্টের ক্রীড়নক, অন্যদিকে পুরুষকার-শক্তিতে 'স্বয়ং খেলোয়াড়' বলিয়াই ধারণা করি।

বালক মধুসূদনের পরিবেষ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতে হয় তাঁহার জন্মভূমি, 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গ ভূমির' একটি গ্রাম এবং ওই গ্রামের তিনদিক বেষ্টন করিয়া কপোতাক্ষ প্রবাহিত হইতেছে। নিম্ন বঙ্গের সমস্ত নদ-নদীর ন্যায় কপোতাক্ষ বর্ষাকালের 'প্লাবন পীড়নে তীরপরিপ্লাবী প্রবল প্রবাহ', আবার উহাই সুদিনে শান্ত-স্নিগ্ধ, "দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।" কপোতাক্ষই বালকের চিত্তকে নিজের ভীমকান্ত মূর্ত্তিতে প্রবল আঘাত করিয়া সর্ব্ব প্রথম প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে জাগাইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। জাগাইবার জন্য উপযুক্ত শক্তি কেবল উহারই ছিল। "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পারে, সেও পরম সুখী।" ইহা কপোতাক্ষকে অতর্কিতে ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছে এবং ওই ব্যক্তিটির অন্তরাত্মার সহিত কবিচিত্তের আন্তরিক সহানুভূতিটুকুই জানাইতেছে। কবির চরিত্রের মধ্যে যে একটা অতি প্রবল প্রবাহশক্তি ছিল, কবির প্রতিভার মধ্যেও যে ভীমকান্ত গুণ উহাকে বিশেষিত করিয়াছে, তাহার আদিম সমধর্ম্মতা এবং সমভাবের গুরুশিষ্যতার দ্বারা যেন কপোতাক্ষকেই দেখাইয়া দিতেছে! অন্য দিকে, বঙ্গদেশের গ্রাম প্রকৃতি এবং নাগরিক জীবন-যুদ্ধের কোলাহল দূরে বঙ্গ সমাজের শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রাম্য ছবি মধুসূদনের অন্তরাত্মার কম সহানুভূতি লাভ করে নাই। "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না", ইহা 'জন্মভূমি'র দিকে কেবল মামুলি ধরণের প্যাট্রিয়টিজমের ভাবুকতা নহে। ইহার মূলেও সহানুভূতি। কবির হৃদয় বৃক্ষলতাদি নিসর্গশোভাময় এবং শান্ত জীবনযাত্রাময় সাগরদাঁড়ী গ্রাম নামক ব্যক্তিটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে সহানুভূতি করিতেছে! কবি হয়ত পরকালে এই কপোতাক্ষী এবং সাগরদাঁড়ী নামক দুই ব্যক্তিকে

একেবারে ভুলিয়া যাইবেন ; শৈশবের এই স্বভাব, এই সহমর্ম্মতা এবং বন্ধুতা কথায় এবং কার্য্যে হয়ত একেবারে অস্বীকার করিবেন, কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এই বন্ধুতা পরিহার করিতে কিম্বা এই শৈশব সুহৃদ্‌কে অতিক্রম করিতে তাঁহার সাধ্য নাই। শৈশবের স্বধর্ম্ম অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারি। উহারা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। উহারা স্বধর্ম্মের অদৃষ্টরূপেই তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতের অদৃষ্টরূপেও দাঁড়াইয়া গেল। অতঃপর 'খাইতে বসিতে চলিতে ফিরিতে' উহারা জীবনের গভীর এবং অজ্ঞাত তলদেশ হইতে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিয়াই উঁকি দিয়া যাইবে—বুঝাইয়া দিবে যে, উহারা নির্ব্বিঘ্নে, তাঁহার অজ্ঞাতে, তাঁহার অন্তঃপুরেই আপন রাজত্বে বসিয়া আছে। তিনি একটু অন্যমনা অথবা শূন্যচিত্ত হইলেই

> "They will flash upon the inward eye
> which is the bliss of solitude."

মধুসূদনের শৈশবের আর একটি বন্ধু ছিল—একটিই বলিব। কারণ, সংখ্যায় দুইটি হইলেও উহারা অন্তরাত্মায় এক। রামায়ণ ও মহাভারত—অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত। বঙ্গদেশে এই দুইটি গ্রন্থের কি আবার বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে? যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই দুইটি চিরবালক এবং চির-বৃদ্ধ গ্রন্থের সহিত, ভারতবর্ষবাসী এইদুইটী চির-পুরাতন এবং চির-নূতন ব্যক্তির সহিত শৈশবেই ভাবের বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারিল না তাহাকে হতভাগ্য বলিব! ভারতের মানুষের পক্ষে 'আমি কে' 'আমি কোথায় আছি' 'কোথায় চলিয়াছি'—বুঝাইয়া দিতে পারে, শিক্ষাকে একেবারে রক্তের মধ্যে চিরকালের জন্য মিশাইরা দিতে পারে, এমন নিত্য-মনোরম বন্ধু আর মিলিবে না। ভারতবর্ষের

মনুষ্যকে তাহার দেবগুরু-অতিথি, তাহার পিতামাতা, স্ত্রীপুরুষ, ভাই-ভগিনী, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, সংসার, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, তাহার ইহকালের ও পরকালের ধর্ম্ম চিনাইয়া দিতে পারে,—এক কথায় ভারতীয় সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে অতর্কিতে ওতপ্রোত করিয়াই তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে, এমন আর কোন্ বন্ধু? মধুসূদন ও সৌভাগ্যক্রমে শৈশবেই এই বন্ধুকে চিনিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, বালক মধুসূদন দিনরাত্রি রামায়ণের ও মহাভারতের সঙ্গেই মজিয়া থাকিতেন। পরে, স্বসমাজ ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, সুদূর মান্দ্রাজে গিয়াও কেবল রামায়ণ ও মহাভারত পাইবার জন্য বন্ধুর নিকটে কত কাকুতি-মিনতি? "সাহেব লোকের হাতে মহাভারত"! উত্তর হইয়াছিল,—"রামায়ণ মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে। না পড়িয়া থাকিতে পারি না।" এই 'কেমন ভাল লাগে'! চিন্তা করুন! শৈশবের বন্ধুতা একেবারে রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া, অন্তরাত্মার 'ক্ষুধার অন্ন এবং তৃষ্ণার জল' হইয়া গিয়াছে কি না, তাই সাহেবটি সজ্ঞানে স্বীকার না করিলেও তাহার "কেমন ভাল লাগে!"

কবির এই শৈশব বন্ধু-গুলির কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনাই ঘটিয়াছিল,—জীবনের আত্যন্ত সূত্রচ্ছেদ, সর্ব্বাভিভাবী বিপ্লব, ভূমি কম্পের মতই অধঃ-উর্দ্ধে উৎপাতকরী এবং প্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনা! এই মধুসূদন নামক ব্যক্তিটি তাহার জীবনাদৃষ্ট ও স্বভাবশিক্ষা, তাহার স্বদেশ স্ব-সমাজ এবং প্রকৃত স্বধর্ম্মকে একদিন পরম অহংকারে এবং অবিদ্যার বশে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে এবঞ্চ অস্বীকার করিতেও চাহিয়াছিল;—পারে নাই।

২

মধুসূদন একটি সম্ভ্রান্ত এবং সঙ্গতি-সম্পন্ন কায়স্থ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু-সমাজে সম্ভ্রম কেবল ধনের উপর নির্ভর করে না; হিন্দু সভ্যতা অতুলনীয়ভাবে ধন হইতে সম্ভ্রমকে পৃথগন্ন করিয়া, উহাকে আপন মাহাত্ম্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং, আবশ্যক পক্ষে ধন সম্ভ্রম দুইটাই উল্লেখ করিতে হয়।

উহা একটি শাক্ত পরিবার; এবং এই পরিবার গ্রামে দান-শীলতা এবং ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তার জন্যও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মধুসূদনের এক পিতৃব্য নাকি 'মহাপূজা' সমাধা করিয়া স্বকীয় বংশকে 'মহা গৌরবের' আসনেই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন! মহাপূজা অর্থাৎ একই সময়ে ১০৮ কালীদেবীর পূজা—"যাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টী মেষ ও ১০৮টী ছাগ বলি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং ১০৮টী স্বর্ণনির্ম্মিত জবা পুষ্পে অঞ্জলি অর্পিত হইয়াছিল।" গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ নাকি এখনও এই পূজার বিষয় সগৌরবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পাঠক দেখিবেন, এই উজ্জ্বল কীর্ত্তি-চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে একটা ঘন গাঢ় তামাসিকতার ছায়াই বিরাজ করিতেছে, এবং হিন্দু-সমাজের মন হাজার গৌরব-কীর্ত্তনের সময়েও এই তামসিক ছায়াটির কথা কদাপি বিস্মৃত হয় না। মধুসূদনও পরিবারের এই অপরূপ বিত্তবিলাসিতা এবং বদান্যতার বাতাসেই শিক্ষিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অর্থ-বিলাস মনুষ্যের অশন-বসনে এবং চলা-ফেরায় যে জাঁক-জমক আনয়ন করে, শৈশবশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়া উহা মধুসূদন নামক ব্যক্তির রক্তে মাংসে এবং অস্থি-মজ্জায় বসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার দানের মধ্যেও এই বিলাসিতা ছিল। গণনা করিয়া অর্থ-দান নামক ব্যাপারটী

ইহার আদৌ ছিল না। "এক মুষ্টি দুই মুষ্টিতে যাহা হাতে উঠিত তাহাই বিনা চিন্তায় দিয়া ফেলিতেন।" পরকালে নিদারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রের অবস্থাতেও এই কায়াবিধি সঙ্কুচিত হইতে জানে নাই। এই বালক পরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কত কাকুতি মিনতি করিয়া এক হস্তে ভিক্ষাই করিতেছে—অন্য দিকে নিজের সন্তান-দিগকে ইউরোপে রাখিয়া বহুব্যয়সাধ্য বিদ্যাদান করিবার চেষ্টাতেই আছে। এই দান! ভিক্ষা করিয়াও দান! আপনাকে একেবারে ফতুর করিয়াও দান! মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন এবং সাহিত্য কর্ম্মও এই অপরিমিত দানবিলাসের অন্যদিক বই নহে। রাজসিক যশোলোভ অবশ্যই উহাতে আছে। কিন্তু দান, মরিয়া মরিয়াও—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও দান—দেশবাসীকে জ্ঞান এবং আনন্দ দান! প্রাচীন কালের শিবির ন্যায় তিলে তিলে, ধীরে ধীরে, দুর্দ্দশা এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রত্যেক ঠোকরে ঠোকরে, বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি-পিপাসারূপী নির্দ্দয় নির্ম্মম শ্যেন পক্ষীকে আপনার দেহের রক্ত-মাংস এবং অস্থি মজ্জা দান! এইরূপ দানশীলতার মধ্যে অতুলনীয় রাজসিক শক্তি এবং সহিষ্ণুতার ভিত্তি আছে—উহাও হয়ত বিলাসিতার নামান্তর, কিন্তু মনুষ্য মধ্যে মহার্ঘ এবং লোকোত্তর এই বিলাস! সংসারে যে আপনার জন্মস্বত্বে এবং আপনার শক্তি মাহাত্ম্যেই লোকোত্তর, মানুষ যাহার সমক্ষে নতশির হওয়াটাই অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করে, যাহার অন্তরাত্মা আপনার ভাণ্ডার অশেষ এবং অফুরন্ত বলিয়াই জানে, মানবত্বের ক্ষেত্রে সেই রাজচক্রবর্ত্তী ব্যতীত এইরূপ দানশীলতা অপরে সম্ভব হয় না। ইহারা সংসার-রাজ্যের ভিখারী কিন্তু অধ্যাত্ম-রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী। এই বালক একদিন ওই কুলক্রমাগত প্রকৃতি এবং স্মৃতি অনুসারে—বলিতে পারেন, ওই

বংশ প্রকৃতির ন্যূনাধিক বাধ্য হইয়াই,—আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ পূর্ব্বক বঙ্গসরস্বতীর মহাপূজা সমাধা করিয়া গিয়াছে !

এই ঐশ্বর্য্য-বিলাস এবং দান-বিলাসের বংশবায়ু মধ্যে সংযম বলিয়া কোন প্রণালী মধুসূদনের শৈশবশিক্ষায় আসিতে পারে নাই। আমরা জানি, সংযমই ভারতীয় শিক্ষা এবং কর্ষণার মূলমন্ত্র। মনুষ্যের আদিম স্বাধীনতার অপর নামই বর্ব্বরতা। এই জান্তব স্বাধীনতাকে পরিবারের শিক্ষা-মন্দিরে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নানামুখী শিক্ষার অধীন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত করাই ভারতীয় কর্ষণ এবং শিক্ষ সভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবার ক্ষেত্রে মধুসূদনের সংযম শিক্ষার নানাদিকে অনটন ছিল বলিতে হয়। তাঁহার পিতা স্বয়ং একজন অসংযমরত শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই জানা যায়, সন্তানকেও কোন দিকে শৃঙ্খলাধীন করার দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসের স্মরণপত্রে দেখিতে পাই, তিনি স্বয়ং তাম্রকূট সেবন করিয়া আলবোলার নলটি কিশোর বয়স্ক পুত্রের দিকে উজাইয়া দিতেছেন এবং মধুসূদনও সাগ্রহে পিত্রাদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হইতেছেন। দেশপ্রথিত সদাচারের এইরূপ ব্যতিক্রমে বিস্ময়াবিষ্ট বন্ধুকে মধুসূদন আশ্বস্ত করিতেছেন, "আমার পিতা তোমাদের ঐ সমস্ত খুঁটিনাটি গ্রাহ্য করেন না।" গ্রাহ্য করেন না ! বিষয়টী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র টুকুনির ওজনেই বৃহতের ওজন হইয়া থাকে। উহাতেই বোঝা যায় যে, বিলাতী সভ্যতার বাহ্য প্রভাব, উহার বক্তৃতামুখর সাম্যবাদ এবং ইয়ং-বেঙ্গলের কিছুই-গ্রাহ্য-না-করার ভাবটি মধুসূদনের পিতৃ পরিবারেও কিছু কিছু প্রবেশ করিতেছিল। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ একান্তভাবে সংযমের উপরেই নির্ভর করে। উহা একটা সংঘ ; উহার মধ্যে পরস্পর প্রীতি-

মমতা হইতে একটা স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমন প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংযম এবং শিষ্টাচারের একটা বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণাতেই উহার প্রধান শক্তি! জনক জননী এবং পুত্র কন্যা, স্ত্রীপুরুষ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, শ্বশুর শাশুড়ী ও পুত্রবধূ, ভাসুর ভ্রাতৃবধূ, দেবর ভাজ প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে একটা প্রীতিভক্তিজনিত স্বাধীনতা এবং শিষ্টাচারের নিয়ন্ত্রণা থাকিলেই হিন্দুপরিবার দাঁড়াইতে পারে। নচেৎ এই ব্যক্তি-সংঘ, এই রক্ত-সম্পর্কিত এবং দেশবিদেশাগত জনসমষ্টির সমস্ত বন্ধন এবং সংমেলন এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বিলাতী 'স্বাধীনতার' আপাতমধুর চেহারায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা অতর্কিতে চলাফেরায় অসংযম এবং স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন করিয়াই এই সংঘকে ভাঙ্গিতেছি। যদি বিলাতীনিয়মে কেবল স্বামীস্ত্রীর জুড়ি লইয়াই এদেশের পরিবার দাঁড়াইয়া যাইত, এবং আমরাও সচেতন-ভাবে উহাকেই লক্ষ্য করিতাম, এবং সন্তান সন্ততির শিক্ষা ব্যাপারকেও বোর্ডিংএর হস্তে দিয়াই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত, তা' হইলে পরস্পর যথেচ্ছ ব্যবহারে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। বিলাতী সমাজে আমাদের পারিবারিক শিষ্টাচার বিধির জন্য কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু, আমরা নিজের অবস্থা এবং বিলাতী সমাজ ও পরিবারের সহিত আমাদের পার্থক্য না বুঝিয়াই যে অতর্কিতে আত্মহত্যা করিতেছি!

হিন্দুর 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠান যেই সংযম এবং প্রেম-শিক্ষাকে লক্ষ্য করে তাহার সমাধান মধুসূদনের চরিত্রে ঘটিতে পারে নাই! হিন্দুর পরিবারতন্ত্র মনুষ্যের পক্ষে স্নেহ-প্রীতি-শিক্ষার একটা মহাবিদ্যালয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এই শিক্ষা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তাহাকে জীবনের পরীক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিশ্বমুখ কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। পরিবারে অত্যধিক আত্মম্ভরতার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন

অবকাশই নাই। মানুষ জান্তব ধর্মবশে, তাহার স্বভাববশেই আত্মম্ভর। এ ক্ষেত্রে তাহার কোন দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই, তাহার শরীর-ধাতুই এই দীক্ষা লইয়া উৎপত্তি লাভ করে। self preservation বা আত্মরক্ষা আদিম 'প্রাণ ধর্ম', যেমন জীবে তেমন উদ্ভিজ্জেও উহা আত্মম্ভরতা রূপেই প্রকাশ পাইতেছে। পরিবার মনুষ্যকে এই আত্মম্ভরতা সংযত করিতে শিক্ষা দেয় এবং উহার নামই প্রেম শিক্ষা। কথাটিকে এ স্থলে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। কারণ, আমাদের দেশে এই বিষয়ে সাহিত্যে, সমাজে এবং ধর্মে এত বুদ্ধি-বিভ্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, আমরা নিজের অবস্থা সচেতনভাবে বুঝিয়াছি বলিয়াও কোন মতেই মনে হয় না; পরন্তু, পরকেও নিজের সম্পর্কে আনিয়া যেন ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। পারিবারিক এই শিক্ষা কেবল 'পরকে আপনার করা' বলিলে উহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় না। পরের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করা, আপনাকে হারাইয়া ফেলা, অহংমুখতার বিলোপ পথেই বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হওয়া। এই আত্মপ্রসার কেবল আপনার অধিকার বিস্তার বা আত্মপ্রতিষ্ঠা নহে—আত্মবিলোপ। ক্ষুদ্র আমিত্বের বিলোপ পথেই ভূমা আমিত্বকে লাভ। উহার মন্ত্র my will be done নহে, thy will be done. হিন্দু পরিবারে এই শিক্ষার আরম্ভ হয়। মধুসূদন প্রচলিতকথায় অত্যন্ত 'প্রেমিক' ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন—"মধুসূদনের আত্মন্ত সমস্তই মধু, উঁহার ভিতরে এক বিন্দু তিক্ত ছিল না।" তাঁহার মতন অমায়িক ব্যক্তি দুর্লভ, তিনি একেবারে 'প্রাণমনে' ভালবাসিতে জানিতেন। কিন্তু, তবু তিনি ভারতীয় আদর্শের 'প্রেমিক' ছিলেন না। তিনি পরকে আপনার করিতে জানিতেন; আত্মপ্রসার এবং পরের উপর আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। মানুষ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অধীন হইয়া

নিয়তিমাতার সেই শুভ ইচ্ছাটি হয়ত সহজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু, উহা যে প্রবলভাবেই পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং সভ্যতার হৃদয়ঙ্গম পদার্থ, উহা যে একটা Titanic element, ভারতীয় আদর্শে একটা আসুরিক ভাব, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতেই হইবে। এবং হয়ত আরও কিছু কাল পরে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে ধর্ম্মে উহার শুভাশুভ ফল মিলাইয়া লইবার সময়ও আসিবে।

পাশ্চাত্য সমাজে প্রেম পূর্ব্বক পরিণয় প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই ঐ সমাজে যুবকযুবতীর প্রেমমাত্রকেই ন্যূনাধিক উপার্জ্জনধর্ম্মী হইতে হয়—প্রত্যেককে প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াই জীবনের সঙ্গী অর্জ্জন করিতে হয়। আমাদের সমাজে পরিণয়ের পরেই প্রেমের অবকাশ ঘটে বলিয়া উহা একটা সাধনা রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহকে একটা ধর্ম্ম-সংস্কাররূপে পরিণত করিয়া মানুষের পক্ষে পরিবার এবং সমাজজীবনকেই একটা ন্যূনাধিক আত্মবিলোপের সাধনারূপেই দাঁড় করান হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে, গৃহ্যসূত্রের যুগ হইতেই ভারতীয় কর্ষণার এই সূত্র। উহার গতিকে উভয় সমাজের প্রেম বিষয়ক ধারণা এবং প্রেমের আদর্শ-বিষয়ক সংস্কার নানা দিকে ব্যবহিত হইয়া গিয়াছে। উহার গতিকেই উপার্জ্জনধর্ম্মী প্রেম বা টাইটানিক প্রেমের স্তব শোনা মাত্র এ দেশের সহৃদয় মাত্রেই অতর্কিতে উদ্বেগ অনুভব করিতে থাকেন। কোন পরিদৃশ্যমান কারণ নাই, তথাপি উদ্বেগ! এরূপ স্থলে একটু তলাইয়া দেখিলেই কারণটি দেখা যায়। একদিন কোন বন্ধু এতদ্দেশের কোন প্রথিতযশা 'প্রেমের কবির' গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। আমরা একটু অত্যুক্তি করিয়াই বলিলাম, "তাঁহার মধ্যে কিন্তু 'ভারতীয় প্রেম' নাই"। "কি বলিতেছ, এতবড় 'প্রেমের কবি, যে চিরজীবন প্রেমের কবিতা রচনা করিয়া বাণী

ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল, সে প্রেম জানে না।” আমরা হাসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথার পুনরুক্তি করিলাম “বাদশাহজাদী প্রেম জানে না”। তিনি আমাদিগকে শাসাইয়া গেলেন, “আচ্ছা, আগামী কল্যই আমি একশত প্রেম কবিতার দৃষ্টান্ত লইয়া আসিতেছি।” পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া তিনি একেবারে শুষ্কমুখে বিমনা হইয়া বসিয়া গেলেন। “তাই ত, এটা একটা নূতন কথা বটে।” আমরা বুঝিলাম, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন, দৃষ্টান্ত একেবারে মিলে নাই তাহা নহে, তবে, আমাদের মতই একটা অত্যুক্তি করিতেছেন। কিন্তু এই অত্যুক্তির পনের আনা সত্য। আসল কথা, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য প্রেমের গানে ভরপুর হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রেমের কথা উহাতে কদাচিৎ মিলে, অধিকাংশই আত্মতুষ্টিবিলাস, অহমিকা বিলাস এবং সৌন্দর্য্য-বিলাসের উচ্ছ্বাস বই নহে। সমস্তই ‘পূজা পাওয়ার ইচ্ছা’—‘পূজা করার ভাব বা ইচ্ছা’ নাই বলিলেই হয়। অনেকের বলিবার ভঙ্গীটাই এমন যে, উহার নিশ্বাসেই যেন অহমিকার শরবিদ্ধ করিয়া অন্তরাত্মায় নিদারুণ বেদনা জাগাইতে থাকে। মনুষ্যের অন্তরাত্মার ভয়ানক কুসঙ্গী! ইহার জন্য অবশ্য কোন কবিকে দোষী করা যায় না। বিশেষতঃ, কাব্যে কবির অন্তরাত্মার ছবি সরলভাবে প্রতিফলিত হওয়া, সাহিত্য মাত্রেই জাতীয় অন্তরাত্মার ছায়াবহ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের যাহা প্রকৃতি, কবির ভাবুক আত্মার যাহা প্রকৃতি তাহাই হয়ত এইরূপে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। তবে, পাঠকমাত্রকেই এ সমস্ত পূর্ব্বাপর জ্ঞানসহকারে এবং সতর্কভাবে গ্রহণ করিতে হয়। আদর্শের পূর্ব্বাপর ধারণা করিতে বসিলেও আমাদিগকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবির কথাটিই মনে রাখিতে হয়—প্রেম এবং কামের পার্থক্য কোথায়?

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নাম তার কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেম তার নাম।"

মধুসূদনের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা বিকাশের বিচারস্থলে আমরা প্রতিপদে নানা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের উত্থাপনে ধীরে ধীরে চলিতে বাধ্য হইতেছি। মধুসূদন নব্যবঙ্গের বড় কবি। এখনও বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্লোকে তাঁহারই ঔরসজাত টাইটানিক ভাবের রাজত্বই চলিতেছে, সম্ভবতঃ আরও বহুকাল চলিবে। সুতরাং এই বিস্তারশীল প্রতিভার প্রকৃতি এবং প্রণালী আলোচনা হইতে যদি আমাদের আত্মদর্শনের সুবিধা না হয়, তবে সে আলোচনায় ফল কি? কেবল ঘটনার বিবৃতিই কবিজীবনীর প্রকৃত আলোচনা নহে। অনেক সাধারণ লোকের জীবনেই মধু-জীবনী অপেক্ষা অনেক বিচিত্র ঘটনা লক্ষ হইতে পারিত।

ভারতবর্ষীয় সংযম অথবা প্রেম শিক্ষায় মধুসূদনের অনটন দেখা গেলেও এবং উক্ত অভাবের গতিকে এই শক্তিমান্ পুরুষের সমগ্র জীবন দুঃখময় হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, অন্ততঃ একদিকে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ এবং অসীম আত্মসংযমের দৃষ্টান্তে মনুষ্যমাত্রকে বিস্মিত হইতে হইবে। উহা তাঁহার সারস্বতী বৃত্তি বা বিদ্যানুরাগ। সকলেই জানেন, বিদ্যানুরাগ একটা জড়তা-বিজয়ী মহাভাব। উহার সহিত জড়তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই বলিয়াই উহা মানুষের মনন জীবন বা মনোজীবন বৃদ্ধি করে, তাহাকে প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' দান করে। সূর্য্যের যেমন আলোক, আগুনের যেমন দাহিকাশক্তি, তেমন বিদ্যানুরাগ ও মধু-আত্মার একটা নিত্যগুণরূপে উপক্রান্ত হইয়াছিল। এই মানুষটি আর সমস্তই ভুলিতে পারিত, জীবনের সহস্র অপথে বা বিপথে একেবারে ভোলা হইয়াই মাতিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সরস্বতীর পদ-সূত্রটুকু কখনও

ছাড়িতে পারিত না। এ স্থলেই মানুষটির 'মহাপুরুষ' লক্ষণ—এ স্থলেই মধুসূদন অসাধারণ—এ স্থলেই তিনি ভবভূতির "লোকোত্তর জীব" বা দেবযোনি। এই দৈব গুণেই তিনি 'অমৃতের পুত্র'—স্বয়ং অমৃত পিপাসী, এবং বঙ্গ সাহিত্যে অমৃতের নবগঙ্গা আনয়নরূপ অমৃত কর্ম্মের ভগীরথ। এই গুণকেই হিন্দু 'জন্মান্তরীয় তপস্যালব্ধ অদৃষ্ট'রূপে পূজা করিবে। মনে করুন, মধুসূদন নামক গৃহের সমস্ত দ্বার এই পৃথিবীর আলোক বিদ্যুতে চিরকাল রুদ্ধ আছে, কিন্তু উহার খোলা আছে একটিমাত্র জানালা! এমন ভাবে খোলা আছে যে, ঐই পথেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ছবি প্রবেশ পূর্ব্বক উহার অন্তরতম মর্ম্মপ্রকোষ্ঠে পর্য্যাপ্ত ভাবের আদানপ্রদান চালাইতে পারিতেছে। আর কি চাই? এ স্থানেই এই রহস্যময় চরিত্রের সকল মাহাত্ম্যের চাবী পাওয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে তাহার ধারণা কি ছিল? 'যাহা একজন মানুষ করিতে পারিয়াছে, তাহা অন্যজন মানুষ নিশ্চয় পারিবে।' রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রে দেখিবেন, তাঁহার মর্ম্ম মন্ত্র ছিল "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্।" আশ্চর্য্য রহস্যের কথা? যে মধুসূদন সৌখিন পুরুষ, শরীরের শতসহস্র সুখ সুবিধা-সোয়াস্তির খোরাক যোগাইতে যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে একেবারে মত্ত হইয়া আছে বলিয়াই দেখা যাইতেছে, যে মানুষ মুখ্যভাবে শরীরের সোয়াস্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে—"মাসিক অন্ততঃ চারিটি হাজার টাকা না হইলে একজন ভদ্রলোকের কি করিয়া চলে?" তাহারই জীবনের গুপ্তমন্ত্র হইল কি না, "শরীরং বা পাতয়েয়ম্"। বিপরীতের অপরূপ সমাবেশ! এ স্থানেই কালিদাসের "অলোকসামান্য এবং অচিন্ত্যহেতুক" মহাত্ম চরিত্র, ভবভূতির "বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি মৃদু" লোকোত্তর চরিত্র।

এই বিদ্যানুরাগটিই মধুচরিত্রে একটা সর্ব্বনিয়ামক মহাভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ফলে কবিকে বঙ্গসাহিত্যের অমৃতলোকে লইয়া গিয়াছে! উহার মূলতত্ত্ব ছিল, মননপথে বিশ্ব সংসারকে গ্রহণ! সংসারে, যে দেশে কিম্বা যে ভাষায় মানুষ বৃহতের এবং মহতের সাধনা করিয়া তাহার বিবরণ এবং অনুভবের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, মধুসূদন দত্ত তৎসমস্তই নিজের মন দিয়া অধিকার করিয়া লইবে! উহা যে তাহারই পৈত্রিক সম্পত্তি! সে সমস্ত পৈত্রিক বিত্তের সন্ধান লইয়া ভোগ দখল করিবে! তাহার উত্তরাধিকার স্বত্ব কে অস্বীকার করিতে পারে? এই অধিকারস্পৃহার মূল শক্তি কি তাহাও আমরা সঙ্কেত করিয়াছি। মধুসূদন কৃপণ ছিলেন না, কেবল সঞ্চয়, সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয় করা, যাহা অনেক স্থলেই শুষ্ক পাণ্ডিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, যে কারণে জ্ঞানের সঞ্চয়ধর্ম্মই পণ্ডিত ব্যক্তির একটা প্রবল রিপু হইয়া উঠে, তাহা মধুসূদনের ছিল না। তিনি স্বভাবেই দাতা ছিলেন—মহাদাতা! সমগ্র বঙ্গদেশকে আমার উপার্জ্জনভাগী করিব, আমার উপার্জ্জন-গৌরবে বঙ্গের সরস্বতীকে বিশ্বের পূজনীয় করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে রাজটীকা পরাইয়া দিব, ইহাই ছিল মধুসূদনের সকল বিদ্যানুরাগের গৌণমুখ্য লক্ষ্য!

রচিব মধুচক্র, গৌরজন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!

ইহা ক্ষত্রিয়রীতির পাণ্ডিত্য-যজ্ঞ! ইহা জীবনে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান! এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভুবন জয় করিয়া আনিয়া সর্ব্বস্বই দক্ষিণা করিতে হয়; কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর এবং জন্ম-স্বত্বে রাজচক্রবর্ত্তী ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠান সমাধা পূর্ব্বক স্বয়ং ভিখারী সাজিবার স্বত্ব এবং যোগ্যতা রাখে!

মধুসূদন তের বৎসর বয়সে গ্রামের বিদ্যালয় হইতে দেশের রাজধানীর 'মহা বিদ্যালয়' হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার জীবন দেবতাই যেন পিতাকে সুমতি দিয়া মধুসূদনকে এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম্য বালকের সংকীর্ণ শিক্ষাপথ হইতে 'পৃথিবীর অধিবাসী' হইবার প্রশস্ত রাজবর্ত্মে লইয়া আসিলেন। এ সুযোগ আমাদের অনেকের অদৃষ্টেই হয়ত বিধাতা ঘটাইতেছেন, কিন্তু কয়জনে সুযোগের সমস্ত সুফল চয়ন করিতে পারিতেছি? মধু পারিয়াছিল। কবির অন্তরাত্মার খোরাকের জন্য যাহাযাহা দরকার, পরকালে 'নব্য বঙ্গের মহাকবির' মূর্ত্তি গঠন করিতে যে সমস্ত উপাদান অপরিহার্য্য ছিল, মধুসূদন ঠিক সে সমস্তই চুম্বকের মত আকর্ষণপূর্ব্বক বড় হইতে লাগিলেন। হিন্দুকলেজে তৎকালের শিক্ষাগুরু সমস্তও বিধাতা মধুগঠনের উপযোগী করিয়াই ঘটনা করিয়াছিলেন। একজন প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধনামা ডিরোজিও, যিনি কবিত্ব শক্তিতে "ইউরেশীয় বায়রন' বলিয়াই প্রথিত হন এবং বায়রণের মতই অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া যান। ডিরোজিও বিশ্বাস করিতেন, মানুষ একটা মননশীল মহাশক্তি, সুতরাং মনোদ্বারে সমগ্র জগৎকে অধিকার করাই হইল মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। মনুষ্যের সমস্ত মনোবৃত্তি বিকাশিত করিয়া উহাকে বিশ্বের উপযুক্ত গ্রাহক এবং অধিপতি করিয়া তোলাই হইল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যুক্তিই হইল মনুষ্যের দৃষ্টি; সুতরাং যুক্তি দ্বারা পরিবার সমাজ এবং ধর্ম্মের সমস্ত কার্য্যাকার্য্য তুলাইয়া মূলাইয়া এবং যাচাই করিয়া—পরের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া—স্বাধীনভাবে চলাই হইল মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। এই 'বুদ্ধি' আদর্শের বশীভূত হইয়া ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেও স্বাধীন মনো-বৃত্তির বিকাশ উদ্দেশ্য করিতেন; স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আচার ব্যব-

হারের পরিপোষণই লক্ষ্য করিতেন। 'মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠা'ই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। অপর এক শিক্ষক রিচার্ডসন্। তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল 'সৌন্দর্য্য'। মানুষ এ পর্য্যন্ত সমাজে 'সাহিত্যে ধর্ম্মে যাহাবাহা করিয়া আপনার 'মনুষ্যত্ব' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, পশুত্ব অথবা বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার উদ্বর্ত্তন পথে মানুষ যাহার সাহায্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, যে দেবতা মনুষ্যনামক জন্তুর দেহকে দেবমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন তাঁহারই নাম হইল 'সৌন্দর্য্য বুদ্ধি'। তিনিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্মী, মনুষ্যের সঙ্গীত সাহিত্য চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য তাঁহারই চরণতলাশ্রিত পঙ্কজদল। উহারা মনুষ্যের আনন্দপূজার 'পঞ্চপ্রদীপ'। এই পঞ্চপ্রদীপ ধারণেই মানবাত্মা সত্যশিবসুন্দরের পূজাতে আরাত্রিক করিতেছে। এইরূপ একটা আদর্শই নিঃসন্দেহে রিচার্ডসনের মনে ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেন, থিয়েটারের টিকিটখানি হাতে দিয়া শিষ্যদের বলিতেন "আশা করি তুমি আজ থিয়েটারে যাইতেছ"। কি ডিরোজিও কি রিচার্ডসন্, উভয়ের মধ্যেই একটা টাইটানিক প্রচণ্ডতা ছিল। কথায় কার্য্যে সংযম কাহাকে বলে তাঁহারা জানিতেন না। গুরুদ্বয়ের এই অসংযত সংবেগ এবং উদ্দাম গতির আদর্শ, এই আসুরিক প্রচণ্ডতার আদর্শ-রস যে নিদাঘের দাহ-তৃষ্ণাতুর ভূমির মতই যুবকশিষ্যগণ পরম উৎসাহে পান করিতে থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? উহার ফলেই ভারতবিশ্রুত 'ইয়ং বেঙ্গল'এর উৎপত্তি, বঙ্গের সমাজ ইতিহাসে যাঁহাদের 'চণ্ড মুণ্ড'দল বলিয়া নামকরণ হইতে পারে। বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে তখন একটা Storm and Stress বা 'ঝড় তুফানের যুগ'ই মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল। এই ঝড়তুফান বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম্ম সমস্তকেই একবার প্রবলভাবে নাড়া দিয়া গিয়াছে। উহার জের এখন যাবৎ অন্ততঃ বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে চলিতেছে। এই ঝড়তুফানের কথা.

যাহা সমসাময়িক ব্যক্তিগণ এবং ন্যূনাধিক 'ভুক্তভোগী' গণের লেখনী মুখেই অপরূপ বর্ণনা লাভ পূর্ব্বক প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য হইয়া আছে, তাহা লইয়া আমাদের সময়ক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিতে হয় যে, মধুসূদন ও কতকটা সময়স্রোতে পড়িয়া এবং কতকটা আপন প্রাণের জ্বালাপূর্ণ সহানুভূতির বাধ্য হইয়াই একজন চণ্ড মুণ্ড' হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আমাদিগকে বুঝিতে হয়, কি ডিরোজিও কি বিচার্ডসন্, ইহাদের কেহ যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি বা দুর্ব্বৃত্ততার বশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, উহা প্রধানতঃ ইংলণ্ডেরই শিক্ষা-প্রণালী। আমাদের দেশের ন্যায় ছাত্র-দমন বা বালকদলন বলিয়া এক পদার্থ ইংলণ্ডে নাই বলিলেও চলে। সেখানে শিক্ষকগণ ছাত্রদের বন্ধু ব্যতীত আর কিছুই নহেন, এবং বন্ধুতার আসন হইতেই তাঁহাদিগকে শিক্ষকতা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন ছাত্রগণ পরিবারের ভবিষ্যৎজীবিকার আশাস্তম্ভরূপেই শিক্ষালয়ে যায়, এবং সন্ততি কোনদিকে মচকাইয়া উঠিলে একটা সংসারই ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা থাকে, ইংলণ্ডে সেরূপ নহে। ঐ দেশের পিতামাতা সন্তান হইতে কোনরূপ ভবিষ্যৎ সাহায্যের আশা রাখা দূরে থাকুক, শিক্ষালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত বয়সলাভের পর হইতে সন্তানকে পরিবারতন্ত্র হইতে একরূপ বহিস্কৃত বলিয়াই ধরিয়া লয়। তাহারা চায়, সন্তান উপযুক্ত হইয়া সংসারে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা করুক এবং পারে ত স্বয়ং স্বতন্ত্র পরিবারের কর্ত্তা হউক। তাহাকে একদিন একাকী হইয়া, একেবারে অসহায় অবস্থিত হইয়াই ইহসংসারের ঝড়-ঝাঁপ্টা সহ্য করিতে হইবে; এই ঝড়েই নিজের নৌকাটি চালাইতে হইবে, সুতরাং তাহার ভাবীজীবনের বিষয়ে সে-ই দায়ী।

এই দায়িত্বজ্ঞান লাভের জন্য ছাত্রকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সমূহে একরূপ 'ডোর কাটিয়া'ই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর শাসনের কিছুমাত্র কড়াকড়ি নাই। ইংরেজ বালকগণ যেরূপ স্বেচ্ছাপথগামী, যে ভাবে একে অন্যের নাক ভাঙ্গিয়া দেয়, শিক্ষালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও যে ভাবে ছাত্রগণের ওই সমস্ত দোষের দিকে 'চোক বুজিয়াই' চলিয়া যান, তাহা বাস্তবিকই আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। অকস্‌ফোর্ড এবং কেম্ব্রিজেও ছাত্রদের জন্য নীতি শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম-আচারের একটা বাহ্য আবরণ আছে মাত্র, ওই আবরু রক্ষা করিয়া ছাত্রেরা যথেচ্ছ ভাবেই আচরণ করে। আমাদের আদর্শের 'ভাল ছেলে' যে সেখানে একেবারে নাই, এমন নহে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া আদর্শটি অধিকস্থানে কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেই দেখা যাইবে! দুর্ব্বৃত্ততা এবং অনাচারের জন্যই ইয়োরোপের ছাত্রজীবন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সকল দিকেই উহাদিগকে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী এবং প্রচণ্ড হইবার জন্যই যেন স্বাধীনতা দেওয়া হয়! কেবল সমাজ জীবনে বা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিলেই লোক যুবকদের নিকট হইতে সভ্যতা-ভব্যতার প্রত্যাশা করে। এই সমস্তের কারণও যে নাই, তাহা নহে। ঐ জাতির লোক মনে করে, তাহারা পৃথিবীর রাজা; তাহাদের সন্তানসন্ততিকেও এই পার্থিবরাজত্ব অধিকার করিয়া এবং উহা বজায় রাখিয়াই চলিতে হইবে। এই পৃথিবীর সকল প্রকার ঝড়-ঝাপ্টা বিপদ-আপদ, অত্যাচার অবিচার এবং অনাচারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি করিয়া, হয় ত উপস্থিতমতে স্বয়ংকর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় ভূমিকাতেই তাহাকে চলিতে হইবে। এ সংসারে 'যোগ্যতমেরই জয়'! সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাকে কেবল 'গায়ে ফুঁ দিয়া' 'শিকার উপর তুলিয়া' রাখিলেই চলিবে না। তাহাকে একেবারে

শিকলকাটা করিয়াই এই শিক্ষানবিশীর মুক্ত আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া চাই। যে উহাতে আত্মরক্ষা করিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া ঘরে ফিরিতে পারে, সেই হইল সমাজের পক্ষে প্রকৃত লাভ! যেই ফল ওইরূপে পাকিবার সম্ভাবনা নাই, সেইটি স্বাধীনতাবায়ুর ঘাতসহ নহে, সেটি এ অবস্থাতেই ‘চিঁড়িয়া-ঝরিয়া-পুড়িয়া-পড়িয়া’ মরুক, তাহার জন্য পরিদেবনা বা সমাজের কিছুমাত্র আপশোষ নাই। কেবল ইংরেজজাতি কেন, সকল ইয়োরোপীয় জাতিই এইরূপে স্বাধীনতার আগুনে পোড়াইয়া তাহাদের সন্তানের শিক্ষা ‘বাজাইয়া’ লয়। এ জন্যই হয়ত উহাদের অনেকের ‘সাধা গায়ে কাল দাগ’ থাকে! কিন্তু ওইরূপ দাগকে তাহারা যেন গ্রাহ্যই করে না। ইহা শিক্ষার আসুরিক পদ্ধতি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অসুরেরাই ত চিরকাল দেবতাকে ভাগাইয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গলোক ভোগ দখল করার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ, সভ্যতার ক্ষেত্রে দৈব এবং অসুর আদর্শের দ্বন্দ্ব চিরকালের কথা। সংসারের স্বর্গপুরীর অধিকার চিরকাল দেব এবং অসুরের মধ্যে যেন পর্য্যায় ক্রমে পরাবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে—উপস্থিত যোগ্যতাই ইহার নিয়ামক। তবে, ভারতীয় দৃষ্টি চিরকাল দৈবী সভ্যতাকেই পরিণামজয়ীরূপে দর্শন করিয়া আসিতেছে।

৩

১৮৪৩ অব্দে, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মধুর হিন্দুকলেজের শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। এই ধর্ম্মান্তরগ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, যদি ধর্ম্মবিশ্বাসের তাড়নাতেই তিনি এ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ মিলিত। মধুসূদনের ইংলণ্ডে যাইবার ‘সখ’ ‘অত্যন্ত’ প্রবল ছিল—সখই বা বলিব কেন, উহা তাঁহার চিরজীবনের

বাসনা—রক্তগত, প্রাণগত, তীব্রতম আকাঙ্খা! "আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতাম,—যদি কেবল ইংলণ্ডে যাইতে পারিতাম!" ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই, কামারের হাফরের ন্যায় এইরূপ এক অদ্ভুত তপ্তনিশ্বাস মধুসূদন থাকিয়া থাকিয়া পরিত্যাগ করিতেছিলেন। কবি হওয়ার বাসনা মধু-জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক শক্তি বলিয়াই স্থির করিতে হয়, বিলাতগমনের আকাঙ্ক্ষা উহার ইন্ধনরূপেই বর্ত্তমান ছিল। আবার, তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা কোমল অংশ এবং দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথও এই বিলাত গমনের আশার মধ্যেই ছিল। আমরা দেখিব, এ ছিদ্রপথেই সাংসারিক জীব মধুসূদনকে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হইয়াছে! এই পথেই তাঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম গিয়াছে এবং সাংসারিক সুখ ও অর্থসাচ্ছন্দ্যের যাহা কিছু অবলম্বন বা সম্ভাবনা ছিল তাহাও বিলাত গমন হইতেই ডালেমূলে খোয়াইতে হইয়াছে। মধুচরিত্রের এই ছিদ্রপথেই নাকি তাঁহার নিদানবন্ধু পাদরীপ্রবর বিলাত গমনের সাহায্য-নিশ্চয়তার আশ্বাসসহযোগে পরিত্রাণের শর নিক্ষেপ করেন! এবং উহাতেই সরলবিশ্বাসী কবির মর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহাকে একেবারে জর্ডণ নদী পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়! অবশ্য, ঐ স্থান হইতে উদ্ধারকারী পরম বন্ধুটীর আর কোন খবর নাই।

কবিকে জীবনের এই প্রথম লেনাদেনার হিসাবেই প্রবঞ্চিত হইতে এবং দুনিয়াদারীর যুদ্ধে প্রথম বাজীতেই পরাজিত হইতে দেখিলে কার না দুঃখ হয়! স্বাধীনতায় তাঁহার হাত পোড়াইল, তিনি কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না! তবে ইহাও তাঁহার শিক্ষার একটি সোপান। যে কবি পরকালে "আশার ছলনা" এবং মেঘনাদ বধের করুণ সঙ্গীতে বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়াছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রথম সোপান। কবিগণকে অনেক সময় এইরূপে নিজের হৃদয়রক্ত দিয়া এবং স্বয়ং

কাঁদিয়াই সাহিত্যতন্ত্রের করুণ রাগিনী-আলাপ শিক্ষা করিতে হয়! কবির "আশার ছলনা" নামক কবিতাটির সংকেতিতার্থের আমলও এ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইবে। ঐ কবিতার অর্থ টুকুই হইল কবিজীবনের প্রধান সিদ্ধি! জীবন-যাত্রী মধুসূদনের প্রধান প্রাপ্তি! কবিজীবনের আত্মমর্মদা মথিত করিয়া উঠিয়াছে একটা হৃদযমর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস! তাঁহার কবিত্বকৃত্যের প্রধান শক্তি যোগাইয়াছে ঐ দীর্ঘ-নিশ্বাস! হায়! এইরূপে "আশার ছলনা" এবং অভিজ্ঞতার নির্দ্দয়-নির্ম্মম বিদ্যাগৃহে পাঠ অভ্যাস ব্যতীত কি মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না! হাত না পোড়াইয়া অগ্নির বিদাহ-শক্তি বুঝিবার জন্য উপায়ান্তর নাই। মনুষ্যের ইহাই 'অদৃষ্ট'! কিন্তু এই বিদ্যালাভের জন্য হতসৌভাগ্য ছাত্রকে যেই শিক্ষাপণ দিতে হয়, যে গুরুভার গুরুদক্ষিণা যোগাইতে হয় উহা কি ভয়ঙ্কর! কি দুর্ব্বহ-দুর্ভর এবং প্রাণান্তকর!

খ্রীষ্টানী স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের মহাশিক্ষা মধুসূদনকে পাইয়া বসিল। পরিতাপের বিষয়, তিনি সজ্ঞানে প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় এই শিক্ষাকে বরণ করিতে জানেন নাই। পণ্ডিতবর বেকন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের পার্থক্য দেখাইয়া, একরূপ অহংকারের স্বরেই বড়গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন "Prosperity is the message of the old Testament, adversity of the new". এই আদর্শে খ্রীষ্টানমাত্রকে তাহার পরিত্রাণগুরুর পথেই দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হয়,—গুরুর মতই, নিজের ক্রুশখানি নিজের স্কন্ধে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে হয়! দুঃখের ক্রুশটিকে একেবারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াই জীবনের 'ব্রত-উদ্‌যাপন' করিতে হয়! ভারতবর্ষ তিতিক্ষা এবং সংন্যাস বলিতে যাহা বুঝিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও অর্থতঃ এবং কার্য্যতঃ ক্রুশতত্ত্বে তাহাই বুঝাইতেছে! আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন

নিজের অন্তরাত্মার প্রবল অদৃষ্টগত রাজসিক ঝোঁক গতিকেই কি হিন্দু কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে সহানুভূতি সিদ্ধি করিতে এবং অধ্যাত্ম শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন যেমন অধ্যাত্মতঃ ত্রিশঙ্কুদশায় ছিলেন, তেমন খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকারের পর হইতে তাঁহার সাংসারিক ত্রিশঙ্কুদশাও একেবারে পরিস্ফুট হইয়া বেদনা জন্মাইতে লাগিল! তাঁহার পূর্ব্বের বন্ধু-বান্ধবগণ এবং পৈত্রিক সমাজ যেন উক্ত প্রবল-অস্বীকারের আঘাতেই দূরগত হইয়া গেল, অথচ যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন তাহারাও মনে-প্রাণে তাঁহাকে আহ্বান এবং গ্রহণ করিল না। হিন্দুর সমাজধর্ম্মে অপর সহস্রদিকে অযোগ্যতা কিংবা দুর্ব্বলতা থাকুক, উহা দূর-দূরান্ততম ব্যক্তিগণের মধ্যেও যেই পরস্পর-সহায়তা এবং কুটুম্বিতার সম্বন্ধ ঘটনা করে, স্নেহপ্রীতিমমতার যেই অন্যোন্যাশ্রয় বন্ধন রচনা করে, তাহার সমতুল্য পদার্থ জগতের অন্য কোন সমাজসংঘ মধ্যেই মিলিবে না! মধুসূদন সেই 'হারাধন' আর কোথায় পাইবেন? একা! একা! একা! সংসারে যাহারা অন্তরে তিতিক্ষাকে বরণ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে এই একাকী এবং অসহায়ের অবস্থা কি ভয়াবহ ভাবেই ক্লেশ কর! হৃদয় মর্ম্মের কি ঘোর অবসাদক! বিশেষতঃ মধুর ন্যায় প্রেমজীবী কবির পক্ষে!

মধুসূদনের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তাঁহার পিতামাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও, এবং পুত্রটি প্রকাশ্যতঃ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও পিতামাতা পুত্রকে তত্ত্বতঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই বিদ্রোহী এবং স্বৈর-পথাবলম্বী শিশু যাহাতে সংসারে আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে উহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। পৈত্রিক ব্যয়েই মধুসূদনের শিক্ষাজীবন বিশপ্স কলেজে নূতন করিয়া আরম্ভ হইল;

১৮৪৩ হইতে ১৮৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাজীবন চলিল। সুতরাং বঙ্গদেশের বুকে রাখিয়াও এই শিক্ষা মধুসূদনকে অশনেবসনে, চলাফেরায়, কথায় এবং কাব্যে সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী, বিসমাজী এবং বিদেশী করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু মধুর হৃদয়ে, তাহার রক্তের প্রচণ্ডতা-ধর্ম্মের মধ্যে স্থিরতা এবং শান্তি বলিয়া বা শমদম বলিয়া কোন পদার্থ যে ছিল না! তাহাকে যে চলিতে হইবে—বল্গাবিহীন অশ্বের মতই আপন অদৃষ্টের সন্ধানে ছুটিতে হইবে! 'সাত ঘাটের তের পানী' তাঁহাকে না খাওয়াইলে যে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্য্যামী দেবতার উদ্দেশ্য কোন মতেই পূর্ণ হয় না। তাই হতভাগা কবিকে আবার ছুটিতে হইল—কেন ছুটিতেছেন, কোথায় কোন লক্ষ্যে চলিতেছেন কিছু মাত্র স্পষ্টভাবে তাঁহার নিজেরই জানা নাই, অথচ ছুটিতে হইবে। ছুটিয়া ছুটিয়া অকস্মাৎ একেবারে মান্দ্রাজে উপস্থিত।

এ স্থলে আমাদের দেখা এবং বলা উচিত যে পূর্ব্বোক্ত প্রচণ্ডতা তত্ত্বের শিক্ষানবীশ যেমন মধুসূদন, উহার সাধক পুরোহিত এবং বলিও তেমন মধুসূদন। তেমনি, আবার বঙ্গ দেশের ওই 'ঝড় তুফান' যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিতে, উহার শুদ্ধ সাঙ্গ দৃষ্টান্ত বলিতেও মধুসূদনকেই বুঝাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে, তাঁহার জীবনের মূল বার্ত্তাগুলি একনিশ্বাসেই শেষ না করিলে অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুগত বিবৃতি হইবে না। মান্দ্রাজে যাইয়া ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৮ আট বৎসর প্রবাস—প্রবাসেই 'ইংরাজী ভাষার বড় লেখক এবং বড় কবি' হইবার দুরাশায় কাব্য রচনা, একজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে প্রেম এবং "প্রেমের নিগড়" পরিধান; অল্পকাল পরেই পুত্রকন্যাসহ পত্নীর সহিত একেবারে সম্বন্ধচ্ছেদ; হেনরিয়েটা নাম্নী আর এক মহিলার সম্বন্ধ স্বীকার; এবং অদৃষ্টের তাড়নাতেই আবার বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন!

এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, এই প্রচণ্ড বন্ধন এবং প্রচণ্ড বিচ্ছেদের তুফানমধ্যে কেবল বঙ্গকবি মধুসূদনটির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাসূত্রকেই আমাদের প্রকৃত দরকার; এই তুফানের মধ্যে তাঁহার জীবন-দেবতার স্থির উদ্দেশ্যটুকুই আমরা লক্ষ্য করিতেছি! বঙ্গভাষার রীতি এবং আবহাওয়ার মধ্যে একটা তুফান আনা' চাই; যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের ছন্দ মধ্যে, তেমন উহার অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যেও এমন একটা পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ-বিচ্ছেদী এবং বিপ্লবময় মহাঝড় ছুটাইয়া দেওয়া চাই যে তাহার আঘাত যেন বঙ্গদেশের সমাজসভ্যতা এবং ধর্ম্মের অন্তর্লোকে দীর্ঘ-দীর্ঘকাল ধরিয়া ছুটিয়াও হতবল হয় না! মধুসূদন বাঙ্গালীর অদৃষ্টদেবতার ক্রিয়াযন্ত্র বই নহেন! সুতরাং এই অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং মস্তিষ্কশক্তিমান্ ব্যক্তির সমস্ত কার্য্যই যেন সদসদ্ বিচারবিহীন তরঙ্গধর্ম্মে, এবং দৈবগ্রস্ত আবেগধর্ম্মেই প্রচণ্ড হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে! এক দিকে আত্মশক্তির প্রচণ্ডতা—অন্যদিকে নিজের বাহিব হইতে প্রচণ্ডতর শক্তি বিশেষের আবেশগ্রস্ততা!

কবিজীবনের অধ্যাত্মসূত্র কেবল এ স্থানেই শেষ হয় নাই। স্বদেশে ফিরিয়াও কেবল ৪ বৎসর মাত্র—১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ অব্দ পর্য্যন্ত—মধুসূদনের প্রকৃত সাহিত্যজীবন এবং বাণীসাধনা এই চারিটি বৎসর! ইহার মধ্যে একটা তুফানের মতই তিনি বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে যুগযুগান্তের শিলাশৃঙ্খল-বদ্ধ নিশ্চল হ্রদের অবস্থা হইতে স্বাধীনতাব মুক্ত আকাশে এবং বিশ্বসম্পর্কের মুক্ত বাতাসে লইয়া আসিবা গঙ্গাপ্রবাহের মতই বহুমুখে ছুটাইয়া দিয়াছেন! এক জীবনের আপাত-দৃষ্ট ক্ষুদ্র চারিটি বৎসরেই কি এতবড একটা বৃহৎ ব্যাপারের আরম্ভ এবং পরিণতি বুঝিয়া লইব? মানবজীবনের দর্শনশাস্ত্র কিন্তু এইরূপ আকস্মিকতা স্বীকার করে না। অতীত জীবনের সমগ্র

মধুসূদন দত্ত, সাগরদাঁড়ীগ্রামের জন্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া—কবির তিলোত্তমা সৃষ্টির ন্যায়—জীবনের সকল জ্ঞানকৃত এবং অতর্কিত ঘটনার মধ্য দিয়া হৃদয়ে এবং বুদ্ধিতে, কর্ত্তা অথবা কর্ম্ম স্বরূপে, অধ্যয়নে এবং স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণে যে মধুসূদন শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গসাহিত্যে আসিয়া এইরূপে পরীক্ষা দান-পূর্ব্বক নিজের জন্য অমরতা সিদ্ধি করিলেন!

কেবল এ স্থানেই শেষ নহে। কবি মধুসূদনকে—বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষদেশে একরূপ সর্ব্বসম্মত ভাবেই উন্নীত এবং অবস্থিত মধুসূদনকে, নিজের অমরত্বের কৌলিন্যগর্ব্বে রাত্রিদিন স্ফীতবক্ষ মধুসূদনকে উহাতেই তৃপ্ত করিতে পারিল না—তাঁহাকে বারিষ্টার হইতে হইবে! 'No more Madhu, the কবি, old fellow, but Michael M. S. Dutt, esquire, of the Inner temple, Barrister at law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ?" পাঠক! এই উচ্ছ্বাস, এই আপাতকৌতুকের উল্লাসের মধ্যে কি কেবল মধুসূদনের কণ্ঠই শুনিতেছেন? উহার মধ্যে অদৃষ্টদেবতার প্রচণ্ড পরিহাস টাও কি একেবারে বিকট হইয়া উঠে নাই? উহার বাধ্য হইয়াই আবার ছুট!—একেবারে ইংলণ্ডে! তাঁহার নিজের কথায়—

Far away—far away
From the land he loved so well—
And be hanged for it."

ইংলণ্ডে ৫ বৎসর। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত। কায়-ক্লেশে, সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাকারী চিহ্নিত বন্ধুগণের দুর্ব্যবহারে, অন্নকষ্টে, মনঃকষ্টে, ঋণকষ্টে, একরূপ ভিক্ষায় এবং পরিশেষে বঙ্গ-পূজ্য সেই বিদ্যাসাগরের দয়ায় বারিষ্টারী পাস-পত্র পকেটে করিয়া

কলিকাতায় হাজির! উহার ফল কি হইল? সনন্দখানি—ব্যবহার-শাস্ত্রের জ্ঞানমাতা সরস্বতী দেবীর স্বহস্তলিখিত সেই অনুরোধ পত্রখানি বিধিমতে চোখের সমক্ষে ধরিলেও লক্ষ্মীমাতা একেবারে বিমুখ! তাহার পর ৬ বৎসর ধরিয়া আবার সেই অন্নকষ্ট, মনঃকষ্ট, ধার-কর্জ্জ, ভিক্ষা, নিরাশার নিশ্বাস, রোগশোক, অনুতাপ ও পরিশেষে সস্ত্রীক 'আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে'—

এই শেষের পরিণামটি উল্লেখ না করিলেই ভাল। যাহাতে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির 'আঁতে ঘা' লাগে, আমাদের মুখ যাহাতে চির-কলঙ্কের কালিমায় লেপিয়া রাখিয়াছে, এখন বঙ্গোপসাগরের জল ঢালিলেও যাহা ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই ঘটনাটি বিস্মৃত হইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু ভোলা ত যায় না! মধুসূদনের এই জীবনগতি এবং নিয়তির আদ্যন্ত-মধ্যে একটা dæmon আছে—একটা ডাকিনীশক্তি আছে। যেই dæmonএর অস্তিত্বে মহাত্মা সক্রেটিস বিশ্বাস করিতেন—যে তাঁহাকে সকল কর্ম্মে পরিচালিত করিয়া, তাঁহার সকলকার্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, পরিশেষে স্বহস্ত-বৃত বিষপানে তাঁহার নিয়তি ঘটাইয়াছে! দৈবতত্ত্বে বিশ্বাস কর আর নাই কর, যে নামেই উহার নামকরণ কর, সকল মহাপুরুষের জীবনতত্ত্বে সেইরূপ একটা 'ডাকিনী'শক্তির ক্রিয়া কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে! খ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্য, কিংবা সীজার নেপোলিয়ন রিসিলিউ জগতের অধিকাংশ বীরধর্ম্মী পুরুষের মধ্যে—মনুষ্যজাতির অতীত বা বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ভাববীর চিন্তাবীর ব্যক্তিমাত্রের জীবনীমধ্যে, এরূপ একটা দুর্ব্বারগতিলক্ষণা এবং আপাততঃ কার্য্যকারণ-সূত্রের সম্বন্ধবিরহিতা, অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির দেবকী লীলাই প্রত্যক্ষ করিবে! মহাপুরুষ মাত্রেই দেবকী-পুত্র! এবং এই পুত্রগণ অনেক

সময় মাতৃমন্দিরে আপনাকেই মহাবলিরূপে উৎসর্গ করিয়া যান! লোকোত্তরা প্রতিভার এই "শাক্ত আদর্শ" মনুষ্য-উন্নতির ইতিবৃত্তে সমুজ্জ্বল রক্ত অক্ষরে—দিগ্‌দিগন্তদীপী জ্যোতিরক্ষরে লিখিত হইয়াছে! মধুর জীবনী লেখক, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন যোগীন্দ্র বাবু মধুসূদনের সকল দুঃখকষ্টের জন্য কেবল তাঁহাকেই 'দায়ী' বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের উদ্বেগ দেখাইয়াছেন। কবিজীবনীর সর্ব্বত্র এতটা মামুলিরকম নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত-বাদ অনুসরণ না করিলেই হৃদ্য হইত মনে করি। উহাতে একেবারে 'নীতি পাঠশালার' দুর্ভাগ্য বালক-গণকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিতে থাকে! জীবনী-লেখককে একেবারে, আধুনিক স্কুলমাষ্টারের প্রচণ্ড-উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পাঠকের মন অতর্কিতে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। মধুসূদনের জীবন-তলে যে একটা অপরিহার্য্য নিয়তির ডাকিনী-শক্তি ছিল, উহার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আবিল হইয়া যায়! মধুসূদনের শেষ নিয়তির মধ্যে—দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুটির মধ্যে কি ওই অদৃষ্ট শক্তির পরিস্ফুট লীলাটিই মুখ্য হইয়া উঠে নাই? কার্য্যকারণ-ক্ষেত্রে ওইরূপ মৃত্যুর কোন সম্ভাবিত অজুহাত আছে কি? মধুসূদন দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু দরিদ্র হইলেই ত সমাজে দাতব্যচিকিৎসালয়ে মরণদণ্ড লাভ করিতে হয় না—অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমাজে! ঐরূপ যোগ্যতা ত মধুসূদনের ছিল না! মধুসূদন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান—স্বয়ং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার—M. S. Dutt esq.! Learned Profession সমূহের শীর্ষবিভাগে বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি; তৎকালেই বঙ্গদেশের সকল শিক্ষিতজনের মাননীয় এবং হৃদয়ঙ্গম শ্রেষ্ঠ কবি। এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর নাম-মদ্রায় জাগিয়া থাকিবে, যাঁহার নামের সম্পর্কে আনিয়া কোন

রূপে নিজের নামটি জুড়িয়া দিতে পারিলে ইতিহাসে 'অমর' হইতে পারা যাইবে! এখনও যেই সম্পর্কে আসিয়া সে কালের অনেক বিস্মৃতিযোগ্য নগণ্য ব্যক্তিই যেমন বাঁচিয়া যাইতেছেন, সেইরূপ একজন ব্যক্তি! তাঁহার কোন বন্ধুই ত এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন না! বঙ্গ-দেশের রাজধানীর তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ—উকীল, আমলা, ডাক্তার, বারিষ্টার, জমিদার, রাজা মহারাজা প্রভৃতি মধুসূদনের বন্ধু, গ্রাহক অথবা অনুগ্রাহক। এ ব্যক্তিটির মরণ নিশ্চিত জানিয়া, নিজের বাড়ীতে দুইটা দিন রাখিয়া, তাহাকে মরিবার জন্য সাড়ে-তিন-হাত জায়গা ও একটা উপাধান দিতে তাঁহাদের কত টাকা অপব্যয় হইত! মধুসূদনের সেই বাল্য বন্ধু, ক্লাস-বন্ধু এবং ধর্ম্মবন্ধু ডাক্তারটির কথা ধরিতেছি না—যিনি এরূপ অবস্থাতেও মধুসূদন হইতে একটিবারের দর্শনীও কড়ায়গণ্ডায় কোনদিকে ছাড়িতে পারেন নাই, মধুসূদন যে জন্য মর্ম্মস্পৃক অভিযোগ জানাইতেন—তাঁহার নাম মুখে আনিব না। চিরবিস্মৃতির অন্ধকার শয়ন হইতে তাঁহার সম্ভ্রান্ত নামটিকে এবং দর্শনীপুষ্ট দেহপিণ্ডকে জাগাইয়া তুলিয়া আমরা 'ঐতিহাসিক অমরতা' দানরূপ অবিচার করিতে চাই না। কিন্তু অন্যরূপেও ত চিকিৎসার চেহারা বজায় রাখিতে পারা যাইত! তবু, ঐ কথাটী সেকালের এতসমস্ত সুহৃদয় ব্যক্তির মাথায় এবং হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও যোগাইল না কেন? এ ঘটনার মধ্যে কি মধুসূদনের এবং বঙ্গসাহিত্যের নিয়তি-দেবতার অপরিহার্য্য ইচ্ছা এবং শক্তি দেখা যাইতেছে না! বঙ্গসাহিত্যের প্রমিথিয়সের ওইরূপ নিয়তি করিয়া, বঙ্গবাণীর এবং বঙ্গের বাণী-পুত্রগণের হৃদয়মধ্যে একটা চিরস্থায়ী এবং দুরুৎপাটনীয় স্মৃতিশেল আমূল নিখাত করা কি সেই ডাকিনীর ইচ্ছা ছিল না? যাহা নিশিদিন ধিকিধিকি জ্বলিবে অথচ যাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ

চিকিৎসার হাত থাকিবে না! এখন আর আমরা চিরপূজ্য প্রিয়-কবির চিরস্থায়ী স্মৃতি স্থাপন করিয়া বা প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াই বা কি করিব? উহাতে কি অদৃষ্টের পরিহাসটি দ্বিগুণ অরুন্তুদ হইয়া উঠিবে না? বাণীমাতার সেই নিদারুণ পরিহাস কে এড়াইবে?—Madhu, "you wanted bread, but they gave you stones!"

যাহা হউক—কবি-সম্পর্কিত কোন সমকালীন ব্যক্তির উপর কোনরূপ ন্যূনতার অভিযোগ আনয়ন কিংবা সঙ্কেত করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখিতে চাই, মধুজীবনের অন্তরালের সেই প্রচণ্ড নিয়তিশক্তি! যাহা একদিকে নিদারুণ নির্দ্দয় হইয়াই মধুসূদনকে গড়িয়া তুলিয়াছে—মানুষটিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, তাহাকে চিরজীবন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যের আলোক স্তম্ভরূপে স্থির করিয়া দিয়াছে! এই জ্বালাপোড়া না হইলে ত মধু বঙ্গসাহিত্যের প্রমিথিয়স হইতে পারিতেন না—মধুর অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যও উজ্জ্বল হইতে পারিত না। আমরা মহামান্য ব্যারিষ্টার বা ধনাঢ্য মধুসূদন দত্তকে পাইতাম—সে ত অগণ্যসংখ্যায় পাইয়াছি ও পাইতেছি—কিন্তু অমরকবি মধুকে পাইতাম না! ইহাই অপরিহার্য্যভাবে নির্দ্দয়-নিদারুণ অথচ অপরিসীম অমৃতের নিয়তি! উহাতে এই কবির অমৃত অংশকে কত উজ্জ্বল করিয়াছে! তাঁহার বন্ধু-গণের একবাক্য সাক্ষ্য এই যে, এত অন্তর্দ্দাহ, সংসারের এত জ্বালা যন্ত্রণা সত্ত্বেও মধু "চিরকাল মধু ছিলেন"; উহাতে তাঁহার মুখের সেই স্নিগ্ধ-মধুর হাসি—সেই চিরানন্দময় দীপ্তি অপহরণ করিতে ত পারেই নাই, পরন্তু, চিরকাল তাঁহাকে বাণীপূজার মন্দিরেই জীবনের আনন্দকে অন্বেষণ করার জন্য উত্তেজিত রাখিয়াছে! মান্দ্রাজ-প্রবাসের সময়েও

মধুসূদনের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ ছিল—উহাতেই কবিকে মাসিকে সাপ্তাহিকে কলমপেশায় জীবিকা অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মান্দ্রাজ হইতেই মধুসূদনের প্রথম রচনা Captive Ladie নামক ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে উহা যেরূপ সাধুবাদের ঝটিকা লইয়া আসে তাহাতেই কবি বলিয়া উঠিয়াছিলেন "Heigh Ho! my stars are brightening!" কিন্তু 'বাহবা' বহুত আসিল বটে, "প্যালা' আসিল না! উহাতেই নিরাশ হইয়া কবি কিছু পরে বলিয়াছিলেন "I had not thriven so well in the world as I had expected" হায়! এই 'হায়'! ইহাই ত মধুজীবনের আদ্যন্ত-মধ্যের নিত্যপ্রকৃতি এবং সর্ব্বত্রস্ফুট হাহাকার। কিন্তু, এই হাহাকার যে বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য ছিল। এত দুরবস্থাতে থাকিয়াও মধুসূদন ভিতরেভিতরে কি করিতেছিলেন, দেখুন। গৌরদাসের পত্রে আছে "তুমি কি এখানে অযথা সময়ক্ষেপ করিতেছি মনে কর? আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালক অপেক্ষাও অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্য প্রণালী এই—৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হীব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু এবং সংস্কৃত, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন, এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরেজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?" এই মাতৃভাষা! একজন দেশবহিষ্কৃত দরিদ্র স্কুল মাষ্টার, যাহার অদ্যকার খাবার টাই জোটে না—সে হাজার মাইল দূরে বসিয়াও 'বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালীর উন্নতিসাধনের' কথাই ভাবিতেছে! কোন্ মহাডাকিনী তাহাকে এই নিদারুণ আত্মহত্যায় ডাকিতেছে? ডাকিনী ত ক্ষণকালের জন্যও বলিতেছে না "রেখে দাও তোমার

'মাতৃভাষা এবং স্বদেশের উন্নতি'! মনুষ্যজীবন ত জলবিম্ব বই নহে, খাও—দাও—মজা কর!" কেবল কি এক অপরিণতমস্তিষ্ক এবং স্বপ্ন-বিলাসী যুবকপুরুষের এই গোঁয়ার্ত্তমী! অনেক ঠেকিয়া-শিখিয়া এবং তখনো ক্ষুধার জ্বালায় মরিয়াপুড়িয়াও এই মনুষ্যটি প্রৌঢ় এবং অভিজ্ঞতার বয়সে, বিদ্যাসাগরের নিকট জীবিকা ভিক্ষা করিতে করিতেই বা কি বলিতেছে দেখুন,—"আমার মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আমি এখানেও লাগিয়া আছি; বিদেশী সাহিত্যের সমৃদ্ধি আমি মাতৃ-ভাষার ভিতরে—আমার শিক্ষিত ভাইগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই; আমি এস্থানে আলস্যে দিন কাটাইতেছি না। ফরাশী ও ইটালীয় ভাষাকে আমি একরূপ মুষ্টির মধ্যেই আনিয়াছি—সংপ্রতি জার্ম্মাণ ভাষাকে ধরিয়াছি। ইহার পর স্পেনের কিংবা পর্টুগালের সাহিত্য-প্রবেশে আর বাধা থাকিবে না।" এ সকল কি কথা! একেবারে অসাং-সারিক এবং পাগলের কথা নহে কি? নিজের পেটে নাই ভাত—বঙ্গদেশের জন্য কেন উহার এত মাথা ব্যথা!

বলিতে চাই, এরূপ একজন পাগল না জন্মাইলে কোন দেশের কোন দিকেই প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না। কোন দিকে কোনও সমাজে নূতন কিছু করিতে, দেশবাসীর মনকে কোন অজানা পথে ঘুরাইয়া দিতে, এরূপ গোঁয়ার্ত্তমী এবং পাগলামী না হইলে ত চলেই না! পরন্তু, তাহাকে "পল্লীবালদলের" শ্রীহস্ত হইতে ইটপাটকেল খাইয়াই রাস্তা চলিতে হইবে! যে সকল শক্তিশালী লোক, অন্য সহস্র দিকে যোগ্যতা সত্ত্বেও আলস্যে অথবা ভীরুতায় তাহা পারিল না, সুখসোয়াস্তিকেই বড় ধরিয়া অথবা সমকালীয় 'বুদ্ধিমান্' ব্যক্তিগণের করতালি এবং বাহবাকেই সার মানিয়া চলিয়া গেল, তাহারা 'আজও গেল—কালও গেল'! ক্ষমতাশালী মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই,

জীবনের সকল অস্থিরতার অভ্যন্তরে ঐ সুস্থির এবং ঐ অদম্য পাগলামীর মধ্যেই তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য এবং অমরতার বীজ নিহিত আছে! অমৃতপাগল ভোলানাথের এইরূপ পাগল চেলা হইতে না পারিলে, কাহারও প্রতি সে পাগলের দয়া হয় না! কেহ অমৃতপানের যোগ্য হইতে বা শিবলোকে স্থান লাভ করিতেও পারে না! মধুসূদনের মধ্যে যে প্রমথ-শক্তি ছিল, তাহার সমক্ষেই নতশির হইতে হয়।

Visions of the Past নামক কাব্যের ভূমিকায় উহার 'সহস্র দোষ ক্রটি' স্বীকার পূর্ব্বক মধুসূদন বলিতেছেন, "এই কাব্য আমার জীবনের এমন অবস্থায় রচিত, অভাব ও দারিদ্র্যের এবং উহাদের অনুসরণকারী দুঃখকষ্টের এমন কদাকার এবং নিদারুণ সত্য-উৎপাতের মধ্যে রচিত যে, সে অবস্থায় অসাধারণ মানসিক শক্তি না থাকিলে কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে চিত্ত স্থির করিতেই পারা যায় না। বাণীর প্রত্যাবেশ লাভ করা ত দূরের কথা!" 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' কাব্যের উৎসর্গপত্র ও এরূপ পরিশোচনায় পরিপূর্ণ। অথচ তাঁহার সকল কাব্য-কবিতা-নাটক জীবনের ঐরূপ অবিকল এবং অবিচ্ছেদী দুঃখ-অবস্থার মধ্যেই ত লিখিত হইয়াছে! মনকে দুরবস্থার নিষ্পেষণ এবং আঘাতের দিকে 'বজ্রাদপি কঠোর' করিয়া, উহাকে ভাবজীবন এবং ভাবের গ্রাহকতার দিকে আবার 'কুসুমাদপি মৃদু' করিতে হইয়াছে! চিত্তস্থিরতার বিষয়ে অসাধারণ যোগশক্তি তাঁহার না থাকিলে ঐ সমস্ত কাব্যের জন্মই হইতে পারিত না! যাহার উপরে প্রতিভা-ডাকিনীর 'ডাক' আসে, যেন তাহার সহ্যশক্তি বুঝিয়াই আসে! তাহাকে তিনি দুঃখের সমুদ্রজলে ডুবাইয়া, নিরাশার আগুনে পোড়াইয়া, জীবনের শত সহস্র সুপথে-অপথে ঘুরাইয়াই যেন 'অমৃতের অধিকারী' করিয়া লন! "তোমরা আমার জীবনী লিখিও, আমি বড় কবি হইব" "আমি কবিত্ব

শক্তিতে জগৎকে স্তম্ভিত করিব!" হিন্দু কলেজের নিম্নক্লাসের এক ছাত্রের মুখে এসমস্ত উক্তি, বালকের শূন্যগর্ভ বাহ্বাস্ফোট রূপেই তাহার সঙ্গীগণের সমক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল! উত্তরকালের ঘটনা-আলোকে দেখিতেছি, উহা ত আর কিছু নহে—ঐ মহাডাকিনীরই চীৎকার! ডাকিনী বালককে পাইয়া বসিয়াছে! সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে সে ঐ দিন হইতেই মৃত! তাহাকে পাগলের মত না ছুটিয়া আর উপায় নাই! জগতে কেহ তাহার সুখসোয়াস্তি-দাতা কিংবা রক্ষাকর্ত্তাও নাই!

এই পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা বিশেষ ভাবেই 'কবি' মধুসূদনের সম্পর্কে—কবির অদৃষ্ট ও জন্মস্বত্ত্ব এবং তাঁহার জীবন-পরিবেষ ও শিক্ষার ভিত্তি বুঝিবার উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা করা হইল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কবির এই শিক্ষা! মনুষ্যের জীবন মাত্রেই একদিকে শিক্ষা অন্যদিকে পরীক্ষা। উভয় ব্যাপার সমানেই চলে। তবে কবির পক্ষে এই পরীক্ষা দুইবার হয়—সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া কৃতকর্ম্মতার হিসাব-পরীক্ষাতেও তাঁহাকে দাঁড়াইতে হয়! মধুসূদন জীবন পরীক্ষায় আপাততঃ 'ফেল করিয়া' গিয়াছেন বলিয়াই সংসারের লোক মনে করিবে। জীবনীলেখক ও 'রায়প্রকাশ' করিয়াছেন—মধুসূদন অসংযত-চিত্ততার দরুণেই সাংসারিক হিসাবে ফেল করিয়া গেলেন। মধুসূদন অপেক্ষা সহস্রগুণে অসংযতচিত্ত, এমন কি একেবারে জঘন্যচরিত্র শত শত লোক সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনে, সাংসারিক সুখসুবিধা-সোয়াস্তিতে সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন! আর সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-ব্যক্তির উদরান্নও জোটে নাই! সংসারের 'নীতিশাস্ত্রের' দিক হইতে যিনি যেমন-ইচ্ছা ইহার বিচার করুন, আমরা বলিতে চাই, মানুষের

দৃষ্টি কত দূরই বা চলে! যে যাহা-ইচ্ছা বলুক, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মধুর জীবন-পরীক্ষার ফলটি সমগ্রবিশ্বের জীবন-দেবতা যিনি তিনিই যেন সংসারে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে প্রকাশ এবং প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন! যে ব্যক্তি ফলতঃ একেবারে 'অমরতা'রূপ পুরস্কার পাইয়াছে, বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে অনভিষিক্ত রাজত্বপদ পাইয়াছে, সে আমাদের এই আঠার-ইঞ্চি-হাত মাপের নীতিশাস্ত্রের বিচারাসন হইতে দ্বীপান্তর-দণ্ডেই দণ্ডিত! কে বলিবে, মানুষটির সমস্তটা হয়ত আমাদের মাপজোকের বেলায় ধরা দেয় নাই! আর, আমাদের এই বামন-হস্তের গজকাঠি চালাইয়া সকল মনুষ্যের ধর্ম্মদেহ মাপজোক করিতে কিংবা একেবারে দণ্ডবিধির বিচার ফয়সল করিতে নাই বা গেলাম! কে বলিবে, হয়ত অধ্যাত্মক্ষেত্রে এমন একটা মাপকাঠি আছে যাহার সম্বন্ধে "the last shall become the first, and the first shall become the last! অন্ততঃ মধুসূদন ও শেলী ভালেণ মার্লো বায়রণ প্রভৃতি স্বল্প সংখ্যক কবিগণের দৃষ্টান্তে ত উহার আভাস মিলিতেছে! প্রত্যক্ষের অন্তরালে, জীবের অধ্যাত্মপুরীতে পরিব্যাপ্ত শমদম এবং গভীর অন্তর্যোগ ব্যতীত কি কোন মহাকাব্য রচিত হইতে পারে?

সাগরদাঁড়ীর দত্ত পরিবার একদিকে বঙ্গদেশের গৌরব এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া আছে। উহা অপরূপ অদৃষ্টক্ষেত্র হইয়া মধুসূদনের জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল, এবং বিকাশের উপযোগী শিক্ষা এবং উদ্দীপনা ঘটনা পূর্ব্বক উহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। উহা বঙ্গবাণীর নব-উদ্বোধনে, বাঙ্গালীর জাতীয়তাযজ্ঞে এবং সাহিত্য-মহাপূজার উৎসবে এক নবতন্ত্রের পুরোহিত প্রদান করিতে পারিয়াছিল! এই পুরোহিত বঙ্গদেশে দাঁড়াইয়াই পৃথিবীর অধিবাসী হইয়াছে! কেবল 'পুরোহিত' বলিলে কথাটি হয় ত সকল দিকে ঠিক

হয় না—মহাবলি। জাতীয় জীবন এবং সর্ব্ব উন্নতির মাতৃকারূপিনী মহাবাণীর শাক্তমন্দিরে মধুসূদনরূপী পুরোহিত আপনাকেই যথোপযুক্ত 'মহাবলি' রূপে উৎসর্গ করিয়া নবসঞ্জীবিত বঙ্গসাহিত্যের জন্য আদিম প্রবাসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

৪

প্রতিভা আগুন। যে তেজঃ বাহিরে—বিদাহক, বিস্ফোরক এবং আলোক, তাহাই অন্তর্দ্দিকে জ্ঞান চেতনা ও আনন্দের গতি এবং দীপ্তি। যে আগুন হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য, সে আগুন হইতেই আবার বিশ্বের ধ্বংস সমাপিত হইতে পারে! যেই দীপ্তি বিশ্বপ্রকাশক আলোকরূপে, জগৎপ্রসবিতার বরেণ্য তেজোরূপে গায়ত্রীর লক্ষ্য, ধ্যেয় এবং নমস্য হইয়াছে, উহাই আবার সবিতৃদীকে প্রতিমুহূর্ত্তে মহাপ্রলয়শক্তিতে উত্তালতালভাবে আস্ফালিত হইয়া কোটিকোটি যোজন লেহিয়া লইতেছে। যেই পদার্থ মনীষা-রূপে মানুষের 'মনুষ্যত্বকে' গঠন এবং ধারণ করে, পরিবার সমাজ ও জাতির মহাকল্যাণময়ী ধর্ম্মনীতি রূপে প্রকাশ পায়, মহাপুঞ্জা মেধা-রূপে মানুষকে স্নেহ প্রীতি-মমতা-তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গের পথে দেবত্বে এবং অমৃতত্বে তুলিয়া ধরে, তাহাই মনের স্থিতি-বন্ধনী প্রজ্ঞা এবং সংযমের ধৃতি হইতে বিদ্রোহী এবং বিচ্যুত হইয়া রিপু-রূপে পরিণত হয়। দম্ভ অহংকার ও স্বৈরাচার, হিংসা দ্বেষ ও স্বার্থপরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-অরাজকতা এবং ধ্বংসের দিকেই মনুষ্যকে লইয়া যায়! হয় বিশ্ব-বিজয়দর্পী আলেকজান্দর বা নেপোলিয়ন, না হয় সর্ব্বত্যাগী যীশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ! হয় রত্নাকর না হয় বাল্মীকি! উভয়তঃ প্রতিভা—প্রতিভার আগুন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইংরাজী সাহিত্যে এইরূপ একটা আগুন লাগিয়াছিল! ফরাসী বিপ্লবের সর্ব্বধ্বংসী হোমকুণ্ড হইতে প্রচণ্ডতার স্ফুলিঙ্গ এবং লেলিহান শিখা আসিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যে ধরিয়া গেল! ইংলণ্ডে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ ছিল, যাহার নাম বায়রণ! বায়রণে এই আগুন একদিকে ভাবুকতার মহাশক্তি এবং দীপ্তিরূপে, অন্যদিকে সমাজবিদ্রোহী এবং স্থিতিনীতিদ্বেষী অহংকারের মহামারী রূপেই প্রকট হইয়াছিল। একই ক্ষেত্রে জড়তা এবং আত্মতামুখী মহাশক্তির এইরূপ যুগপৎ লীলা ইতিহাসে কচিৎ দেখা গিয়াছে। সহৃদয়তা এবং অশিষ্টতার এইরূপ সম্মিলন, এতবড় মহত্বের সঙ্গেসঙ্গে এতদ্দর অনাচার! প্রতিভার ডাকিনীশক্তির জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি! উহা যেমন সাহিত্যরাজ্যে—মনুষ্যের ভাবুকতারাজ্যে বায়রণকে মহাশক্তির প্রিয়পুত্ররূপে উন্নমিত করিয়াছে, তেমন জীবনক্ষেত্রে তাহাকে একরূপ আত্মহত্যাতেই লইয়া গিয়াছে। বায়রণ নামক মনুষ্যটি যেন আপনার বলবতী বাসনা এবং বিদ্রোহ বহ্নির নিদারুণ উৎপাতে একেবারে ছিন্নমস্তার ন্যায় আত্মহত্যা করিয়া আত্ম রক্তই পান করিয়াছে!

বায়রণী আগুন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ইয়োরোপে এবং ইয়োরোপ-সম্পর্কিত সাহিত্যমাত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে! যে জাতির মধ্যেই প্রতিভার বিস্ফোরক পদার্থ ছিল তাহা আভাস মাত্রেই বায়রণী আগুনে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে! সকল ইয়োরোপীয় জাতির সাহিত্যমধ্যে এই আগুনের গতি এবং বিস্তৃতির ইতিহাস একে একে অনুসরণ করা যায়। সকলের মধ্যেই আগুন যেমন একদিকে নবজীবনের উত্তেজনা এবং রুদ্রতা জাগাইয়া তোলে, তেমন অন্যদিকে অভাবনীয় মত্ততা ও আনয়ন করে।

এ একটি অদ্ভুত বালক! তাঁহার দম্ভও একেবারে শূন্যগর্ভ নহে; তাহার মধ্যে প্রকাণ্ডভাব ধারণাশক্তি এবং প্রকাশের শক্তিও অসাধারণ মাত্রাতেই আসিয়া গিয়াছে। সে নিজকে যেমন মহাকায় এবং 'অসুরবলেই বলী' অনুভব করিতেছে, চারি দিকের অপর সকলকেও তেমনি 'বামন' বলিয়াই একটা সুস্থির ধারণা যেন তাহার মধ্যে জন্মিয়া আছে। মধুসূদনের এ বয়সের একটি কবিতা "শনি গ্রহে এক সন্ধ্যা" পাঠ করুন। উহার ভূমিকাটিও বিস্ময়জনক। বালকটির কত দম্ভ—কি বিজাতীয় অহংকার!

অহংকারী বালক রবীন্দ্রনাথ

'অনন্ত এ আকাশের কোলে

টলমল মেঘের মাঝার'

তাঁহার 'কবিতার ঘর' বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন একেবারে শনি গ্রহে। "আমি জগৎকে একটা নূতন-কিছু শেখাইতে চাই—এই আমি অমিত্রচ্ছন্দেই এক 'সনেট' আমদানী করিলাম। উহার দৃশ্য শনিগ্রহে, কেন না, পার্থিব পদার্থ মাত্রকেই আমি ঘৃণা করি। এই সনেট dedicated to a pigmy" ইহা কবিতাটীর খেলা-চ্ছলে লিখিত ভূমিকা। বালক শনিগ্রহে বসিয়া এক সন্ধ্যায় এককালে ছয়টি চন্দ্র-উদয়ের নিসর্গদৃশ্য উপভোগ করিতেছে! তাহার এই অপূর্ব্ব খেলার 'গুটিকা'ও সময়সময় সুদূর ইংলণ্ডের মাসিক পত্রিকার প্রকোষ্ঠে পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে। একটি ত একেবারে রাজকবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের পদতল পর্য্যন্ত ছুঁইয়া পড়িল। ধানুকী অৰ্জ্জুন নাকি সায়করূপেই তাঁহার গুরু দ্রোণাচার্য্যের পদতলে প্রণাম নিবেদনপূর্ব্বক আত্ম পরিচয় করিয়াছিলেন; এই ভক্ত বীরবালকও ইংলণ্ডের কবিসিংহাসনতলে প্রণতিশর নিক্ষেপ করিয়াই আত্মপরিচয় করিতে চাহিয়াছে।

এই খেলা। এইরূপে ইংরেজীভাষায় কবিতা লিখিয়া বিশ্ব-পরিদৃশ্য হইবার দুরাশা মধুসূদনের ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্তই ন্যূনাধিক চলিয়াছিল। "বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল" হিন্দুকলেজে পড়ার সময় যে বালক এই কথা বলিয়া সঙ্গিগণকে ক্ষেপাইত, সে যুবক হইয়াও ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ঐ কথাই বলিয়াছে, কাজেও দেখাইয়াছে। মান্দ্রাজের ৮ বৎসরব্যাপী প্রবাসে তাহার মাতৃভাষার মুষ্টিটাই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। "I am fast losing my Bengali" এ সময়েরই অনুশোচনা। পিতার নিকট মাতৃভাষায় চিঠি লিখিতে নিজকে অসমর্থ বলিয়া বন্ধুকে মধ্যবর্ত্তী হইবার জন্য অনুরোধ।

মান্দ্রাজে থাকিতেই যুগপৎ visions of the past এবং Captive Ladie প্রকাশপূর্ব্বক একেবারে ইংরেজী সাহিত্যের কবিত্বদুর্গ আক্রমণ করা গেল! উহাতে প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইল সত্য, এথিনীয়ম পত্রে সমালোচনা বাহির হইল—"এ গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে যাহা বায়রণ অথবা স্কট নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেন না।" প্রশংসার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে, কিন্তু তথাপি। বৈমাত্র ভাষায় কাব্য লিখিয়া—যে ভাষায় চর্চ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক শক্তিসম্পন্ন শক্তিশালী কবি বাণীপূজা করিয়াছেন সেই ভাষায়,—ভারতবাসীর পক্ষে সুস্থির কবি যশের অর্জ্জন। মধুসূদন ক্রমে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। এ সময়ে বঙ্গসাহিত্যহিতৈষী বেথুন সাহেবের সেই সাধুবাদপূর্ণ অথচ সৎপরামর্শে সমুজ্জ্বল পত্রখানিতে অনেক কাজ দেখিল। বেথুনের পত্রটি বিদেশী ভাষায় "কবি-যশঃপ্রার্থী" লেখক মাত্রের সমক্ষে মন্ত্র-পটরূপে দেদীপ্যমান থাকা উচিত। উহার সার মর্ম্ম এই যে, "এ ক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী ব্যক্তির রচনা হইলেও উহা বিদেশীর চক্ষে কেবল একটা 'কৌতুহলের পদার্থ' রূপেই আদর লাভ

করিতে পারে, বিদেশী লেখকের পক্ষে ভিন্নজাতির হৃদয় দখল করা একেবারেই অসম্ভব। ঐ শক্তি স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলেই বরং যোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ক্রমে মধুসূদনের চোখ ফুটিল। কবির পক্ষে এই পথে 'চোখ ফোটা'-রূপ ব্যাপারটি অনেক সময় খুব বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই, উহা নূতন জন্মগ্রহণের মতই আত্মিক এবং গ্লানিকর। কিন্তু, মধুসূদন উহা সহিয়া লইলেন। ইংরাজীতে কবি হওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অজ্ঞাতভবিষ্যতে মাতৃভাষার সেবাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন চিত্ত-নৌকা বোঝাই করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে সময়ের দৈনিক কার্য্যক্রমটি আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজীভাষার মুক্তবায়ুতে এই যে ব্যায়াম, এই যে উদ্যোগপর্ব্বের তপঃসাধনা, উহাতে তাহার মনে যে সবলতা এবং হৃদয়ে যে পূর্ণতা আনিল, বাক্-শক্তিতে যে সামর্থ্য আসিল, ভাবুকতায় যে পাক ধরিল তাহাই একদিন যেন হঠাৎ বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে মহীরাবণের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের 'তাক্ লাগাইয়া' দিয়াছে। বিদেশীক্ষেত্রের রসপানে বর্দ্ধিতপুষ্ট এই মহাবৃক্ষ বঙ্গদেশের দিকে ঝুঁকিয়াই সমস্ত ফলসম্ভার ঢালিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের জীবনে একটা বড় ঘটনা—বঙ্গসাহিত্যের পক্ষেও একটা ফলিতার্থময় ঘটনা, তাঁহার পরম-দয়াবান্ পিতার মৃত্যু। পৈতৃকধর্ম্মভ্রষ্ট মধুসূদনকে 'পরিত্যক্ত সন্তান' না করিয়াই মৃত্যু! তাঁহাকে মধুসূদনের শত্রুগণ উইল করিতে পীড়াপীড়ি করিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "যাহার জিনিষ সে আসিয়া বুঝিয়া লউক!" অনন্তক্ষমাশীল পিতৃ-হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যেই যেমন বঙ্গসরস্বতীর তেমন মধুসূদনের অদৃষ্ট-দেবীর শুভঙ্করী ইচ্ছাই প্রচ্ছন্ন ছিল। 'উহাতেই দেশত্যাগী মধুসূদনকে

পৈত্রিক বিষয় বুঝিয়া লইবার জন্য মাতৃভূমিতে টানিয়াছে ; বাকীটুকুনও অদৃষ্টদেবতা অভাবনীয় ভাবেই ঘটাইয়াছেন।

মনুষ্যের জীবন কতকগুলি ঘটনার সূত্রবন্ধন বই নহে, প্রত্যেক ঘটনারই অর্থ আছে—কোথাও বা এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, কোথাও বা ঢাকা থাকিয়া যায়। জীবনের সকল ঘটনাই পরিস্ফুট অর্থবত্তা লাভ করে এমন জীবন অত্যন্ত কম। মধুজীবনের একটি সার্থক ঘটনা পরোক্ষরূপে পিতার মৃত্যু ও তাঁহার স্বদেশে আগমন। তেমন, আর একটি ঘটনা, কলিকাতায় 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' স্থাপন ও তাঁহার বন্ধু গৌরদাসের সহিত উহার সম্বন্ধ। এ সমস্ত ঘটনার সূত্রবন্ধন সমাধা করিয়াই মধুর অদৃষ্টদেবতা তাঁহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

ভারতে 'জাতীয় থিয়েটার' বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান প্রাচীনতম কাল হইতেই ছিল, এবং উহার পরিচালন-ভার 'নট' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী জাতির উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমানধর্ম্ম নাট্যামোদের বিরোধী, এই কারণে আরবদেশে কিংবা পারস্যে নাটক বলিয়া কোন সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইতে পারে নাই। তাই, ভারতবর্ষে মুসলমান আমল প্রবর্ত্তিত হইবার পর সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতে থাকিলেও নাটকের কিছু মাত্র উন্নতি অথবা রাজশক্তির সহায়তায় উহার পরিপুষ্টি ঘটিতে পারে নাই। অধিকন্তু, হিন্দুজাতির মধ্যে যেই নাট্য আবহ-মানকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহাও সহায়তার অভাবেই ম্রিয়মান হইয়া যায়। ইংরেজের আমল হইতেই এদেশে নাটক এবং অভিনয় পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়াছে। বঙ্গে প্রথম নাট্যশালা—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "সাঁসৌচী থিয়েটার"—ইংরেজেরাই স্থাপন করেন। উহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যেও, স্কুল কলেজে অথবা বণিগণের

বাটীতে অভিনয়-আমোদের দিকে একটা ঝোঁক প্রকাশ পাইতে থাকে। বাঙ্গালীর নাট্যশালার এই নবজীবন ও পরিপুষ্টির ইতিহাস কৌতূহলী পাঠকগণ অন্যত্র পাইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই মাত্র চিন্তা করা আবশ্যক যে, মধুসূদনের অবতরণিকার পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত নাটক বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, এবং 'থিয়েটার' বলিয়া একটা প্রতিষ্ঠানও ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজে দানা বাঁধিতে কিম্বা দাঁড়াইতে পারে নাই। তৎপূর্ব্বে যাত্রা, পাঁচালী, আখড়াই প্রভৃতি আখ্যানসংশ্লিষ্ট এবং সঙ্গীতপ্রধান 'অপেরা'র ন্যায় ব্যাপারই চলিতেছিল। ঐ অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টাযত্নেই 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' স্থাপিত হয়, এবং উহাতে সর্ব্বপ্রথমে রত্নাবলী নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদই অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত অভিনয়ঘটনার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। বিদেশী শ্রোতৃবর্গের বোধসাহায্যে রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করার জন্য মধুসূদনের ডাক পড়িল। গৌরদাসের পরিচয়সূত্রেই পুলিশকোর্টের সামান্য আমলা মধুসূদন দত্ত উক্ত অনুবাদ করার ভার পাইয়াছিলেন। অনুবাদকর্ম্মে হাতসাফাই দেখাইয়া ঐ সমস্ত 'রাজারাজড়া'র দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধাআকর্ষণ করিয়াই কবি প্রথমতঃ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।

সামান্য ঘটনা হইতেই মধুজীবনের প্রকৃত কর্ম্মসূত্রের আরম্ভ, বঙ্গীয় নাটক এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিরও সূত্রপাত!

অনুবাদ করিতে গিয়াই "কবি মধুসূদনের" সুপ্ত চৈতন্য জাগরণ লাভ করিল। যিনি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় একটি পংক্তিও রচনা করেন নাই, এবং ইংরাজীতেও কদাপি নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই, তাহার মর্ম্মস্থল এবং সহজাত সাহিত্য-বুদ্ধিই রামনারায়ণ তর্করত্নের

রত্নাবলীর প্রতিপদে বিদ্রোহী হইয়া অবজ্ঞাভরে ডাকিয়া উঠিতে লাগিল—'ইহা কিছুই ত হয় নাই! এই সামান্য পদার্থের অভিনয়ের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" তখনো নাট্যকলার ক্ষেত্রে কিংবা বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও এক পংক্তি লিখিয়া যে কবি নিজের হাত দেখাইতে অথবা শক্তি পরীক্ষা করিতে পারে নাই, তাহারই এ প্রকার অসন্তুষ্টি। পাঠক, এক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যসেবীর সাধারণ মর্ম্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারিবেন—ইহা প্রতিভার আত্মনির্দ্দেশ্য রাজকন্যার আহরণ। মধুসূদনের অন্তর্দেবতা সংজ্ঞাত জ্ঞানে অলক্ষিতেই ডাকিয়া উঠিল "এ ত কিছুই হয় নাই—আমি ইহাপেক্ষা অনেক ভাল করিতে পারিতে পারি।" এইরূপ স্বভাব-স্বপ্ন বিবেকবাক্য যেমন নিজের তেমন অপরের অজানা ক্ষেত্রে—নব-আবিষ্কারের অপূর্ব্ব এবং অচিন্তনীয় [illegible] পথে কবিগণকে [illegible] করে। [illegible] চরণের পূর্ব্বেই এরূপ [illegible] অনুভূতি এবং অগ্রগামিনী প্রজ্ঞা। উহা না থাকিলে মানুষ কেবল 'বড় কবি' হইতে পারে না, এস্থলেই প্রতিভা-পরিচয়।

কবিবর যে প্রদর্শনের পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলেন "আমি ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল করিতে পারি"—উহাতে মনুষ্যের উপহাস উদ্রেক না করিয়া পারে না। মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধুটিও তাঁহার ঐ সাহসিকতায় হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই। "আচ্ছা দেখা যাবে" এই বলিয়া তিনি কি করিলেন? গৌরদাস বলিয়াছেন "কথোপকথনের পরদিনই এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয় হইতে কতকগুলি চলিত বাঙ্গলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং মনে প্রাণে ঐ সমস্ত পাঠ করিতে লাগিলেন।" বাঙ্গলা পুস্তক—কেন না, বাঙ্গলীভাষাটি ত নূতন করিয়া শিখিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত নাটক—কেন না, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে নাট্যকলা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, সে—

প্রকৃতির অভিনয় প্রচলিত ছিল, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভারতবর্ষের পুরাতন অন্তরাত্মার সহিত পরিচয় করিয়াই ত আধুনিককালের নূতন গতি স্থির করিতে হইবে। যুগপৎ একহস্তে শিক্ষাগ্রহণ, অন্য হস্তে পরীক্ষা দান। আপনার অন্তশ্চৈতন্যের শক্তিতে অভাবনীয় আস্থা এবং উহার অচিন্তনীয় প্রেরণা না থাকিলেও কি কোনো মানুষ মধুসূদনের অবস্থায় একরূপ 'বাজী রাখিয়া'ই কাজ করিতে বসে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাঙ্গালার প্রথম নাটক, এবং মধুকবির প্রথম বাঙ্গলা রচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা'র সৃষ্টি হইয়া গেল।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভাষায় এবং বাঙ্গালার সাহিত্যে কি ছিল, তাহার সম্যক বোধ না হইলে মধুসূদনের শক্তি-পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উহা পুঙ্খাপুঙ্খ দেখাইতে আমরা অপারক, বিশেষত, এই জ্ঞানটি বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক জ্ঞানার্থী এবং প্রকৃত কুতূহলী ব্যক্তিকেই নিজের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে উপার্জ্জন করিতে হয়। এক্ষেত্রে সাহিত্যসেবীর পক্ষে স্বাধীন অনুধাবন এবং নিজের দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ এবং উপকারী। আমরা কেবল এই মাত্র সঙ্কেত করিতে পারি যে, মধুসূদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গীতি কবিতা এবং ছন্দসাহিত্য কোনকোন দিকে পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রেমের সুগভীর ধারণা প্রকটিত ছিল। এই প্রেম মনুষ্যচরিত্রে আসিয়া দিব্যানুরাগী ভাবুকতায় এবং দিব্যোন্মাদে পরিমুক্ত হইলে মনুষ্যের হৃদয় হইতে যে শ্রদ্ধা-ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং আনন্দধারা প্রবাহিত হয় তাহার অকৃত্রিম প্রমাণ চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবৎ প্রভৃতি 'চরিত-লেখক' কবিগণের মধ্যে ছিল, দেশের প্রাত্যহিকজীবনের দিকে সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে জানিলে কবির হৃদয়ে অপরূপভাবে যে

আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছুটে উহাকে দেশীয় বীণাতন্ত্রের ঝঙ্কতরাগিনীতেই পরিমুক্ত করিয়া কবিকঙ্কণ ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে সারঙ্গীর সুরে অতুলনীয় ধ্বনিশিল্পে পরিস্ফুট করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের রাজকবি ভারতচন্দ্র ও ছিলেন। আর, শাণিততীক্ষ্ণ বাক্যের ছুরীতে সমস্ত 'ভালমন্দ'কে কাটিয়া, টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কম্মবায়ু জননিবহের জন্য মুখরোচক চাট্‌নী দিয়াছিলেন 'ইংরেজাবিকৃত এবং বিজাতীয় স্বভাবে আক্রান্ত' বাঙ্গালীর রক্ষা-বুদ্ধির মূর্ত্তিমান্ 'কবিওয়ালা' ঈশ্বর গুপ্ত। ইঁহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্ত তিনজন ব্যতীত অপর কাহারও সহিত মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় থাকার সবিশেষ প্রমাণ পাইতেছি না। কবির বৈষ্ণবধর্ম্মী রচনার মধ্যেও প্রকৃত বৈষ্ণবী ভাবুকতার বিশেষ পরিচয় কোনদিকে উজ্জ্বল হইতেছে না। কবি বিশ্বসাহিত্যের সৌন্দর্য্যকুসুমের লুব্ধ মধুকর ছিলেন, 'চতুর্দ্দশপদী'র মৌচাক মধ্যে নিজের মধুমত্তার প্রমাণ এবং গুণ গুঞ্জন ও রাখিয়া গিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গালার কবি জয়-দেবের গুণকীর্ত্তন আছে, কিন্তু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির নামমাত্রও মিলিতেছে না। তবে, মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় ছিল প্রাচীন বঙ্গের দুইজন মহাপুরুষের সঙ্গে—কৃত্তিবাস ও কাশীদাস। ভারতবর্ষের অতীত যুগযুগান্ত হইতে প্রবাহিত আর্য্যকল্পনার গঙ্গাধারা বঙ্গের ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিয়া সেই রামায়ণ ও মহাভারত। এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের অপর সমস্তই যেন বীণাতন্ত্রী সাধা কালোয়াতী সুর, কেবল এ দুইটি গ্রন্থের অন্তরাত্মার মধ্যেই পুরাতনী আর্য্যপ্রতিভার সমুদ্রকল্লোল ধৃত আছে। বঙ্গের সাধারণ জনমন অতর্কিতে এই সমুদ্র-পরিচয় এবং সমুদ্রের বাতাসেই স্বাস্থ্যসিদ্ধি করিয়া চলিতেছে। মধুসূদনের হৃদয় শিশুকাল হইতেই একরূপ অতর্কিতে,—'কেমন যেন ভাল লাগার' ভাবেই, এই ভারত সমুদ্র-বায়ুর সমস্ত সুফলের দায়ভাগী হইয়া আসিতেছিল!

এখন কর্ম্মক্ষেত্রে, উহা হইতেই তাঁহার কবিজীবনের প্রধান লভ্য উদ্বর্ত্তিত হইয়া আসিল।

গদ্যের ক্ষেত্রে, বঙ্গসাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই লেখা এবং ব্যাবহারিক গদ্য চলিয়া আসিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন বর্ষারম্ভে, ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেই 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' 'প্রবোধ রত্নাকর' 'তোতার কাহিনী, প্রভৃতির পণ্ডিতি গদ্যই শিক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এক দিকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাচার নক্সা", অন্যদিকে রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত 'মহাভারতের আদিপর্ব্ব' গদ্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের পথপ্রদর্শন করিতেছিল। আর নাটকের ক্ষেত্রে ছিল পূর্ব্বকথিত সেই প্রাচীন আদর্শের 'রত্নাবলী' ও 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব'। এই সমস্ত পূর্ব্ব ভিত্তির সমতল হইতেই বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'শর্ম্মিষ্ঠা' মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম কলম ধরিতেই কবির অন্তর্দৃষ্টি দেখিল—হিমালয় পর্ব্বত। শিখরের উপর 'শম্বরসংঘ উচ্চাভিলাষী হইয়া ঊর্দ্ধলোকে মাথা তুলিয়াছে—তাহার উপরে ইন্দ্রপুরী—অমরাবতী। বঙ্গসাহিত্যে প্রথম কলম ধরিতেই, মনোদৃষ্টি খুলিতেই কবির এই প্রথম দেখা এবং প্রথম কথা। বিলকুল স্থিরভাব এবং সমতলতার মধ্য হইতে ঐ ঊর্দ্ধে উৎপতনশীল প্রচণ্ডতার ছবিই কবির সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। এইরূপে মানুষটি কি বঙ্গের সাহিত্য-সমতল হইতে নিজের উচ্ছ্বাসের কবি-আত্মার এবং কবি-প্রতিভার মূর্ত্তিটাই দেখিয়াছিল?

শর্ম্মিষ্ঠার অঙ্কের পর অঙ্ক দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি লাভ করিতেছিল। 'মাইকেল সাহেব' বাঙ্গলায় নাটক লিখিতেছে। শত্রুর টিটকারী ও বন্ধুবর্গের দুশ্চিন্তা এবং কুতূহল যুগপৎ অসহ্য হইয়া উঠিল।

বন্ধুগণ মধুর কার্য্য পরিদর্শনের জন্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে রচনাকার্য্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠসহযোগী হইবার জন্যই, কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের রচয়িতা রামনারায়ণ পণ্ডিত—ওরফে "নাট্কে নারাণ"কে নিযুক্ত করিলেন। মধুসূদন প্রথমতঃ সম্মত হইলেন—"আচ্ছা তাই হোক, উনি আমার ব্যাকরণ ভুল হইতেছে কিনা দেখিয়া দিবেন"! ব্যাকরণ ভুল—অর্থাৎ কি না, বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালীর সাহিত্যে মহর্ষি পাণিনির উদ্বেগজনক ভুল। মধুসূদন ভাবিলেন, যখন বঙ্গভাষার অর্দ্ধাংশই আর্য্যশব্দ তখন ঐ-রূপ কোন ভুল পরিহার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু অব্যবহিত পরেই মধুসূদনের সকল ভুল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! পণ্ডিত যে তাঁহার প্রত্যেক কথাই একেবারে শাস্ত্রসম্মত 'কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার'র শুচিনির্ম্মল বিধিনিয়মের পবিত্র গোময়ে লিপ্ত করিয়া কাঠির ন্যায় সোজা করিতে চায়। মধুসূদনের পত্রে প্রকাশ, তাঁহার প্রিয় 'শর্ম্মিষ্ঠা'কে একেবারে নিরপেক্ষ নিদারুণ এবং অলংকারবিশুদ্ধ গদ্য উক্তি না করাইয়া 'নাট্কে নারাণ' কোন মতেই ছাড়েন না। বাক্যকে উহার সমস্ত 'কোণ কাণ' ছাঁটিয়া একেবারে সোজা করিতে না পারিলে নাকি 'সামাজিকগণের বোধ সৌকর্য্য' হইবে না! 'তথাস্তু' বলিয়া মধুসূদন প্রবীণ সহযোগীকে বিদায় করিলেন। বলিতে হইবে, এ ভূক্ষার্য্যের ফলেই হয়ত মধুসূদনের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সকল বঙ্গকবির কাব্যকবিতামাত্রেই নিদারুণ 'চ্যুত সংস্কৃতি' 'নিহতার্থতা' 'বিধেয়াবিমর্ষ' প্রভৃতি জবরদস্ত দোষ সমূহে চিরকালের জন্যই দুষ্ট হইয়া রহিল। ঐ ব্রাহ্মণের অভিশাপ তখন হইতে বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে পদে পদে এবং উত্তরোত্তর 'অসংস্কৃত এবং 'অসাধু' করিয়াই চলিয়াছে! মধুসূদন বন্ধুকে লিখিলেন, "আর এ বালাই যেন আমার না হয়! আমাকে চলিতে হইলে নিজের পায়ের উপরে ভর করিয়াই চলিতে হইবে"।

"মনে রাখিও, তোমার সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথকে না ভুলিতে পারিলেও বাঙ্গলা নাটকের উদ্গতি নাই"। প্রথম কথাটির মধ্যে যেমন কবিমাত্রের হৃদয়ঙ্গম ভাবে কাব্য-নির্ম্মিতির প্রধান শাস্ত্রটাই ধরা দিয়াছে, দ্বিতীয় কথাটির মধ্যেও তেমনি বাঙ্গলানাটকের গম্যপথ তাহার ঐ 'নাটের গুরুর' অঙ্গুলিতেই প্রদর্শিত হইতেছে! মধুসূদনের পরবর্ত্তী বাঙ্গলা নাট্যকারমাত্রেই বিশ্বনাথ-লিখিত নাট্যশাস্ত্রের 'পাতি' বিস্মৃত হইয়াই চলিতেছেন। নাটক-নির্ম্মাণের বিধি-বিষয় লইয়া লিখিত মধুসূদনের পত্রগুলি অনেক স্থানেই সচেতন-বুদ্ধি এবং অভ্রান্তদৃষ্টি নাট্যশিল্পীর পরিচয় দিতেছে। এ সকল ইংরেজী পত্র বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠকের হিতার্থে অনুবাদিত হওয়া উচিত। "আমি রামনারায়ণকে কেবল, আমার লেখায় কোন ব্যাকরণ ভুল থাকিলে, ঐ সমস্ত সংশোধন করিতেই চাহিয়াছিলাম। আমার 'কথাকে কথা' বদলাইয়া ফেলিতে চাই নাই—নিশ্চয়ই চাই নাই। তুমি জান, মানুষের রচনারীতির মধ্যে তাহার মনপ্রাণের প্রতিবিম্বটাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, উক্ত মহোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই অধমের কোন দিকেই কিছুমাত্র মিল্‌তি নাই। তবে, আমি তাঁহার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব!"

এই 'মিল্‌তি' এবং সমকক্ষতা! মধুসূদনকে চালাইবার জন্য রাম-নারায়ণ পণ্ডিত! এ যেন একজন দৈত্যাকৃতি অতিকায় জীবকে চলাফেরা শেখাইবার জন্য অঙ্গুষ্ঠাকৃতি বামনপুরুষের নিয়োগ! তাহাকে, 'হাত ধরা' দিতে, তাহার গ্রাহ্য হইতেই প্রাণ শেষ! সেক্সপীয়রের সংশোধন কর্ত্তা গ্যারিক! তবে, এইরূপ বামন সংশোধক, বামন সমালোচক এবঞ্চ বামন পাঠক—ইহা ত অতিকায় কবিগণের নিত্যকালের দূরদৃষ্ট!

উপরোক্ত কথা কয়টির মধ্যে মধুসূদন নিজের সাহিত্যসৃষ্টির একটা গুপ্ত রহস্যও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবিগণের ভাষার মধ্যে তাঁহাদের বুকের নিশ্বাস এবং প্রাণের গন্ধ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকে। এ জন্য রচনাকালে, কলমের প্রথম টানেই যাহা বাহির হইয়া আসে, অনেক কবি 'দোষেগুণে উহাই সই' বলিয়া মানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। কবিগণ ভাবের যেই আবেশে আবিষ্ট হইয়া ভাষার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন,সেই অমৃত-মুহূর্ত্ত দ্বিতীয়বার আসে না—ভাষার অনির্ব্বচনীয় মন্ত্র শক্তির মধ্যে অতর্কিতে উহারই ছাপ পড়িয়া যায়! মন্ত্রের উপরে সংশোধন চালাইতে গেলে, যে গুণে উহা মন্ত্র তাহাই খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এজন্য কবি, বিশেষতঃ 'ভাবুকতা' প্রধান কবিমাত্রেই নিজের ভাবাবিষ্ট অবস্থার প্রথমপ্রাপ্তির উপরে নিজেরাও হস্তক্ষেপ করিতে সহজে রাজী হন না। ভাবুকপ্রকৃতির কবিমাত্রের পক্ষে এজন্য আদৌ ভাষা এবং অলঙ্কারের বিশুদ্ধিবুদ্ধিকে সাধ্যমতে পরিমার্জ্জিত করিয়াই রচনাকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়; বিশুদ্ধি-বিষয়েও নিজের অভ্যাসসিদ্ধি এবং বিবেকের নির্ব্বিকল্প অবস্থা লাভ করিতে চেষ্টা করাই উচিত হয়। অন্যথা, পরকালে এমন কি রচনা সময়েই কোনরূপ বহিঃশাসনকে আমল দিতে গেলে, উহার নির্ম্মম "স্থূল হস্তের অবলেপ" হইতে ভাষা ও ভাবের সকল যোগ-সূত্র এবং সংযোগী শক্তি একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। মধুসূদন জানিতেন, তাঁহার কাব্যের প্রধান ক্ষমতা-রহস্য—ভাবাবেশের সহযোগী তাঁহার ভাষার ঐ অনির্ব্বচনীয় মন্ত্রশক্তি! সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে রচনার পরে অন্য কাহাকেও উহাতে সংশোধনাস্ত্র চালাইতে দিলেই তাঁহার কবিতার গুপ্ত এবং সূক্ষ্ম 'প্রাণের ধারা'টিই কাটিয়া যাইবে! 'কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব'র রচয়িতাও কেবলমাত্র শুষ্ক পণ্ডিত অথবা একজন 'যে

সে লেখক' ত ছিলেন না। বঙ্গীয় নাটকের জন্ম-পত্রিকায় তাঁহার অবিসং-বাদিত স্থান আছে। তবু, তাঁহার হস্তেই কবি মধুসূদনকে 'পরিত্রাহি' ডাকিতে হইয়াছে। মেঘদূত-কাব্যের উৎপতন-শালিনী' এবং অলকা-বিহারিণী কাব্য প্রতিভাকেও দিঙনাগ-গণের স্থূল-হস্তের 'পরামর্শ' ভয়ে ভাবিত হইতে বাধ্য করিয়াছিল!

'শর্ম্মিষ্ঠা' রচিত হইল এবং মহাসমারোহে বেলগাছিয়া থিয়েটারে উহার অভিনয়ও হইয়া গেল। সে কালের সংবাদপত্রে উক্ত অভিনয়ের এবং রচয়িতা মধুসূদনের প্রশংসাও আর ধরে না! নব্য তন্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিলেন, বঙ্গসাহিত্যে কবিত্বে, ভাবে এবং ভাষায় উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। উহা একটা নবযুগের আরম্ভ!

মধুসূদন সুরু হইতে এত সচেতন ভাবে এই নব্যযুগের বিদ্রোহ সুর আনয়ন করিলেন যে, যেন 'যুদ্ধং দেহি'-গোছের একটা আহ্বান শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনাতেই জুড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, উহা সংস্কৃত নাট্য-নিয়মের অনুযায়ী কোন প্রস্তাবনা নহে এবং উহাই হয়ত বঙ্গভাষায় কবির প্রথম সচেতন কবিতা।

"শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি?
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ' ঘুম ঘোর — হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারসে অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়!
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তনয় নিচয়।"

অন্য দিকে, প্রাচীনতন্ত্রের পণ্ডিতগণও বলিতে লাগিলেন, "সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা ত নাটকই হয় নাই। সংশোধন করিতে হইলে একটি পংক্তিও আস্ত থাকে না।" হাসি টিটকারীরও অভাব রহিল না।

আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, শর্ম্মিষ্ঠায় কেবল প্রয়োগ-রীতির দিক হইতেই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই নাটকে 'প্রস্তাবনা' নাই, এক একটি অঙ্ককে বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা গিয়াছে, সুতরাং অঙ্কবিশেষে স্থান-কালের ঐক্য একেবারে নাই। সেক্সপীয়র যেমন অরিষ্টোটল-নির্দ্দিষ্ট গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের 'স্থান-কালের-ঐক্য-আদর্শ'কে ইংরেজী নাটকে ধ্বংশ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকের 'অঙ্ক' আদর্শকে বাঙ্গালার নাটকে ধ্বংস করিলেন! ইহা প্রাচীনতন্ত্রের পণ্ডিতগণের মনে বড়ই লাগিল। মধু লিখিয়াছিলেন, "এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পণ্ডিতসংঘকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিব! তবে, বলিয়া রাখি, বেশী আশঙ্কারও কারণ নাই"। "মনে রাখিও, আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, যাহারা আমার ভাবেই ভাবুক; যাহারা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃত-আদর্শের দাস্যশীল অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তাশক্তির চরণেই যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে সর্ব্বপ্রথমে দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য যাহাই প্রকাশ করুন, আমাদিগকে বলিতে হয় যে, বাহ্যিক রীতির ক্ষেত্রে ব্যতীত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃত নাট্য-আদর্শের বিশেষ কোন বড় বিদ্রোহ নাই। উহার মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষার একটা সাদাসিধা সাধারণ আবহাওয়া আছে, এইমাত্র। মধুসূদন সামাজিক ভাব তরফে এমন কোন অনাচার প্রদর্শন করেন নাই, যাহা কালিদাস শূদ্রক ভাস বা শ্রীহর্ষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শর্ম্মিষ্ঠা প্রাচীন 'রত্নাবলীর' আদর্শেই একটা সাচ্চা 'রোমান্টিক' নাটক। আসল কথা, মধুসূদন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজাদের বাধ্য ছিলেন; এবং অভিনয়যোগ্য নাটক লিখিতেছিলেন বলিয়া যেমন সেকালের সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের তেমন অভিনেতৃগণের মন যোগাইতেও বাধ্য ছিলেন। এতসমস্ত সত্ত্বেও শর্ম্মিষ্ঠানাটকে মধুসূদন যেই শিল্প-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপরূপ—তিনি প্রাচীন আর্য্য-নাটকের ভাবগন্ধে এবং ভারতীয় সামাজিক আদর্শের গঙ্গা-স্রোতে যেন নিজের শিল্পি-আত্মাকে একেবারে স্নানপূত করিয়াই তুলিয়াছেন! চিরকাল বিলাতী রীতিনীতি এবং বিলাতীভাবের পোষাকে মন পুষ্ট করিয়া আসিয়াও তিনি একেবারে সপ্তশতাব্দীর ভারতীয় কবির মনো-বৃত্তি, লিপিচাতুর্য্য এবং ভাবুকতা প্রদর্শন করিয়াছেন! সংস্কৃত নাটকের ভাব এবং ভাষার চিদাত্মায় তন্ময় হইতে না জানিলে, অসাধারণ সহানুভূতি-শক্তি না থাকিলে এ-কালের কবির পক্ষে, বিশেষতঃ বিলাতী ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান কবির পক্ষে উক্ত ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব ছিল। শর্ম্মিষ্ঠানাটকে মধুসূদন শ্রীহর্ষেরই আত্মজ বলিলে অতিরিক্ত হয় না; রত্নাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে যাইয়াই মধুকবির অন্তরাত্মায় শ্রীহর্ষের ভাব-সংযোগ এবং আত্মা-পরিচয় ঘটিয়াছিল। উহা হইতে উপনয়ন লাভ করিয়াই তিনি শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

করিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে কোন নবভাবের উপনয়ন লাভ করিতে হইলে অনুবাদরীতি যে কত উপকারী হইতে পারে, মধুজীবনের এই ঘটনাটি তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছে।

এই অনুবাদ ব্যাপারে মধুসূদন-সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং জ্ঞাতব্য কথাই হইতেছে, তাহার শিক্ষানবিশী এবং সংস্কৃত কবি হইতে বাক্য-রীতির উপার্জ্জন। যে লক্ষণ জগতের সাহিত্যেই সংস্কৃত কবিগণকে বিশেষিত করিয়াছে—সেই প্রধান লক্ষণটীই হইতেছে তাঁহাদের বাক্যরীতি। তাঁহারা ভাবকে অপরূপ স্ফুট মূর্ত্তি প্রদান করিতে পারেন। ভাবকে শব্দের বর্ণনাশক্তির মধ্যে এমন প্রোজ্জ্বল এবং প্রমূর্ত্ত ভাবে ধরিতে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে তাঁহাদের তুলনা নাই। মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদেরই দীক্ষা-শিষ্য। মধুসূদন এবং ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতীত বঙ্গের পূর্ব্বাপর কোন কবি ভাষার সেই ধ্বনিগৌরবে এবং ভাবকে তন্মধ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে অধিকার করার শক্তিতে সংস্কৃত কবিগণের নিকটস্থ হইতে পারেন নাই। আর্য্যশব্দের অভিধাশক্তিকে বঙ্গের অপর কোন কবিই মধুসূদন অপেক্ষা সমর্থতর ভাবে কিংবা এমন-তর প্রাণ-মন সহযোগে অধ্যয়ন এবং আত্মস্থ করিতেও পারেন নাই। মধুকবির সংস্কৃতব্যাকরণের বিদ্যা খুব পরিপক্ক ছিল না—তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন "আমি রাজেন্দ্রলালের ন্যায় বজ্রকণ্ঠ বৈয়াকরণ নহি।" না থাকিলেই বা কি হইবে? তিনি যে একজন born linguist অসাধারণ বাক্য-শিল্পী! কবি নিজের জন্মগত অদৃষ্টেই যে-কোন ভাষার অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিবার জন্য অনন্যসাধারণ শক্তি রাখিতেন। ঐ গুণে মধুসূদন বঙ্গভাষার আর্য্যপ্রকৃতিকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহাকে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেও পারেন নাই। এই গুণে তিনি

সংস্কৃতনাটকের অন্তরাত্মার মধ্যেও অনন্য-সামান্য ভাবেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা' মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনেই রচিত। শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ, যযাতি হইতে দেবযানীর উদ্ধার, শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ-উপশমের জন্য দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাস্যে নিয়োগ, যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ, শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির গুপ্তপ্রেম, উহা প্রকাশ পাইলে দেবযানীর ক্রোধ, শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক যযাতির অভিশাপ ও যযাতির জরাপ্রাপ্তি, শর্ম্মিষ্ঠার সন্তান কর্ত্তৃক পিতার জরা গ্রহণ—এ সকল বৃত্তান্ত মধুসূদন অকুণ্ঠিত প্রকারেই মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবে, কবি শুক্রাচার্য্যকে শমগুণান্বিত করিয়াছেন—চঞ্চলচিত্তা এবং অভিমানিনী দেবযানীর প্রতাপ অতিক্রম করিতে না পারিয়াই যেন শুক্রাচার্য্যকে শর্ম্মিষ্ঠার দাস্য এবং যযাতির জরা প্রভৃতি ঘটাইয়া এ নাটকের ঘটনা পরিচালিত করিতে হইয়াছে! শর্ম্মিষ্ঠা সরলা, নিজের অপরাধ বুঝিয়া অনুতপ্তা, সহিষ্ণুতাময়ী এবং ধৈর্য্যময়ী—শর্ম্মিষ্ঠাই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। দেবযানী কোপনস্বভাবা, পতিপ্রেম-বঞ্চিতা অভিমানিনী—কিন্তু স্বামীর নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়ার অব্যবহিত পরেই অনুতপ্তা হইয়া আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন। শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষাও বরঞ্চ দেবযানীর চরিত্র-ধারণাতেই মধুসূদন ভারতীয় নারী-চরিত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শিল্পি-দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, যেস্থলে, বয়স্থা দেবযানী যযাতির প্রতি অনুরক্তা—ব্যাপারটি তাহার সখী শুক্রাচার্য্যকে জানাইতে চায়! কিন্তু দেবযানী লজ্জাভয়ে সে কথা কোন মতেই পিতাকে বলিতে দিবে না! কন্যার পক্ষে এই স্বতন্ত্রতার অবস্থা ভারতীয় সমাজের 'কন্যা' দেবযানীর মনো-

নেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া যমের মতই ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল! আবার, যযাতি ও প্রেমের বিলাসে এবং আবিষ্টতায় একরূপ সর্ব্ববিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু যে-ই রাজধর্ম্মের ডাক পড়িল—প্রজার ধন দস্যুরা অপহরণ করিতেছে, অমনি নিজের সমস্ত ভুলিয়া সমস্ত স্বার্থ-বিলাস ঝাড়িয়া ফেলিয়াই ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ছুটিয়া চলিলেন! ইহা ভারতীয় বর্ণাশ্রমতন্ত্রে ক্ষাত্র-আদর্শের মর্ম্মকথা—বিশেষ ভাবে সংস্কৃত নাটকেরই মর্ম্মকথা। যা'হোক, নব্যতন্ত্রের খ্রীষ্টানকবি কিরূপে যযাতির ঐ দ্বিচারিণী প্রীতি এবং উহার আঘাতপ্রতিঘাতকে সহানুভূতি-যোগে দৃষ্টিপূর্ব্বক নাটকের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিলেন—কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! রত্নাবলী অনুবাদ করিতে গিয়াই যে তিনি এই দৃষ্টি-স্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সমগ্র নাটকটীর মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতনাটকের, বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম-আদর্শের 'ব্রাহ্মণ্য' আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে। খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও, কবির হৃদয় যে অভ্যন্তরে 'হিন্দু' ছিল, উহা তাহারই নিদর্শন। বরং খ্রীষ্টানীর গতিকেই তিনি যেন হিন্দু অপেক্ষাও দূরতর দৃষ্টি স্থান হইতে প্রাচীনভারতের মর্ম্মদেশে বিস্তারিত দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছিলেন! উভয়ের 'তুলনায় পার্থক্য' এবং বিশেষত্ব ও বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন! স্বামী একব্রত্য-আদর্শের ব্যভিচারী হইলেও ভারতীয় নারী কি পরিমাণে তাহার শাস্তি বিধান করিতে পারে, এবং কতদূর পর্য্যন্ত প্রতি[illegible] লইতে পারে? পরিশেষে দয়াই তাহাকে নির্জ্জিত করে। স্বামীকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার জন্যও তাহার ক্ষমতা অথবা হৃদয় নাই, পরিশেষে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের অদৃষ্টকে মানিয়া লওয়াই তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া যায়! ভারতীয় দাম্পত্য আদর্শের একটি উপসিদ্ধান্ত এইরূপে যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রে, যেমন রত্নাবলীতে, তেমন

শকুন্তলাতেও আত্মপরিচয় করিতেছে ; পত্নীকে অত্যধিক self assertion করিতে দেয় নাই ! পণ্ডিতা পত্নীকে বরঞ্চ তাহার দুরদৃষ্ট মানিয়া লইতেই শিক্ষা দিয়াছে। নব্যতন্ত্রী এবং খ্রীষ্টান মধুসূদন উহার সঙ্গেই সহানুভূতি করিলেন। বলা বাহুল্য, ইবসেন প্রভৃতির বিপরীতে ইয়োরোপের অনেক আধুনিক নাটকেও এখন এইরূপ নিবৃত্তির সুরই ফুটিয়া উঠিতেছে। গৃহ-রাজ্যের প্রেম-তন্ত্রে অত্যধিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ যেন বিদ্রোহধর্ম্মী এবং আত্মহত্যা-প্রবণ বলিয়া ইয়োরোপীয় সমাজের নেত্রেও ব্যাপকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

তবে, বলিতে হয় যে, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের শিল্প-সিদ্ধি চিরকালীয় সাহিত্য-আদর্শের দৃষ্টিতে অনেক দিকে দুর্ব্বল বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। মধুসূদন যেই সুযোগ পাইয়াছিলেন, মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানটির মধ্যেই নাটকীয় কৃতিত্ব-প্রকাশের যে বিস্তারিত অবকাশ আছে, সকল দিকে উহার সদ্ব্যবহার করিতে তিনি পারেন নাই ! প্রধান কারণ, শর্ম্মিষ্ঠা প্রায় সকল দিকেই বঙ্গসাহিত্যে 'প্রথমা সৃষ্টি।' মধুসূদনকে যেমন তাড়াতাড়িতে নাটকের শিল্প-কাঠাম গড়িতে হইয়াছে, তেমন চরিত্র-চিত্রনের আদর্শকে, ভাষা ও ভাবুকতার আদর্শকেও সৃষ্টি করিয়াই বঙ্গদেশবাসীকে দেখাইতে হইয়াছে ! শিল্পী নিজের সৃষ্টিকার্য্যে নিজের চূড়ান্ত শক্তিতে ধ্যানস্থ এবং সমুন্মুখী হইবার জন্য সময় এবং সুবিধাও পান নাই।

তবে, নানাদিকে সংস্কৃতনাটকের প্রয়োগ-আদর্শই কবির সম্মুখে খোলা আছে ! সংস্কৃত নাটকের গুণ এবং দোষ উভয়েই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে পুরামাত্রায় প্রকাশিত ! সংস্কৃতনাটকের ন্যায় বাহুল্যময় প্রকৃতি-বর্ণনা, প্রাচীন নিয়মের অলঙ্কারময় বাক্যবিন্যাস, সংস্কৃত নাটকের ন্যায় স্বগত-উক্তিতে পাত্রগণের আত্মপরিচয়" এবং অদৃশ্য ঘটনার বিস্তারিত

বিবরণ প্রভৃতি প্রয়োগরীতি মধুসূদনকে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাট্যকারগণের শিষ্যরূপেই প্রদর্শন করিতেছে।

মধুসূদন কবি, কেবল অভিনয়োপযোগী নাট্যকার নহেন—যেই অভিনেয়তার ক্ষেত্রে পরকালের কবিত্ব-লেশবিহীন লেখকগণও হয়ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য একটা সাহিত্য—নাটকীয় সাহিত্যই রচনা করিতে অবহিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার কবিত্বই এ ক্ষেত্রে শর্ম্মিষ্ঠার বল এবং দুর্ব্বলতা। আধুনিককালের দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতাই উহার ভাষারীতি। মধুসূদন সুন্দর কথা ব্যতীত, ভাবযুক্ত এবং অলংকারযুক্ত বাক্য ব্যতীত এই নাটকে একটি চরণও লিখিতে পারেন নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে তাহার যাহা প্রধান গুণ ছিল, অমিত্রচ্ছন্দে হইলে এই নাটকটিকে যেমন একটা দিব্য-সুন্দর নাট্যকাব্যরূপে পরিণত করিতে পারিতেন, বঙ্গরঙ্গে অভিনেয় নাটকের ক্ষেত্রে আসিয়া উহাই তাঁহার 'প্রধান দোষ'রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আবার, বঙ্গভাষার গদ্য তখনও একটা কাঠাম এবং স্থির মূর্ত্তি লাভ করে নাই—এখনো প্রকৃত প্রস্তাবে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না! ঐ অপরিণতবুদ্ধি এবং অল্পবয়স্কা গদ্য-বাণী লইয়াই মধুসূদনকে একটা সংসার গড়িতে হইয়াছিল। উহার অঙ্গগতি এবং বহিরাকৃতিটাই তখনযাবৎ পূর্ণশ্রী লাভ করে নাই, সুতরাং উহার পক্ষে প্রসাধন এবং অলংকার মাত্রেই মহাভার হইয়া শর্ম্মিষ্ঠায় পদেপদে চলাফেরার গ্লানি জন্মাইতেছে।

বলিতে হইবে, মধুসূদনের কবিত্বই যেমন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের, তেমন তাঁহার সকল নাটকের ন্যূনাধিক দোষ হইয়া গিয়াছে! বঙ্গের নাট্যকলা যেমন অসমর্থ অভিনেতৃগণের তেমন অযোগ্য দর্শকগণের দাসী বই নহেন; দাসীর পায়ে 'সোনার মল' মানাইবে কেন? এখনও, এই ৬০ বৎসর পরেও বঙ্গের কোন কৃতী সন্তান নাট্যবাণীর এই

দাসীপনা একেবারে ঘুচাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না! বর্ত্তমানে বরং নানাদিকে এই দাসত্ব আরও বাড়িয়াগিয়াছে। অর্থদাসত্ব বলিয়া একটা তৃতীয় এবং প্রবলতর বন্ধনরজ্জু বঙ্গের নাট্যসরস্বতীকে একেবারে কাহিল করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের থিয়েটারে কবিত্বের স্থান নাই। অথচ উহাই ত মধুসূদনের নাটকের প্রধান দোষ—They have the fatal gift of beauty. উহাদের মধ্যে কবিত্বময়তা এবং সৌন্দর্য্যরূপী অভিসম্পাত আছে।

শর্ম্মিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পদ্মাবতী নাটক। শর্ম্মিষ্ঠার আশাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হইয়া মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন—"আমি রক্তের আস্বাদ পাইয়াছি, আর একটিতে লাগিয়া গিয়াছি" তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে সাপত্নের প্রতিকূল অবস্থায় ফেলিয়া এবং দুঃখের নিকষে ঘর্ষণ করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়াতোলেন; এখন পদ্মাবতীকেও সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় এবং দুঃখের অভিঘাতের মধ্যে ফেলিলেন! পদ্মাবতী সরলা, সর্ব্বজীবে সদ্ভাবশীলা রাজকন্যা, কিন্তু অদৃষ্টবশে দেবতা এবং সংসার উভয়েই তাহার প্রতিকূল। মধুসূদন এই প্রথম গ্রীক অদৃষ্টবাদকে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতারিত করিলেন। শক্তিহীন সামান্য মানবের সামান্য অপরাধকে দণ্ডিত করিবার জন্য দেবতার সিংহাসন টলিয়াছে। একদিকে দেবরাজ পত্নী শচী ও যক্ষরাজ পত্নী মুরজা, অন্যদিকে মনুষ্যের সংসাররাজ্যের সেই একচ্ছত্রী দেবতাপুরুষ মদনের পত্নী রতি। এই দেবদ্বন্দ্বের জাঁতায় পড়িয়া দুর্ব্বল নর-নারীর সর্ব্বনাশ! মনুষ্যজীবনের নিয়তিকে ঐরূপে দৈবী মূর্ত্তি প্রদান পূর্ব্বক তাহার ভালমন্দকে একটা দেবদ্বন্দ্বের ফল বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না তাহা নহে; মধুসূদন এইরূপে নিজের জীবনের দুর্দ্দশা এবং দুরদৃষ্টকেও রমা এবং বাণীর দ্বন্দ্বফল বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন

কিন্তু ভারতের অদৃষ্টবাদে ঐরূপ দেবদ্বন্দ্বের আদর্শ মোটেই উজ্জ্বল নহে। ভারতের 'অদৃষ্ট' দেবতা মনুষ্যের কর্ম্মফলের বিধাতা বই নহেন। এই কারণে, যে স্থলে জীবনের কর্ম্ম হইতে জীবনের সকল ফল বুঝিতে পারা যায় না, পৌরাণিকগণ সে স্থলে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের সঙ্কেত করিয়াই মনুষ্য-জীবন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন! এখন, দেবীত্রয়ের মধ্যে বিবাদ হইল, কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। তিনজনেই 'ঘুষ' লইয়া নাট্য-নায়ক ইন্দ্রনীলের সমক্ষে উপস্থিত! ইন্দ্রনীল কতকটা মনুষ্যধর্ম্মবশেই—কোন মনুষ্য রতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে না করে—উহার নিষ্পত্তি করিলেন। উহাতেই অপর দেবীদ্বয় "তুমি সৌন্দর্য্য লোভে পড়িয়া এই যে অবিচার করিলে, উহার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া শাসাইয়া গেলেন।" "তোমাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর স্বামী করিব"—ইহাই ছিল রতির প্রলোভন। ইন্দ্রনীলের বিচারনিষ্পত্তি হইতেই তাঁহার উপর রতির প্রসাদ এবং শচী ও মুরলা দেবীর কোপবজ্র পতিত হইল। ইন্দ্রনীল রাজা হইয়া অবিচার করিলেন, ইহাই হইল দেব-কোপের প্রকাশ্য অজুহাত; কিন্তু অনপরাধিনী পদ্মাবতী। তিনি রতির প্রসাদে ইন্দ্রনীলকে স্বামীরূপে পাইয়াও দেব-কোপে বিচ্ছিন্না হইয়া পড়িলেন, স্বামী স্ত্রী উভয়েই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শচী-নিযুক্ত কলিরাজ হইতে নির্যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, পদ্মাবতীর এই অদৃষ্টকে কবি আবার পৌরাণিক আদর্শে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্মাবতী শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা— মুরজারই কন্যা, অভিশপ্তা কর্ম্মের ফল ভোগের জন্যই নাকি ভূতলে, মাতার অজ্ঞাতসারেই জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনীলের ওই প্রলোভন দৃশ্য হোমরেরই অনুকরণ! কবি গ্রীক অদৃষ্টবাদের সহিত ভারতীয় অদৃষ্টবাদ মিলিত করিয়া এই নাটক

রচনা করিলেন। কাশীরাম দাসের শ্রীবৎসচিন্তার উপাখ্যান, মহাভারতের নলোপাখ্যান, বিশেষতঃ মনসামঙ্গল প্রভৃতির সহিত পরিচিত বঙ্গসমাজের সমক্ষে ইহা কোথাও বিরূপ বোধ হয় নাই! তবে এই নাটক ট্রেজিডী নহে, পরিশেষে ভবানীর অনুগ্রহেই দেবরোষ পরাবৃত্ত হইয়াছে—এবং ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী পুনর্মিলিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকে কবি যেই কলা-শক্তি এবং গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বলিতে হইবে, তাহার তুলনা কবির অন্য কোন নাটকে নাই।

কবি অগ্রগামী অজুহাতরূপে লিখিয়াছিলেন, "আমার এই নাটকে কিছু-না-কিছু বিদেশী আবহাওয়া থাকিবেই। কিন্তু, ভাষা যদি বিশুদ্ধ হয়, ভাব যদি অবার্থ এবং প্রাঞ্জল হয়, উহার ঘটনাচক্র যদি চিত্তাকর্ষক হয়, চরিত্রাঙ্কণ যদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে বিদেশী আবহাওয়া থাকিলেই বা কি আসে যায়? মুরের কবিতায় প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলিয়া, বায়রণের কবিতায় এসিয়ার বাতাস আছে বলিয়া, কিংবা কার্লাইলের লেখায় জর্ম্মণী ভঙ্গী আছে বলিয়া কি কেহ উহাদের অশ্রদ্ধা করে?"

এইরূপ নাটকের প্রধান দোষ এই যে, উহাতে মনুষ্য-চরিত্র আপন মাহাত্ম্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ইচ্ছাকৃতির স্বাতন্ত্র্যেই মনুষ্য-চরিত্রের প্রধান মাহাত্ম্য—অথচ, এইরূপ নাটকে মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যই থাকে না। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং ঐ জাতীয় গুণেই কেবল ঈদৃশ দৈবী পরীক্ষায় আত্মপ্রমাণ করিতে পারে। উহাতে পুরুষের চরিত্র একেবারে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইয়া যায়, কেবল স্ত্রী চরিত্রই যৎকিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এ নাটকের মধ্যেও তাই পদ্মাবতীর চরিত্রই আমাদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিতেছে—ইন্দ্রনীল একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছেন!'

পদ্মাবতী নাটক পড়িতে আরম্ভ করিলেই মনে হইতে থাকিবে, যে ব্যক্তি ইহা রচনা করিতেছেন তিনি কবি—গদ্যে লিখিতে থাকিলেও অসাধারণ কবি। ইঁহার কবিত্ব শক্তি, বাক্যের বর্ণনা শক্তি, ঘটনার সৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়ের সহানুভূতি অসাধারণ। বঙ্গভাষার সেই অবস্থায় একেবারে শূন্য হইতে যে ব্যক্তি এরূপ একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার ক্ষমতা একদিকে যুবক সেক্সপীয়রের মতই অসামান্য! বর্ণ বৈচিত্রের প্রাচুর্য্যময় বাক্যশক্তি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ। শব্দের দিকে, শাব্দিক কবিত্বের দিকে, খণ্ডপদের সৌন্দর্য্যের দিকে ইহার চিত্ত অবহিত আছে। চরিত্র সমূহকে সংশয়ে অথবা সমস্যায় ফেলিয়া উহা হইতে ভাবের গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করার দিকে নাট্যকারের দৃষ্টি সবিশেষ সতর্ক নহে। কবির ভাষার গতি অন্তর্মুখী নহে সত্য, কিন্তু কবি যে অদ্বিতীয় বাক্য-শিল্পী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হয় না—এই গদ্য রচনা দেখিয়াই নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। কবির গদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। সময় সময় হয়ত ভাষার মধ্যে ভাবুকতার চাকচিক্যময় উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া, এবং কেবল গল্পটাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াই নিবৃত্ত হইতেছে। কেবলই মনে হয় কবি যদি ব্যাপারটিকে ছন্দের মধ্যে ধারণা করিতেন, ইহা যদি শেক্সপীয়রীয় আদর্শের একটা গদ্য-পদ্য ময় নাটক হইত! তা হইলেই কবি সুফল প্রাপ্ত হইতেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য রূপেই দাড়াইয়া যাইত। কবির সম সাময়িক চিঠিগুলি আমাদের এই ধারণাই সমর্থন করিবে। "যদি কেবল পাখা খুলিতে পারিতাম, যদি কেবল অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে পরিতাম!" কখনও যেন চীৎকার করিয়াই বলিতেছেন, "অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে না পারিলে বাঙ্গলা নাটকের কদাপি উন্নতি নাই" "তোমরা সেক্সপীয়রের নাট্যআদর্শে আমার

এই নাটক বিচার করিও না। সেক্সপীয়রের ভাষা, সামাজিক ভিত্তি কিংবা রঙ্গালয়ের অবস্থা লাভ করিতে এখনো বাঙ্গলা নাটকের অনেক বিলম্ব আছে।" আবদ্ধপক্ষ ঈগলপক্ষীর ন্যায়, নিজের দোষগুণ বিষয়ে পূর্ণ-চৈতন্য-বান্ শিল্পী যাতনায় যেন হাঁপাইতেহাঁপাইতে এইরূপে অপরাধভঞ্জনের চেষ্টাই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনো অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হয় নাই বলিলেই হয়। দুই একজন কবি অস্থির ভাবে চেষ্টা মাত্র করিয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা নাটক এখনো সারস্বতপুরীর বহির্দ্বারেই যেন দাঁড়াইয়া আছে—সাহিত্যের সনাতনগৃহে প্রবেশ করার দাবী টুকু করিতেও সাহস করিতেছে না। সাময়িক পত্রাদির ন্যায় কেবল সামাজিকগণের সাময়িক মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য করিয়া, কেবল অশিক্ষিত অভিনেতৃগণের মাপ-তালে এবং সাধারণ দর্শকগণের করতালির সহিত 'সঙ্গৎ' বাঁধিয়া চলাই সার করিয়াছে!

তবে মধুসূদন ত ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। পদ্মাবতী নাটকেই কতিপয় স্থলে অমিত্রচ্ছন্দ অবতারিত করিয়াছেন। এ সমস্তই বোধ করি বঙ্গভাষায় প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের নমুনা। উহাতেই তাঁহার পঙ্গপোষক মহারাজা যতীন্দ্র মোহন কি লিখিয়াছেন দেখুন— "আমি বাঙ্গলা নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ চাই, কিন্তু উহা ধীরে ধীরে অবতারিত করিতে চাই। প্রথমতঃ, এই কাজ খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক—মানুষ যাহাতে ভাগিয়া না যায়। উহাতে, ররং আমাদের উদ্দেশ্যটাই বহু বৎসরের জন্য পণ্ড হইয়া যাইবে।" দেখিলেন। অমিত্রচ্ছন্দ অভিনয় করার উপযুক্ত লোকই তখন ছিল না! একেত অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনাই একটা বিদ্রোহের কথা—তন্মধ্যে উহা আবার নাটকে! শ্রোতৃবর্গ কবিকে একেবারে

'দশ ইঞ্চি' ছুঁড়িত! ফরাসী ভাষার 'সাধুতা' অমান্য করিয়া, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়াই নাকি ভিক্টর হুগো 'হারনেনী' নাটকে একটা 'অসাধু' শব্দ ব্যবহার করেন—উহার দরুণ প্যারী-নগরীর এক থিয়েটারে দুইটি যোদ্ধ-পক্ষের মধ্যে একেবারে একটি দাঙ্গা হয়!

৫

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের শেষ কবি-ওয়ালা শ্রেণীর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, ঐ সনেই মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইতে থাকে। তিলোত্তমাসম্ভব নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কাব্য। কেবল কালের হিসাবে নহে, কেবল ভাষারীতি এবং ছন্দের হিসাবে নহে, উহা কাব্যের অন্তরাত্মা এবং পরিব্যক্তির ক্ষেত্রেও বঙ্গে আদ্যাসৃষ্টি। নিখুঁত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ঋক্-সঙ্গীতময় মহাকাব্য! সৃষ্টির আদিম যে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি, যে সৌন্দর্য্য সবেমাত্র অনন্তত্ব হইতে স্ফুটমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, যে সৌন্দর্য্য সবেমাত্র বিশ্বকর্ম্মার হৃদয় এবং তাঁহার দৈবী সৃষ্টিশালা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিমোহিনীর মূর্ত্তিতে বিশ্বের বিস্মিত নয়নসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি তখনো কাহারও কন্যা অথবা বধূরূপে সম্বন্ধ লাভ করে নাই—সে সম্বন্ধ কখনও লাভ করে নাই—কবি তাহারই মহিমা-গীতি গান করিয়াছেন! যাহা সাহিত্যে সকল আদিরসের আদিতম রস কবি তাহারই পরিস্ফুট নগ্নমূর্ত্তি এ কাব্যে ধ্যান করিয়াছেন! তাই একদিকে এ কাব্যে কোন সুস্পষ্ট 'মনুষ্যরস বা human interest নাই; উহা কেবল সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য-উপাসনা—An art for art's Sake! নবসাহিত্যের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, উহার নব যৌবনের বসন্ত-প্রভাতে যে পিকবর সৌন্দর্য্যের এই আদিম উষা-মূর্ত্তির উদাত্ত মহিমা উন্মত্ত-পঞ্চমে গান করিয়া গেল—বঙ্গবাসী যুগযুগান্তের নিদ্রা হইতে মাথা

তুলিয়া যে গানে যুগপৎ মুগ্ধ, এস্ত এবং আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার পশ্চাতে শক্তিমাতার অপরিসীম দয়াপক্ষপাত এবং মুক্তহস্তের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? যে ব্যক্তি দীনদরিদ্র—ভিখারী—ধনীব্যক্তি এবং রাজারাজড়ার দ্বারে উদরান্নের জন্যই কাঙ্গাল, জগন্মাতা তাহার কপালেই এইরূপে অক্ষর লোকের দীপ্ত উজ্জ্বল টীকা দান করিয়া—মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ললাট-টীকা পরাইয়া দিয়াই যেন অন্তরাল হইতে হাসিতে লাগিলেন। ইহাই হইল নবসাহিত্যে মধুসূদনের এবং তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভবের স্থান?

এই প্রথম কবিতা, উহার আরম্ভের ধবলগিরির মতই প্রচণ্ড-উজ্জ্বল এবং অভ্রভেদী শুভ্রতার মাহাত্ম্যে, দৃঢ়-রুক্ষ, উচ্চাবচ-বন্ধুর এবং সংঘাত-কঠিন গৌরবেই নব্যবঙ্গসাহিত্যের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া আছে! উহা হইতে নব-নবতীমুখী ভাব গঙ্গার ধারা-প্রবাহ ছুটিয়া আসিয়াই পরকালে বঙ্গদেশের মহাকাব্য, কাব্য, খণ্ডকাব্য এবং গীতি কবিতার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে!

উহাতে একদিকে যেমন প্রাচীন বঙ্গদেশের ভাবরাজ্যে এবং ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহ আছে, তেমন অন্যদিকে উহার ভিত্তিমূল বৃহৎ-ভারতের নিত্যকালীয় অন্তরাত্মার মধ্যেই স্থির আছে? উহা একদিকে বঙ্গভাষাকে তাহার বিস্মৃত 'আর্য্য মাতা'র সম্বন্ধসূত্রে সচেতন রাখিতেছে, অন্যদিকে মহামানবের নিত্যকালীয় ভাবুকতার আকাশেই মাথা তুলিয়া মানব-কৌলিন্যের ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। স্থির ধীর আদর্শের দৃষ্টিতে উহার হয়ত অনেক দোষ আছে—কিন্তু সমস্তই শক্তির দোষ, প্রচণ্ডতা এবং প্রাচুর্য্যের দোষ—দারিদ্র্য দোষ নহে।

উহার ছন্দের মধ্যে যে বিদ্রোহ—তাহা নাকি একরূপ রাষ্ট্রী

রাখিয়াই বিদ্রোহ! মহারাজা যতীন্দ্র মোহন বলিলেন "বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন অসম্ভব—বঙ্গভাষার প্রবণতা উহার বিরোধী! ফরাসীভাষার ন্যায় উহা কেবল কোমলে-মধুরেই চলিতে পারে, কেবল 'রিনিঝিনি নুপুর' চরণে চলিবার জন্যই উহার শক্তি"। মধুসূদন বলিলেন, "অসম্ভব কথা নাই মম অভিধানে। বঙ্গভাষা মহিমাময়ী সংস্কৃতভাষার আত্মজা, সংস্কৃত ভাষার 'লঘুগুরু' ভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারিলে বঙ্গভাষা যে-কোন তালেই চলিতে পারিবে"। যতীন্দ্র মোহন বলিলেন—"না"। এই 'না' কে পথে আনিবার জন্যই, চিরকালের 'বন্ধ-গোঁয়ার' কবি একেবারে 'তিলোত্তমা সম্ভব' আমদানী করিয়া ফেলিলেন! বাজীতে মধুসূদনের জিৎ হইল—যতীন্দ্র মোহন নিজের ব্যয়ে উহা প্রকাশ করার ভার লইলেন।

যতীন্দ্র মোহনের এই 'নিজের ব্যয়ে প্রকাশ'। উহার মধ্যেই কবি-জীবনের আসল রস টুকু নিহিত আছে। কাব্যটী ত বাজারে বিকাইবে না—অথচ ওই পরিমান অর্থের অপব্যয় করিতেও কবির সামর্থ্য নাই। সুতরাং প্রকাশটাই বাঙ্গালার নব কবির পক্ষে পরম লাভ ছিল।

প্রকাশের ফল অবিলম্বেই ফলিতে লাগিল। একদিকে কবির পৃষ্ঠ-পোষক যতীন্দ্র মোহন প্রভৃতি কয়েকজন হাতের অঙ্গুলিগণনীয় ব্যক্তি—অন্য দিকে বিশাল বঙ্গসমাজের অপরিমেয় হাসিঠাট্টা-টিট্‌কারী, ঢিল-ইটপাটকেল, গুপ্ত এবং প্রকাশ্য নানাবিধ অস্ত্র সন্ধান! মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিলেন, "আমি জন্মযোদ্ধা, যুদ্ধ করিতেই আমার আনন্দ। আমার স্বদেশের সাহিত্য উন্নত করিতে পারিলে, আমি তাহার পরিবর্ত্তে সমগ্র রুশীয়ার সাম্রাজ্য-মুকুট ও চাহি না। তোমরা যেই-কয়েক-জনে বল যে তিলোত্তমা সম্ভব একটা জিনিষ হইয়াছে, তাহাতেই

আমার আশু তৃপ্তি। আমি জানি, ভবিষ্যৎ বংশ আমাকে বঙ্গভাষার উদ্ধারকর্ত্তা এবং বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই পূজা করিবে!" এই ভবিষ্যৎ-বুদ্ধি; এবং আপনার অমৃতকর্ম্মে স্থির প্রতীতি! ইহাই ত অনাহারী কবিগণের একমাত্র খোরাক—তাহাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি! তাহাদের সকল কলকারখানার ইন্ধন! এইরূপ একজন উন্মত্ত এবং 'গোবিন্দ-গোঁয়ার' না হইলে কে মরিয়া-মরিয়াও বঙ্গভাষার 'উদ্ধার' করিতে যাইত।

তিলোত্তমা-সম্ভবের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যেই গৌরববুদ্ধির সহিত উহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আপনাকে উক্ত কাব্যের রচনাসংশ্লিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ বংশের শ্লাঘার সামগ্রীবোধে যে দৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল রাজনারায়ণ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যেমন 'বড় গলায়' উহার সমালোচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহারা এবং মধুর অপর দুই-চারিটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত সেই যুদ্ধে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবার জন্য আর কোন সঙ্গীই ছিল না। সাধারণ সামাজিকের কথা বলিতে গেলে,—বালক মধুসূদনের পূর্ব্ব ভাষায়—তিলোত্তমাসম্ভব Was dedicated to a Pigmy!

এখন তিলোত্তমা-সম্ভব আপন মাহাত্ম্যেই বঙ্গ সাহিত্যের চিরস্থায়ী রত্নভাণ্ডারে আদি আসন লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! বঙ্গের সাহিত্য-রসিক মাত্রই উহার অতুলনীয় বিশেষত্ব অবগত আছেন। উহার বস্তু-সমালোচনা করাও এখন নিষ্প্রয়োজন! সেই প্রাচীন কাহিনী—সুন্দ উপসুন্দ কর্ত্তৃক স্বর্গজয় এবং তাহাদের বধার্থে তিলোত্তমার সৃষ্টি—ইহা জানেন না, বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল! কিন্তু কবি ওই সামান্য কাঠামের উপর কি যাদুবিদ্যার বস্তু-বর্ণ-রস এবং ভাবের আত্মা সংযোগ করিয়া এই সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন

—যাহার মাহাত্ম্য ব্যক্তিগত রুচিভেদে সহস্রদোষ-দর্শন সত্ত্বেও সাহিত্য-সাধক এবং সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে চিরকাল অটুট আছে!

কেবল তাহাই কি? আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন ঐ সময়ে একেবারে সব্যসাচী হইয়াছিলেন! শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশের পর এবং তিলোত্তমা প্রকাশের পূর্ব্বে মধুসূদন আর দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন, যাহারা অন্য একদিকে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকেই—বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দুইখানি প্রহসন! "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"। আমরা জানি, তিনি এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পরে একপ্রকার অনুতাপই করিয়াছেন। "I half regret having published those two things." রাজ নারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি জান, এখনো জাতীয় থিয়েটার বলিয়া এক পদার্থ আমাদের দেশে জন্মলাভ করে নাই। তাহার অর্থ এই যে, এখনো আমরা যথেষ্টসংখ্যায় নাটক, সুস্থির শিল্প-আদর্শের এবং উন্নত-আদর্শের নাটকই রচনা করিতে পারি নাই—যাহাতে দেশের সুরুচি গঠন এবং পরিচালন করিতে পারে। আমাদের এখনো প্রহসন রচনা করার সময় হয় নাই"। এই 'দেশের কথা' এবং দেশের সাহিত্যের জন্য লোকটীর মাথাব্যথা! তবু সাহিত্য-রসিক মাত্রেই জানেন, এ দু'টি প্রহসনই কেবল বঙ্গের আদি প্রহসন নহে, উহারা এখনযাবৎ আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত প্রস্তাবে অজেয় আছে! উহাদের সমকক্ষ পদার্থও আমরা এখন যাবৎ বেশী সৃষ্টি করিতে পারি নাই! উহাদের প্রদর্শিত পন্থাই এখন যাবৎ অনুসৃত হইতেছে! এই দু'টি প্রহসনে মধুসূদন যেন একটা 'দোমুখো' করাত হাতে লইয়াই, যুগপৎ বিলাতীসভ্যতার 'বাঁদরামীকে' এবং 'দেশীয় হিঁদুয়ানী'র ভণ্ডামীকে সরলভাবে কাটিয়াছেন! স্বয়ং

'চণ্ডমুণ্ড' দলের একজন সেরা হইয়া উহার পেটের মধ্যেই সোজাসুজি এইরূপ অস্ত্রচালনা! ইহাতে বিশিষ্টতা আছে।

আবার, মধুসূদনের এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী গ্রন্থগুলিন কি-ভাবে রচিত হইত তাহার একটা চাক্ষুষ বিবরণও এক বন্ধু আমাদিগকে দিয়াছেন! "লিপিকারগণ বসিয়া গিয়াছে—মধুসূদন একবার ইহার দিকে, একবার উহার দিকে চাহিয়া বলিয়া যাইতেছেন।" রচনা-প্রণালীর মধ্যেও বোধ করি কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা আছে।

তিলোত্তমাসম্ভবের ভিতরের কথাটা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণের জ্ঞাতব্য হইয়া আছে। এই কাব্যে মধুসূদন ইংলণ্ডের কীটস্ এবং ভারতের কালিদাসের ন্যায় নিখুঁত সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের কবি। মধুসূদনের মধ্যে গ্রীক এবং ভারতীয় সৌন্দর্য্যবাদ সম্মিলিত হইয়াই অপরূপ মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য একেবারে আত্মজাগ্রত বা Self conscious হয় নাই, সচেতন হইয়া দার্শনিকতা লাভ করিলে উহার কি মূর্ত্তি হইত, তাহা চিরকালের জন্য সহৃদয়গণের চিন্তাস্থলী হইয়া আছে। কবি কীটসের Endymionএর ন্যায় উহা নিখুঁত সৌন্দর্য্যমুগ্ধ এবং ভাবকতাময়ী মহাবালার আত্মসিদ্ধ প্রকাশের শক্তিতেই সমৃদ্ধিময় হৃদয়খানি লইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিল—এখনও অসঙ্গ মাহাত্ম্যেই দাঁড়াইয়া আছে! উহার প্রকৃত কোনও উত্তরাধিকারী বঙ্গসাহিত্যে জন্মে নাই! কেবল হেমচন্দ্র যে উহার দেবাসুর-দ্বন্দ্বের চরিত্রকে বৃত্রসংহারে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইন্দ্র এবং শচী-চরিত্রের গুণ-বর্ণ-ধর্ম্ম যে তিলোত্তমাসম্ভব হইতেই লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিস্ফুট ভাবে দেখিতেছি! তিলোত্তমার পরিণাম সর্গ—উহার চতুর্থ সর্গ—যেন আকস্মিক ভাবেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে! কবি যেন অতি মহিমান্বিত উপক্রম করিয়াই, অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে, ভয়ে-ভয়েই গান বন্ধ করিয়াছেন। এই

দোষে তিলোত্তমা সম্ভব সহৃদয়ের চক্ষে অপরাধী হইয়া আছে। কিন্তু, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ কি মহনীয় শক্তি-প্রাগল্‌ভ্য এবং সৌন্দর্য্যমত্ততায় উদ্ভাসিত! উহার ভাষা ও ছন্দের দুর্ব্বৃত্ততা এবং দৌরাত্ম্যগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত বিশিষ্টতা আছে! তিলোত্তমা সম্ভব স্বনাম-ধন্য ভাবেই নব্য বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যকীর্ত্তির নান্দীময় মহাসঙ্গীত! সাহিত্যরসিকের এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও উহা অমূল্য।

তিলোত্তমা সম্ভব সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবির প্রথম কাব্য। মধুসূদন চির-জীবন সৌন্দর্য্যের 'অঙ্গনা'-তত্ত্বে এবং উহার অঙ্গনা-মূর্ত্তিতেই মুগ্ধ। তাঁহার সৌন্দর্য্য নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! সৌন্দর্য্যের পুরুষমূর্ত্তি চন্দ্র বা সুন্দ উপসুন্দের মূর্ত্তি, জগৎসিংহ ইন্দ্রনাথ জ্যোতি বা শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তিও মধুসূদনের নিকট প্রকৃতপ্রস্তাবে তত বরেণ্য কিংবা হৃদ্য নহে। আপন চরিত্রের প্রবল আন্তরিক ধর্ম্মে, সাংসারিক ঝটিকাবর্ত্তে নারী-মান্ মধুসূদনের প্রকৃত স্বধর্ম্মে কেবল রাবণ বিশেষ কবির ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। নতুবা সৌন্দর্য্যের ধাত্রীভূমি কবি-হৃদয়ের সমগ্র অর্চ্চনা এবং অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে! শর্ম্মিষ্ঠা পদ্মাবতী, তিলোত্তমা প্রমীলা তারা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যে বহুরূপবতী সুন্দরীসংঘ—ইহারা মধু আত্মার আনন্দ-সম্ভাবময়ী প্রেরণা। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত তাঁহার কাব্যের পুরুষগণ এই সমস্ত নারী-শ্রীময়ী সৌন্দর্য্যলতার এক একটি আশ্রয় বা 'সহকার' ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির এই স্ত্রী-পক্ষপাত না বুঝিলে কবিকে কোন দিকে ভালরূপে বোঝা হইবে না।

তিলোত্তমা কাব্যের মূলরহস্য কি? উহার মধ্যে কবি সর্ব্বপ্রথম আপন কবিত্বে সচেতন হইয়াছেন! সৌন্দর্য্যের সম্ভব বা জন্মগান করিয়াছেন! বিশ্বের সমস্ত সুন্দর পদার্থ হইতে তিল তিল সংগ্রহ করিয়া এই যে বিশ্ববিজয়িনী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া গেল—যাহা পৌরাণিক

কবির অতুলনীয় পরিকল্পনার নিদর্শনরূপে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার দিকেই নবজাগ্রত কবি-আত্মার প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। অন্যকবি জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব গাইতে পারেন কিন্তু নব্যবঙ্গের এই নবপ্রবুদ্ধ আদি কবি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতত্ত্ব—উহার সম্ভবতত্ত্বই গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। কীট্‌স কবির প্রথম গ্রন্থ Endymion প্রথম পংক্তিতেই গাহিয়াছে—

A thing of beauty is a joy for ever!

আনন্দ—চিরানন্দ দান করাই সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্ব উত্তম এবং সর্ব্ব-বলীয়ান কার্য্য। কীট্‌স সৌন্দর্য্যের অন্যসমস্ত দিক্ গৌণ করিয়াছ, নিজের হৃদয়ে কেবল এই আনন্দ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যাদিতে কেবল এই মূর্ত্তিরই অনুভব এবং নানামুখী ধ্যানধারণা করিয়াছেন। Endymion এর শতসহস্র দোষ সত্ত্বেও, উহা কেবল বিশ্বসৌন্দর্য্যের বস্তুনিষ্ঠ অথচ ভাবগত অনুভূতি, সম্ভোগ এবং স্তুতিগানেই আপনাকে পাঠকের আনন্দ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, রোমাণ্টিক শিল্প-কবিতার অনাবিল প্রতিমা এবং প্রমত্তি রূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিলোত্তমা সম্ভব ও কেবল নির্ব্যূঢ় সৌন্দর্য্যবিলাস এবং সৌন্দর্য্য-মন্দিরের আরতি রূপেই আপনাকে পাঠকের হৃদয়-সন্নিকটে আনিয়াই আত্মপরিচয় করিতেছে! যে এই তত্ত্ব না বুঝিল সে বঙ্গে রোমাণ্টিক কবিতার আদিগ্রন্থ তিলোত্তমা সম্ভবকেও চিনিল না!

এই কাব্যের মধ্যে প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এবং যেই কাল্পনিক নিসর্গসৌন্দর্য্যের দিব্যোন্মাদময় বিলাস আছে—গ্রন্থের ঘটনা-চক্রকে একরূপ চাপা দিয়াই যাহা উদ্দাম হইয়া গিয়াছে, তাহা তিলোত্তমা নায়িকারই অপরিহার্য্য অঙ্গ। ঐ সমস্তকে বাদ দিলে তিলোত্তমা সুন্দরীর সম্ভবই যেন অসম্ভব হইয়া পড়ে! তারপর,

সুন্দরীকে অধিকার করার জন্য সেই সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ, উহাও ত অপরিহার্য্য! তথাপি, কবি ওই ধ্বংশতত্ত্বকে যথাসাধ্য গৌণ করিতে, একরূপ চাপা দিতেই চাহিয়াছেন! এইরূপ "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"-জাতীয় সুন্দরী, ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে, সংসার ধ্বংস করে, চিরকাল মানুষের আসুর ধর্ম্ম উত্তেজিত করিয়া তাহাকে অপরিহার্য্যভাবে বিবাদবিগ্রহ এবং মৃত্যু পথেই লইয়া যায়; দেবধর্ম্মী ব্যক্তিরাও অতিকষ্টে তাহাকে একান্তভাবে অধিকার করিবার প্রলোভনটি এড়াইতে পারেন! তাহাকে বধূত্ব এবং বধূধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই হইবে—না করিলে সমাজ হইতে তাহার নির্ব্বাসন। কবি মধুসূদনও কাব্যশেষে তিলোত্তমাকে সূর্য্য-লোকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ওই সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ দেখার ত উপায় নাই—উহাতে সংসার ও সমাজ দগ্ধ করিবে! বাস্তবিক তিলোত্তমার রূপ সুধামণ্ডলনিবাসিনী দেবতারই যেন ঘনরূপ! সবিতা হইতেই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যেই বিশ্বসংসার বর্ণ-রূপ-রসে 'সুন্দর' হইয়া আসিয়াছে! বিশ্বসংসার হইতে তিলতিল করিয়া পুনর্ব্বার যে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তরূপে ঘনীভূত হয় সেই মূর্ত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহার? সংসার, উহাকে কেবল প্রতিবিম্বে ব্যতীত দেখিবার শক্তি রাখে না। সুতরাং এখন এই 'সুন্দর' বিশ্বমধ্যে আমরা সেই সুধামণ্ডলনিবাসিনী তিলোত্তমার বিম্ব-প্রতিবিম্ব এবং অনুবিম্ব মাত্রই দেখিতেছি!

আমরা জানি, পরকালে বঙ্গের অপর একজন বড় কবি, ইয়োরোপীয় বিশেষতঃ ফরাসিস সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের শিষ্যতায় "এই নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ" প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিই একটি ক্ষুদ্র কবিতায় দর্শন করিয়াছেন! শীলারের Pan is dead নামক কবিতার পথে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত কবিতার শেষ শ্লোকে "ফিরিবেনা ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরব শশী" ইত্যাদিরূপ অনুশোচনাও ছিল! এখন সেই অনুমিত

বলী" রচনা করিয়াছিলেন, এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া অর্থাগমের প্রত্যাশায় 'বিদ্যালয়পাঠ্য হেকটর বধ ও নীতি কবিতাবলী রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন মায়াকানন নামক একটি অসম্পূর্ণ নাটক এবং বহু খণ্ড কবিতা, কাব্য এবং নাটকের অসম্পূর্ণ চেষ্টা, নক্সা এবং পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ আমাদের হাতে আসিয়াছে। তিলোত্তমা সম্ভব রচনার পর বন্ধু রাজনারায়ণ জাতীয় ভাবের দিকে মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সিংহলবিজয় ঘটনাটি এ যাবৎ কাব্যসাহিত্যে একেবারে অনামৃষ্ট হয় নাই। শক্তিশালী বঙ্গকবির পক্ষে ঐদিকে একটা গুপ্ত সোনার খনি আছে—যে অধিকার করিতে পারে উহা তাহারই! মধুসূদনের জন্য কথা যোগাইবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত রাজনারায়ণ 'সিংহলবিজয়ের' একটা ছোট খাট নক্সাও প্রস্তুত করিয়া দেন মধুসূদন নিজেও একটি কাব্যনক্সা প্রস্তুত করেন। কিন্তু, মধুসূদন 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে 'সিংহলবিজয়' গান করিবার জন্য নিজকে প্রস্তুত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে কবির পত্রখানি কবিজীবনের অন্তঃপুরে প্রদীপ্ত আলোকপাত করে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। প্রকৃত মধুকবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পত্রগুলির সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা পাঠক এবং বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে কবির শিল্প-আদর্শ এবং জীবনের আদর্শ বিষয়ে নবনব সত্যের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে একজন দ্রষ্টার এবং সমর্থ শিল্পীর মুখে যেই সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, অন্যত্র তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। শিল্পী তাহার নিজের কলা-বিভাগের ক্ষেত্রে কি পরিমাণে আমাদের শিক্ষক ও পরিচালক হইতে পারেন? সাহিত্যের পাঠকমাত্রের নিকট ঐ প্রাপ্তি মহার্ঘ না হইয়া পারে না, এবং কবিজীবনীর ক্ষেত্রে

অবস্থা-বস্তু কোনসূত্রে আসিয়া গিয়াছে, এস্থানে তাহারই আভাষ পাইতেছি।

তারপর, কাব্যসৃষ্টির অন্তরঙ্গীয় প্রধান কথা সহানুভূতি—কবির নিজের সহানুভূতি এবং অন্তরঙ্গ প্রীতি কাব্যের কোন পক্ষের দিকে থাকিবে? কবি-চর্য্যার অন্তর্দ্দেশে, কবির ভাবুকতার অন্তরঙ্গেই কোন-না-কোন একটা বিশেষপ্রীতি এবং ভাবাভিসন্ধির ঝোঁক না থাকিয়া পারে না। কবি যতই নিরপেক্ষ বা নিঃসম্পর্ক ভাবুকতায় বিজাতীয় বিভিন্ন বর্ণবর্ম্মের চরিত্র অঙ্কন করুণ না কেন, যতই বৈচিত্র্যমুখর সুর-তাল-ছন্দ ভাব কিংবা রসের ক্ষেত্রে বিহার করিতে থাকুন না কেন, তাহার একটা-না-একটা বিশেষ-গুপ্ত হৃদয়-বস্তু, একটা অন্তঃসংজ্ঞ প্রিয়তার টান, প্রীতি পক্ষপাত এবং অন্তরঙ্গ সহানুভূতির একটা ভাব-বন্ধন আছেই আছে। এই সূক্ষ্ম ভাব-যোগটাই তাহার কাব্য-চক্রের কেন্দ্র, প্রয়োগবাহিনীর দিক্‌-দর্শনা এবং অন্তর্গুপ্ত পরিচালনারূপে তাঁহার সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। মেঘনাদের সৃষ্টিতে উহার স্রষ্টার পক্ষে এই সূক্ষ্ম ভাবযোগ, উহার প্রাণ-পরিচালনা প্রীতিযোগ কোন্‌দিকে—কোন পক্ষে ছিল? নিম্নের পত্রাংশে দেখিব, মেঘনাদবধ রচনার প্রবেশ-পথেই মধুসূদনের সমক্ষে কত বড় একটা সমস্যা, কত বড় একটা সংকট ছিল। এমন পথ সঙ্কট যে, কবিকে একটি পথ অবলম্বন করিতেই হইবে, এবং এই নির্ব্বাচন হইতে সেই মুহূর্ত্তে সমগ্র কাব্যটির বর্ণ-চরিত্র-আত্মা এবং অদৃষ্টলিপি অপরিহার্য্য ভাবেই স্থির হইয়া যাইবে।

মধু লিখিয়াছিলেন, "কবিগুরু যদি তাহার রামচন্দ্রকে কেবল কতকগুলি মনুষ্য-অনুচর দিতেন, তা হইলে আমি মেঘনাদকে আর্য্য-জয়ের ইলায়ড রূপে পরিণত করিতে পারিতাম।" মধুসূদন কাব্যের গঠন এবং কাব্যের রসনিষ্পত্তির অনুরোধে কিরূপে বিজিত পক্ষের

সঙ্গে—রাক্ষস পক্ষের সঙ্গেই সহানুভূতি করিবার পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন, এই স্থলে আমরা তাহাই দেখিতেছি! ইলীয়ডে হোমরের রস-নিষ্পাদনী সহানুভূতি স্বাজাত্যের সূত্রে বিজয়ী গ্রীকপক্ষের দিকে ছিল—মধুসূদন সেই সূত্র পাইলেন না! সুতরাং, তিনি হোমরের অনুসরণ করিয়াও ইলীয়ডের শিল্পাত্মার গুপ্ত রসাভিসন্ধি অনুসরণ করিতে পারিলেন না! হৃদয় দিয়া, প্রাণমনের উচ্ছ্বাসে স্তব করিয়া আর্য্যের জয় গান করিতে পারা গেল না, কেন না, কল্পনার উল্লাসের জন্য ঐশ্বর্য্যবস্তুর অবলম্বনটি তিনি মেঘনাদকাব্যের বিজয়ী পক্ষের মধ্যে খুঁজিয়াই পাইলেন না। ঐশ্বর্য্যরস-বিলাসী কবি রামচন্দ্রের 'বানরচমূর' মধ্যে তাঁহার হৃদয়রাণী, ঐশ্বর্য্যমহিমাময়ী এবং 'ভিখারী রাঘবের' প্রতি তীব্র অবজ্ঞাময়ী প্রমীলাকেই বা কোথায় পাইবেন? আর,'রত্ন সৌধকিরী-টিনী' লঙ্কাপুরীর প্রতি পরম-উচ্ছ্বাসী প্রীতি-সহানুভূতির সূত্রটুকুই বা কি করিয়া অক্ষুন্ন রাখিবেন? ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখর না দেখাইয়া, দুর্দ্দশাগহ্বরে উহার অধঃপাত অথবা নিয়তির বজ্রনিপাতের দৃশ্যেই বা কি করিয়া মানুষের চিত্ত দ্রবীভূত করিবেন? মহত্ব এবং বীর্য্য-বিভূতির ছবি অঙ্কন পূর্ব্বক প্রথমতঃ মানুষের হৃদয়কে উহার প্রতি প্রীতি-অনুগত না করিয়া কি রূপেই বা পরে দুরদৃষ্টে করুণাবিষ্ট অথবা সহানুভূতিতে বিগলিত করি-বেন? "এ হেন সভায় বসি লঙ্কা অধিপতি, বাক্যহীন পুত্রশোকে" এই অবস্থা এবং ঘটনার কারুণ্যমূর্ত্তি ও প্রয়োগের রসাস্বাদটুকুই বা কি করিয়া উৎপন্ন হইত? পরিশেষে, ইন্দ্রজয়ী 'মেঘনাদ স্বামীর' শ্মশান দৃশ্যে সেই মহিমাময়ী প্রমীলাকেই একেবারে সহ-মরণে লইয়া আসিয়া, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য-রাজা এবং ত্রিভুবনজয়ী 'রাবণশ্বশুরকে' "ধবল বস্ত্র ধবল উত্তরী—ধুতুরার মালা যথা ধূর্জ্জটির গলে" পরাইয়া—তাহাকে শোকে-যোগী এবং 'ভিখারী' সাজাইয়াই—যে মহাদৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাই বা কি করিয়া দাঁড়াইত? অদৃষ্টযন্ত্রে নিষ্পীড়িত এবং ঘনীভূত অশ্রুর সেই বিশুদ্ধ মর্ম্মর-মূর্ত্তি—রাবণটী আমাদের মনোদৃষ্টি সমক্ষে এমন উজ্জ্বল এবং অমার্জ্জনীয় হইয়া দাঁড়াইত! তারপর, অন্তিমের সেই "সপ্ত দিবানিশা লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে" আমাদিগকে যে-একটী অশেষ দীর্ঘনিশ্বাসে রাখিয়া গিয়াছে, আমাদের নিত্যকালের দীর্ঘনিশ্বাস-বাসিনী সেই "সৌধ কিরীটিনী"ই বা কোথায় থাকিত? অপর একটি পত্রেও কবির সহানুভূতির এই নিদারুণ বিঘটনা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। "ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এবং রাক্ষসরাজের অধঃপতন বর্ণনা করিতে আমাকে অনেক চোখের জল ফেলিতে হইল।" আবার অন্যত্র "ইন্দ্রজিতের জন্য আমার বড়ই প্রাণ কাঁদে—একজন প্রকৃত মহচ্চরিত্র বীর পুরুষ। He would have Kicked the monkey army into the sea, but for that scoundrel Bibhishan। আবার অন্যস্থানে" Ravan fires me with enthusiasm। I despise Rama and his rabble" আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক আছে কি। এই নির্ম্মল সাক্ষী গুলির ভিতর দিয়া কি কবি-মস্তিষ্কের কারখানার সকল কৌশল এবং কল-কব্জা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিলোত্তমা সম্বন্ধে 'মনুষ্য-রস' ছিল না; পরের কাব্যে উহা আনিতে হইবে। প্রচণ্ডতাধর্ম্মী কবিকে আপন হৃদয়ের রসধর্ম্মের বাধ্য হইয়াই রাক্ষসরাজের সহিত সুতরাং সহধর্ম্মী হইতে হইয়াছিল। উহাতেই সিংহল বিজয়কে পাশে রাখিয়া 'মেঘনাদ বধ'এর বিষয় নির্ব্বাচন। পরন্তু, যে শক্তি তাঁহার জীবনের দেবী, তিনিই কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিষয় নির্ব্বাচনে এবং গন্তব্য পথে বাধ্য করিলেন! আর রাবণটিই বা কে? প্রকৃত প্রস্তাবে কবি মধুসূদন নহে কি? দুঃখের-অপরিহার্য্য পাশবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া, নিয়তির করাল কবলে পড়িয়া যে মানবাত্মা ছট্‌ফট করিতেছিল, সংসারে যাহার আর

রক্ষা-সহায় ছিলনা, যে পতঙ্গ তথাপি প্রাণ থাকিতে নিজের অগ্নিশিখা-রূপিণী আশাকেও ছাড়িতে পারিতেছিল না, যে জীব প্রকৃত প্রস্তাবে আপন মাৎসর্য্য-গর্ব্বের দীপ্তশিখাতেই ধীরেধীরে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে ছিল! মধুসূদনের "আত্ম বিলাপ" কবিতাটীর শিরোনামা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া "রাবণের বিলাপ" নাম দাও। উহা যেমন মধুসূদনের মর্ম্ম-বাণী তেমন রাবণেরও মর্ম্ম-বাণী। সুতরাং, এই কবির অধ্যাত্ম সহানুভূতি প্রকৃত স্বধর্ম্মেই কোন পথে যাইতে পারে? কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে? এবং অধ্যাত্ম সহানুভূতি ব্যতীত কোনও কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে কি? স্বয়ং না কাঁদিয়াও পরকে প্রকৃত কাঁদাইতে পারা যায় কি? বঙ্কিম-তন্ত্রের কবির পক্ষে স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু মধুর ন্যায় সরলদৃষ্টি এবং ভাব প্রবণ কবির পক্ষে, মেঘনাদের মতন ভাব-প্রাণ এবং রসানন্দধর্ম্মী মহাকাব্য-রচনায় প্রীতি উদ্রেক না করিয়া সহানুভূতির উদ্রেক করিতে, অথবা কেবল সহানুভূতি জাগাইয়া প্রীতিকে খুন দাঁড়াইতে না হত্যা-ক্ষেত্রে সম্ভব কি? মেঘনাদ কাব্যের—বলিতে কি—মধুর সকল কাব্যের প্রাণই উহাদের একান্ত ভাবুকতা, ভাবস্রাবী বস্তু-ধর্ম্ম এবং রস-বত্তার মধ্যেই নিহিত আছে।

তার পর, প্রসঙ্গাধীন কবিগুরু বাল্মীকির কথাও একবার এ স্থলে চিন্তা করি। মধুসূদন আপশোষ করিয়াছিলেন, "কবিগুরু যদি রামচন্দ্রকে কতকগুলি মনুষ্য সহচর দিতেন"—হা দুরদৃষ্ট! সেই সাহচর্য্য মধুসূদন কোথায় পাইবেন? কবিগুরু ত স্বাদেশিকতা অথবা স্বাজাত্যের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া রামায়ণ গান করিতে বসেন নাই! হোমরের কাব্যে স্বাজাত্যের—হয়ত স্বাদেশিকতার দিক হইতেই কবির সহানুভূতি বিজয়ীর পক্ষে ছিল। বাল্মীকির বক্তব্য ছিল, রাম-অয়ন!

মহাপুরুষের মাহাত্ম্য-গান—মানুষের মনুষ্যত্বধর্ম্ম এবং উহার বিজয়িনী শক্তির মহাসঙ্গীত গান করাইত কবিগুরুর লক্ষ্য ছিল। আবার, ইতিবৃত্তার সূত্রেও, রামায়ণ-রচনার সময় যে আর্য্য-মাহাত্ম্য কিংবা স্বাজাত্য-ঘোষণাই ঋষির মনে প্রবল হইতে জানে নাই। বিজিত দ্রাবিড় কিংবা রাক্ষস জাতিকে সে সময়ে আর্য্যজাতি ঘনিষ্ঠভাবে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং আরও ঘনিষ্ঠতর ভাবে লইতেই চেষ্টিত ছিলেন! ইহাও কি সত্য নহে যে, অনার্য্যের অংশ-বিশেষের বন্ধুতা সাহায্যেই অন্য অংশের অধিকার বিজিত হইয়াছে? আর্য্যগণ সংখ্যায় স্বল্প ছিলেন, কিন্তু যে দেশে একটি আর্য্য গিয়াছে, সে একাকীই মহাশক্তি—সে একাই সহস্রকে হৃদয় দ্বারা বিজয় করিয়া আর্য্য সভ্যতার পতাকাতলে লইয়া আসিয়াছে। রামায়ণেও উহারই দৃষ্টান্ত। রামচন্দ্রের পূর্ব্বেই অগস্ত্য মুনি—দাক্ষিণাত্যে যাঁহার নাম 'তামিলমুনি'—এইরূপ একাকীই দক্ষিণাপথে অভিযান করিয়া, আর্য্য সভ্যতার জয় পতাকা দক্ষিণ হইতে আরও দক্ষিণমুখে লইয়া গিয়াছিলেন। আর্য্যের বিজয়—হৃদয়ের বিজয়, কদর্য্য আচারী কদর্য্যাহারী এবং কদর্য্যজীবী রাক্ষসগণের উপরে উন্নততর সভ্যতা, অধ্যাত্মকরণা এবং জীবনাদর্শের বিজয়! কবিগুরু স্বাজাত্যের ভাবে পরিচালিত না হওয়াতেই যেমন তাঁহার রামায়ণে উহা পরিস্ফুট হইতে জানে নাই, তেমন 'ঋষিকবি' বলিয়া কোনরূপ বহিস্থূল ঐশ্বর্য্য ভাব অথবা জড়-তান্ত্রিক অনুভাব-বিভাবের সাহায্যেও বাল্মীকি বিজয়ীপক্ষের মাহাত্ম্য প্রমাণ করিতে যান নাই। আর, বাল্মীকির 'কপি' 'ভল্লুক' 'রাক্ষস' 'কুকুর' ইহারাই বা কে? প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ এবং অনার্য্যের জাতি বিশেষ নহে কি? মধুসূদনও কবিগুরুর বর্ণনারীতি নিবিষ্টভাবে দেখিতে চাহেন নাই!

এ স্থানে আর একটি কথাও কদর্থের সম্ভাবনা নিরাস-কল্পেই বুঝিতে হয়। রামায়ণের মধ্যে যে অনার্য্য-ঘৃণা একেবারে প্রকট হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু উহা কোন 'পোলিটিকাল' আদর্শগত কিংবা জাতিগত ঘৃণা নহে। আর্য্যজাতির মধ্যেও শূদ্রধর্ম্মী বা রাক্ষসকর্ম্মী ব্যক্তির প্রতি ঋষি-আত্মার এই 'ঘৃণা' স্বভাবেই আপন্ন হইতে পারিত। শূদ্রতা এবং রাক্ষসতার প্রতি সংযম-আদর্শ-জীবী ব্যক্তি মাত্রের যে সহজ বিরুদ্ধবুদ্ধি থাকিতে পারে, তদ্ব্যতীত অপর কোন বিরোধ-ভাব রামায়ণে প্রবল নহে। 'বৈশ্রবণ' রাবণও স্বয়ং ব্রাহ্মণ-পুত্র 'রাক্ষস'।* মানুষ কি করিয়া দেবের মাহাত্ম্যেই মহীয়ান্ হয়, বিশ্বজয়ে অধর্ম্মের ত্রিলোক-বিজয়ী শক্তিদর্পও কি করিয়া আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্রদুর্ব্বল 'ভূণের' দ্বারাই বিচূর্ণিত হইতে পারে, মহাকবি যে সেই মহারসে আবিষ্ট হইয়াই রামায়ণ-গান রচিয়াছিলেন। রামের ধর্ম্মপত্নীর উদ্ধাররূপ সত্য দাবীর বলে—সুতরাং ধর্ম্মবলে বলীয়ান 'নর বানরে'র হস্তে ত্রিভুবন-জয়ী রাক্ষসরাজের অভ্রভেদী মাহাত্ম্যও ধূলিসাৎ হইয়াছে। আর্য্য-অনার্য্যের সংঘর্ষবাদ যে ঋষি-কবির মনে কিছুমাত্র শিল্প আকর্ষণ যোগাইতে পারে নাই। অন্যদিকে, মধুসূদনও যে কেবল একটি দুঃখ-অদৃষ্টের বজ্রনিপাতে বিদীর্ণ-দেহ মহাবৃক্ষের ছবি অঙ্কিত করিয়াই মনুষ্যকে কাঁদাইতে চাহিয়াছিলেন। 'বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি অবশেষে, নাশে বৃক্ষে"—তাহাই দেখাইতে গিয়াছিলেন! মধুসূদন ঐ কার্য্যে যেরূপে স্বকীয় প্রাণের সহানুভূতি-নিযুক্ত বিষয়-নির্ব্বাচন পূর্ব্বক উচ্চাঙ্গীয় কাব্যশিল্পের সমাধান করিয়া পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেন তাহাই আমাদিগকে দেখিতে এবং বুঝিতে হইবে। যাঁহারা একালে

---

* মহাভারতে এবং পুরাণাদিতেও অনেক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের 'রাক্ষস'ত্ব লাভ কাহিনী আছে।

রামায়ণ কিংবা মহাভারতের ঘটনামধ্যে আর্য্য-অনার্য্যের দ্বন্দ্ব বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যতার ক্ষেত্রেও ভুল না বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভারতের 'ঋষিকবি' ব্যাস ও বাল্মীকির হৃদয় যে বুঝিতে পারেন না, তাহাতেও অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন্ গুণে রামায়ণ কিংবা মহাভারত আর্য্য অনার্য্য উভয় জাতির হৃদয়ঙ্গম কাব্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রূপেই পূজা লাভ করিতেছে? রাম এবং কৃষ্ণ ও আব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের—হিন্দুনামধারী ব্যক্তিমাত্রের শ্রদ্ধা এবং পূজা লাভ করিয়াছেন! আর্য্যামী কিংবা স্বাজাত্যের আক্রমণ বলিয়া কোনও অভিসন্ধি যে ঋষি-কবির মনে প্রবল হইতে জানে নাই। রামায়ণ এবং মহাভারত রচনার পূর্ব্বে, উহাদের মহাকাব্য-আকারে পরিণতি হওয়ার বহুপূর্ব্বে আর্য্য অনার্য্যের দ্বন্দ্ব যদি যে ভারতীয় ঐতিহাসিক-চিত্রের স্মৃতিপট হইতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল—খাণ্ডবদাহনের সঙ্গেও নির্ব্বাপিত হইয়াই গিয়াছিল, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। ভারতের 'জাতিভেদ' আদর্শও ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা বলিয়া এবং ঐ ভেদের মধ্যে সাংসারিক স্বার্থবিবাদ অদ্যাপি মুখ্য ছিলনা বলিয়াই, উহা ইয়োরোপের বা অন্যদেশের 'ভেদ' আদর্শের ন্যায় সবিশেষ ঈর্ষা-কলহ অথবা রক্তারক্তির কারণ হইতে পারে নাই! ভারতের 'ব্রাহ্মণ্য'-আদর্শ জীবন-ক্ষেত্রে সমুন্নত সংযম-করুণা, নিবৃত্তি-ধর্ম্ম এবং সমুন্নত আচার-গৌরবেই 'অ-ব্রাহ্মণের' সমক্ষে আপনাকে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্যতর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। 'অব্রাহ্মণ-গণ'ও ওই ত্যাগধর্ম্মী, নিবৃত্তিকর্ম্মী এবং অকিঞ্চন 'ব্রাহ্মণের' জীবনাদর্শকে নৈতিক ক্ষেত্রেই অধৃষ্য এবং আত্মক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়াই ব্রাহ্মণত্বকে লোভ করে নাই; অথবা উহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকেও সবিশেষ ঈর্ষা করে নাই! একালেও—নানা বিজাতীয় সমাজ-আদর্শের দ্বারা বিকলদৃষ্টি হইয়া,

এবং নানাদিক হইতে সমাজের মধ্যে কলহ-বিরোধ এবং রেষারেষি ঘটনা করার উদ্দেশ্যে নানা 'মতলবী'চালে পরিচালিত হইয়াও—বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত 'অ-ব্রাহ্মণ' জাতি সমূহ যাহাতে কোনমতেই ব্যাপক ভাবে 'গা করিতেছে না'। জীবনের উন্নততর আদর্শে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া, অধিকন্তু ধর্মকর্তৃক সমর্থিত বলিয়াও বটে ভারতের এই 'ভেদ' আদর্শে ইয়োরোপের মতন উচ্চনীচ-শ্রেণীর মধ্যগত এত হিংসাবিদ্বেষ এবং ঈর্ষা-কলহ নাই, 'জন্মগত অদৃষ্ট'বাদের দ্বারা সমর্থিত বলিয়াও এই ভেদ হয়ত সবিশেষ অকল্যাণদ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণের জীবিকা-আদর্শে সাংসারিক সুখসুবিধার অত্যধিক কোনদিকে বৃদ্ধিলাভ করিয়া যেমন তাহাকে লোভনীয় করিয়া তুলিতেছে না, তেমন প্রত্যেক নিম্ননিম্নতর জাতির জীবিকাকেও অন্যান্যদের পক্ষে 'অপরামৃষ্ট' করিয়া ভারতীয় সমাজ সকলের পক্ষেই কিছু-না-কিছু সংরক্ষণ করিয়াছে। সংরক্ষণ ব্যতীত কোন ভেদের আদর্শই মনুষ্য সমাজে দীর্ঘকাল দাঁড়াইতে কিংবা ব্যাপকভাবে অভিমতি লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের 'ভেদ' আদর্শকে ইয়োরোপীয় চশমার সাহায্যে দেখিতে গিয়াই আমরা চিরকাল ভুল করিয়া আসিতেছি। যদিও সাম্যবাদ' হইতেই যে আপেক্ষিকভাবে মনুষ্য সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অধিকতর সাংসারিক উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহাই হয়ত আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজের বিগত শত বৎসরের ইতিবৃত্ত প্রমাণিত করিবে। তবে ঐ 'সাম্যবাদ' এবং উহার অনিবার্য সিদ্ধান্ত স্বরূপ 'প্রতিযোগিতা' ব্যাপারের মহাফলরূপে ফলিত হইয়া বিগত মহাযুদ্ধ আবার সেই প্রমাণটাকেই হয়ত খণ্ডিত এবং চূর্ণিত করিয়া গেল। অদূর ভবিষ্যগর্ভে আরও ভীষণতর "মহাযুদ্ধই" হয়ত প্রত্যেক দৃষ্টিশালী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে!

যাহোক, কবির ওই দৃষ্টিস্থান হইতেই মেঘনাদের কায়া এবং প্রাণের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে হয়। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে স্বতন্ত্র এই একটি কাব্য ব্যক্তি। বাল্মীকির রামলক্ষ্মণকে যেমন ভুলিতে হইবে, তেমন বাল্মীকির রাক্ষসকেও ভুলিতে হইবে। বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য-বিলাস এবং মত্ততা ব্যতীত হয়ত রাক্ষসত্বের অন্য কোন লক্ষণ মেঘনাদের রাক্ষসগণের মধ্যে প্রাবল্যলাভ করে নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই মেঘনাদ-কাব্যরূপী স্থাপত্যমন্দিরের নির্ম্মাণ মধ্যে গ্রীক এবং ইয়োরোপীয় মালমসল্লা এত অধিক পরিমাণে কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কারণও বুঝিতে হইবে। কবি মধুসূদন পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি তাঁহার বিহার ক্ষেত্র ছিল। সাহিত্যজগতের প্রাচীন মহাকাব্যগুলির ভাবরাজ্যে যাহা সুন্দর, মধুর, বৃহৎ এবং মহৎ ছিল মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি বঙ্গদেশে এমন এক মধুচক্র নির্ম্মাণ করিলেন "গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"! বাঙ্গালীর জ্ঞান এবং আনন্দের ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যে মৌলিকতার অহংকারটাও মুখ্য ছিল না। বলাবাহুল্য, তিনি পরকীয় কাব্যের অবয়ব গুলি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—সেক্সপীয়র যেমন পরের নাটককাঠামের উপর নিজের হইতে রক্তমাংস এবং বর্ণ সংযোগ পূর্ব্বক উহাদের স্বতন্ত্র-ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; স্বয়ং মিল্টন টাসো এবং ভার্জ্জিলও যে প্রণালী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বাল্মীকি এবং ব্যাসও তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও প্রাচীনতম গীতি-কবি হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে পর্য্যন্ত অনেক সময় সেই মাধুকরীর প্রমাণ মিলিতেছে। সাহিত্যের মধুচক্র এইরূপে ন্যূনাধিক মাধুকরী বৃত্তিতেই সমর্থ মধুকর

গণের হস্তে মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য্য, ক্রমান্বয়ী ঘনতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া আসিতেছে।

অধিকন্তু, তিলোত্তমা ও মেঘনাদের শিল্পতামধ্যে দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে হইবে যে, মধুসূদন প্রধানতঃ কবি এবং কাব্যশিল্পী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কর্ম্মভূমি এবং চিন্তাভূমিতে আবির্ভূত হইলেও এবং স্বয়ং বিদ্রোহি-ধর্ম্মে পৈত্রিক সমাজ-ধর্মত্যাগী হইলেও, অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সমাজবিপ্লব কিংবা সাহিত্যের ভাব-বিপ্লব তাঁহার 'শিল্পিচিত্তকে' কোনদিকে বিশেষ আঘাত করিয়া জাগাইতে অথবা পরিচালিত করিতেও পারে নাই। ফরাসী বিপ্লবের বহুঘোষিত সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ এবং ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে ইয়োরোপীয় নরসমাজের অধ্যাত্মরাজ্যে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহার নাম দিতে পারি, প্রথমতঃ, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত অধীনতামুক্তির আদর্শ—মনুষ্যের প্রাচীন ধর্মশাসিত সমাজ-আদর্শের নীতি-বন্ধনের অধীনতা হইতে নানাদিকে ব্যক্তির মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা—মনুষ্যের প্রাচীন সমাজ-শাসিত ধর্ম্ম আদর্শের নীতিনিয়মের অধিকারে জন্ম-বশতঃ মনুষ্যের ভাব এবং চিন্তার জগতেই যে-একটা কার্পণ্য এবং রক্ষণশীলতার আবহাওয়া প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে নিয়তভাবে দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র করিতেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে উহা হইতে ব্যক্তিমাত্রের অধ্যাত্মমুক্তি। এই 'মুক্তি'র আদর্শ ইয়োরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রবল ভাব-বিপ্লব আনয়ন পূর্ব্বক উহাকে নানাদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য হইতে মূলেই পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই মুক্তির গুণ ও দোষফল লইয়া এবং উভয়কেই দৃষ্টান্তিত করিয়া রুশোর এমিলী, সেন্টব্রায়াণ্ডের বীনী, গ্যাঠের ওয়ার্থার্,

শীলারের রবার্স্ এবং বায়রণের চাইল্ড্ হেরল্ড্, কর্সেয়ার্, ম্যানফ্রেড্, ও শেলীর রীভোল্ট্ অব্ ইসলাম ও প্রমিথিয়াস্ আন্‌বাউণ্ড প্রভৃতির সৃষ্টি। বলাবাহুল্য, বঙ্গসমাজেও এই সমাজবিপ্লব এবং ভাব-বিপ্লবের প্রভাব এবং ফল প্রকট না হইয়া পারে নাই। যেমন রামমোহন রায়ের 'উপাসনা সভার' সভ্য-মধ্যে, তেমন 'ঝড় তুফান' যুগের ইয়ং-বেঙ্গলের দলমধ্যেও ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ন্যূনাধিক অভিঘাত, প্রতিঘাত এবং উগ্রকল্লোলই শুনিতেছি। মধুসূদনও ব্যক্তিগত ভাবে একজন 'ইয়ং বেঙ্গল' ছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের সমস্ত ভাবাভিঘাতে, এবং ভল্‌টেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া রুশো-সেটব্রায়াণ্ড-গোঠে বায়রণের সার্বভৌম অভিনবত্ব এবং আতিরিক্ততার আঘাতেও তিনি সচেতন ছিলেন, তবু, শিল্পী মধুসূদনের অন্তর্জীবনে এবং কাব্য-আদর্শে ঐ লক্ষণ প্রবল হইতে পারে নাই! [illegible] দেশের সাবেক-আদর্শ-নির্বাসিত সমাজের দিকে কোন স্বাজাত্যভিমানের লক্ষণও উদগ্র হইয়া উঠিয়া এই কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্যাট্রিয়ট-কর্মী' বা সমাজসংস্কারক করিয়া তুলিতেও পারে নাই। এই দিকে বরং 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র তরুণ কবিই নিজের শিল্পিচৈতন্যে 'ইয়োরোপীয়ভাব প্লাবন' লক্ষণ, এবং বায়রণ-ওয়ার্থার-ম্যানফ্রেডের প্রভাব প্রমাণিত করিয়াছেন! বীরবাহু ও ভারতসঙ্গীতের মধ্যেও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা-মন্ত্রের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনিই শুনিতেছি।

মধুসূদনের এই অমিশ্র, অমল, অসঙ্গ শিল্পি-চেতনা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর প্রণিধানযোগ্য!

এই অনাবিল শিল্প-চেতনা মধুসূদনকে যেমন সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে উন্মার্গগামিতা হইতে রক্ষা করিয়াছে, যেমন তাঁহাকে শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক অথবা রাষ্ট্র-সংস্কারকের আদর্শে

আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই, তেমন অন্যদিকে তাঁহাকে সাহিত্যের সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বকালীন 'রস'-আদর্শে আত্মনিষ্ঠ থাকিতেও সাহায্য করিয়াছে! তিনি যে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক এবং ভোক্তা ছিলেন, সাহিত্যের বহুমুখী পদ্ধতি যে ভোক্তার দিক হইতে পরম সহানুভূতিপথে উপভোগ করিতে পারিতেন, সে সংবাদ তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর কবি-প্রশস্তিগুলিই প্রমাণ করিতেছে। অথচ, মধুসূদন সাহিত্যে আপন কর্তৃত্বের এবং শিল্পিত্বের ক্ষেত্রে কত আত্মনিষ্ঠ এবং আত্মরত থাকিয়াই চলিয়াছেন। সমস্ত জানা থাকিলেও আধুনিক সাহিত্যের নানা অসাহিত্যিক মতিগতি তাঁহাকে তিল-পরিমাণেও আত্মভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আধুনিক সাহিত্যের নানা আত্মবিস্মৃত ঝোঁক, উহার নানা চরমপন্থী এবং অত্যন্তবাদী প্রবৃত্তি, যাহা Realism ও Naturalism প্রভৃতি নামাদর্শে সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনাচারী করিতেছে, Problem novel ও Problem drama প্রভৃতির পথে সাহিত্যকে সমাজ-কবিরাজী এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের তরফেই কু-পথ-চালিত করিতেছে, ইতিহাস ধর্ম্ম অথবা রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ এবং সাময়িক ক্ষেত্রেও সাহিত্যকে প্রলুব্ধ করিতেছে, সে সমস্ত শিল্পী মধুসূদনের উপর কিছুমাত্র প্রভাব দেখাইতে পারে নাই! জীবনে এবং চরিত্রে স্বয়ং ফরাসীবিপ্লবের চেলা এবং বঙ্গের 'চণ্ডমুণ্ড দলে'র প্রতিনিধি হইয়াও কবি আপন সাহিত্য-সাধনার তপোবনে অবিচলিত ছিলেন, আপন পথেই সাহিত্যের সার্ব্বজনীন রস এবং রসের নিত্যকালীয় 'সত্যশিবসুন্দর' আদর্শেই সমাহিত ছিলেন। তাঁহার এই বিশেষত্বটুকু বুঝিতে না পারিলে আমরা তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রধান দাবীটাই অগ্রাহ্য করিব! এই বৈপরীত্য এবং বিপরীতের মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্যেই সাহিত্যশিল্পী মধুসূদনের অমর কৌলিন্য এবং মাহাত্ম্য।

৬

আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে মধুসূদনের অনাবিল শিল্প-আদর্শের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মধুসূদন বঙ্গে ইয়োরোপীয় ভাবজাগরণের প্রথম কবি—তাঁহার মধ্যদিয়াই ইয়োরোপীয় সাহিত্যশিল্পের আদর্শ বঙ্গে সর্ব্ব-প্রথম সচেতনভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, মধুসূদনের শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালী ইয়োরোপের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসিয়া থাকিলেও, অপর কোন বাঙ্গালীকবির মধ্যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য আদর্শের পথে বাঙ্গলাসাহিত্যের এই 'নবজীবন' সম্ভবপর হয় নাই। শিল্পী মধুসূদনে আসিয়াই এই আদর্শটি প্রতিমা এবং প্রমূর্ত্তি লাভ পূর্ব্বক "হাতে কলমে দৃষ্টান্ত" স্বরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোনো কবি বা জাতিবিশেষের প্রকৃত 'ঋণ' বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কোন পদার্থটি দেখিতে হইবে? নূতন আদর্শের পরিচয়। সেই কবি কিংবা জাতি অপরের শিষ্যত্ব-পথে ভাষার রীতি, ভাবুকতার পদ্ধতি অথবা শিল্পের গঠনপ্রণালী বিষয়ে কোনো নূতন সত্য দর্শন করিয়াছে কি? ভাব এবং চিন্তাকে শিল্পের ক্ষেত্রে চরিত্র অথবা ঘটনার মূর্ত্তি-সাহায্যে পরিমূর্ত্ত করিবার আদর্শ-পথে সেই কবি কিংবা জাতি কোন নূতন উপনয়ন কিংবা কোন নব পদ্ধতির ক্রিয়াকৌশল লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে কি? বঙ্গসাহিত্যে 'ইয়োরোপীয় নবজীবনের' আবিষ্কর্ত্তা মধুসূদনের মধ্যেও উক্ত উপনয়ন-স্থানগুলিই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। নতুবা, কেবল কোন-একটি বিশেষ ভাব, উপমা বা অনুপ্রাসের ঋণ, কোনো-একটি বিশেষ অলঙ্কার বা 'পরের সোনা কাণে পরা'র দৃষ্টান্ত—এ সমস্ত সাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্রে সবিশেষ ধর্ত্তব্যই নহে। শিল্পের কোন রীতি বা পদ্ধতি বাঙ্গালী পূর্ব্বে জানিত না বা বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত ছিলনা, মধুসূদন তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে দৃষ্টান্তে অবতারিত

করিয়া বাঙ্গালীর চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার পর হইতে বঙ্গসাহিত্য সেই নব-আবিষ্কার-পথে স্রোতোমুখে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ছুটিতেছে—সাহিত্য-আলোচকের পক্ষে উহাই প্রধানতঃ চিন্তনীয় বিষয়! উহা আবিষ্কার অথবা সৃষ্টির তরফেও মধুসূদনের প্রধান মাহাত্ম্য-স্থান! বলাবাহুল্য, বঙ্গসাহিত্যে ইয়োরোপীয় প্রভাবের উহাই আদি ইতিহাস, বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য-ঋণের উহাই প্রকৃত বিবরণ।

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে যে একটা পরম বলীয়সী সার্বজনীন শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করার যো নাই, স্ত্রীপুরুষের সোজাসুজি মিলন, ধর্ম্মশাসিত সমাজের সংযম এবং আচারতন্ত্রকে ডিঙ্গাইয়া সম্পূর্ণ নৈসর্গিক উপায়ে মিলন, বাহিরের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন-অন্তরায়কে উড়াইয়া কেবল ভাবের এবং প্রাণের টানে মিলন—ইহা নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যবঙ্গী মনুষ্যমনের নিত্যানন্দকর বিষয়। 'কবিগুণাকর' অতুলনীয় শব্দ-মন্ত্রে এবং ছন্দশক্তিকে মনোরমা করিয়া এই মিলনের ছবি বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিলেন। বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহজপ্রিয় বাঙ্গালীর হৃদয় উহাকে পরম উল্লাস-রঙ্গে আলিঙ্গন করিল, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বিদ্যাসুন্দর-গানের বোল পড়িল। মানুষ এবং মানুষী সমাজের রাজদুর্গের অভ্যন্তরে, সমাজ-দেবতার গুপ্ত সাহায্য লাভ করিয়াই, সমাজনীতির হৃদয়ে গুপ্ত 'সুরঙ্গ' খুঁড়িয়াই মিলিত হইতেছে। বন্ধনক্লিষ্ট জীবের পক্ষে ইহাপেক্ষা পরিতৃপ্তি এবং আস্ফালনের বিষয় আর কি আছে? বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের ত্রিলোকমোহন ভাবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের যুগ—মধু যাঁহাকে 'কৃষ্ণনগরের সেই রাজ-' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন! সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-চক্রবর্ত্তী "পূর্ব্বশ্বরি" এবং—দেশের দৃষ্টিতে—স্বকীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-অভিঘাত

নিজের প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই আমাদের কবি উক্ত কটাক্ষ করিয়াছেন! মধুসূদনকে জীবিতকালে চিরদিন ভারতচন্দ্রের সহিত 'তুলনার সমালোচনা' সহ্য করিতে হইয়াছিল। মেঘনাদ প্রকাশের পর স্বয়ং বিদ্যাসাগরও না কি বলিয়াছিলেন—"খুব করিয়াছ—কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছ বলিয়া মনে হয় না।' শেষ পর্যন্ত প্রাচীনতন্ত্রের সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদনকে 'কবিকেশরী' ভারতচন্দ্রের ভাবায় আনিয়া তুলনা করিয়াছেন। ইংরেজ আমলের প্রথমযুগের প্রবলতম প্রতিপত্তিশালী কবি ঈশ্বরগুপ্ত. তিনি পুরামাত্রায় ভারতচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। কবিগুণাকরের শব্দমন্ত্র, ভাষার বিশুদ্ধি-আদর্শ, ঋজু এবং মার্জনা-তীক্ষ্ণ বাক্যের 'হীরার ধার' শক্তি—এ সমস্তের শিষ্যতা ঈশ্বর গুপ্তে প্রতীয়মান। ভারতচন্দ্রের রসিকতার গুপ্তকবির মধ্যে আসিয়া, একেবারে কণ্টকিত হইয়াছে তীব্রহাস্যের বিষে এবং ব্যঙ্গের বিষে দাড়াইয়া গিয়াছে! প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিবেগশীল কবি হইলেও স্বয়ং মধুসূদন যে এই 'ভারতচন্দ্রীয় রসিকতা'র প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহাই মধুসূদনের নানাস্থানে লক্ষ্য করিতেছি! অধিকন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সজ্ঞানে অথবা অতর্কিতে, কিংবা কোন অতীন্দ্রিয় প্রাণশক্তির বাধ্য হইয়াই হউক, অষ্টাদশশতাব্দীর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'প্রাণগত আবহাওয়াটুকু—বলো পোপ-ড্রাইডেন-ভলটেয়ারের ভাবারীতি বাক্য আদর্শ এবং অধ্যাত্মশক্তির স্বভাবটুকু—যেন এই সুদূর বঙ্গদেশে, ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্যন্তই প্রবাহিত ছিল! সারস্বত জগতের এই একটি 'অপরূপ রহস্যেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। এই রূপে পূর্ব্বাপরের জ্ঞান ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের জন্ম অথবা কর্ম্ম-স্থানও বুঝিতে পারা যায় না।

বঙ্গসাহিত্যে তিলোত্তমা সম্ভবের প্রকাশকে নানাদিকেই প্রাচীন সাহিত্যযুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হয়। ঐ সময়েই ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অবসান, এবং তিলোত্তমা সম্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে নবসাহিত্যযুগের আরম্ভ! উহা ইয়োরোপীয় আদর্শে 'নবজীবন' প্রাপ্ত, এবং আধুনিক "বিশ্ব সাহিত্য" আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত নব"রোমান্টিক" সাহিত্যযুগের আরম্ভ! ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ভাষারীতি-গত 'বিশুদ্ধিযুগ' বলিতে পারা যায়। অষ্টাদশশতাব্দীময় সমগ্র ইয়োরোপে যে 'বিশুদ্ধিযুগ' চলিয়াছিল, ফরাসীদেশের বুলো এবং ইংলণ্ডের পোপ-ড্রাইডেনকে উহার 'অধিরাজ'রূপে নির্দ্দেশ করার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। বলিতে হয়, একরূপ অতর্কিতভাবে, মানবচিত্ত-স্রোতের কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় ভাব-ধর্ম্মবশেই বঙ্গসাহিত্যের "কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে"ও ভাষা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে কেবল পরিশুদ্ধি এবং বাক্‌ভার আদর্শই মুখ্য হইয়াছিল। মধুসূদন হইতেই বঙ্গসাহিত্যে উন্নতিনীতিক এবং রোমান্টিক আদর্শের সূত্রপাত! ভাবুকতায় সংযম এবং সমুচ্চ বস্তুতন্ত্রতা বিষয়ে মধুসূদন গ্রীক-শিষ্য, ক্লাসিক কবিগণের শিষ্য হইলেও, তাঁহার মধ্যে 'রোমান্টিক যুগ' ধর্ম্মই প্রবল বলিয়া অনুভূত হইবে! মধুসূদন ভাষা ও ভাবের অত্যুন্নতি, তীক্ষ্ণতা এবং পরিস্ফুট বস্তুবাদ বিষয়ে একদিকে যেমন হোমরের শিষ্য, ছন্দের প্রবাহ-শক্তি বিষয়ে যেমন ভার্জ্জিল ও মিল্টনের শিষ্য, রচনার রমনীয় মধুরতা বিষয়ে যেমন টাসোর অনুগামী, ভাববস্তুর সমুচ্চ বিভাবনা বিষয়ে যেমন দান্তের সমধর্ম্মা, তেমন অন্যদিকে, কাব্যে আত্মপ্রকাশ এবং ব্যক্তিবাদ বিষয়েও পিত্রার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বায়রণাদির মন্ত্রেই দীক্ষিত। আবার, ইঁহাদের সঙ্গেই আমাদের

শ্রীহর্ষ কালিদাস ও ভবভূতির এবং কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষা ও রসা-
দর্শের অপরূপ সঙ্গতি করিয়া, অনির্ব্বচনীয় স্বাভাবিকতা, সুসঙ্গত শবলতা
এবং পরিপূর্ণ সারল্যময় ব্যক্তিত্বেই মধুসূদন দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে,
বলিতে গেলে ভারতীয় সাহিত্যে, এই প্রথম ইয়োরোপ-তন্ত্রের
“বিশ্বতা”-দীক্ষিত ব্যক্তি। এই ব্যক্তিটাকে বাদ দিলে বঙ্গ
সাহিত্যের পূর্ব্বাপর গতি যেমন ছিন্নসূত্র এবং ‘খাপছাড়া’ হইয়া যায়,
তেমন বঙ্গসাহিত্যের পরবর্ত্তী উন্নতিও অসম্বদ্ধ প্রমাণিত হইয়াই
দাঁড়ায়। বুঝিতে হইবে, ভারতবর্ষ মধুসূদনের পূর্ব্বে শতাধিক
বৎসর হইতে ইয়োরোপের ভাবসংস্রবে আসিয়া থাকিলেও উহাকে কোন
দিকেই যথাযথ রূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই—কেন না তখন
মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। ভারতীয় হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার ইয়োরোপ-
পথে অনর্গল করিবার মাতৃমন্ত্র কেবল এই ব্যক্তিটার মধ্যেই ছিল;
এবং তাহার যাদুকার্য্যের পশ্চাতেই এখন পরবর্ত্তী আপামর সাধারণ
অবারিত পথে “হুড়মুড়” করিয়া চলিয়াছে।

আমাদের প্রাচীন কাব্য এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক কাব্যের
পরিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ঠিক দেশীয় তন্ত্রী এবং বিলাতী
বাদ্যযন্ত্রীর মধ্যে সেই পার্থক্য! সেতারতন্ত্রীর প্রত্যেক ধ্বনি, প্রত্যেক
‘টুং টাং’ই এক-একটা স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি। অথচ উহাদের ক্রমানুগত্যময়
প্রবন্ধ হইতেই তন্ত্রী-রাগিণীর উৎপত্তি এবং বিকাশ। অর্গানের
প্রত্যেক স্বরই যেন শ্রুতিপথে স্রোতে প্রবাহিত হয়, এবং এই
স্রোতে-বহমান স্বরগুলির মধ্যগত একটা সমযোগী সম্বন্ধ এবং সংস্পৃষ্টি
হইতেই অর্গানের রাগিণী বিকাশ লাভ করে। তেমনি, সংস্কৃত
কাব্যের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোক-যুগ্মক বা কুলকই এক একটি পার্থক্য-
বিশিষ্ট ভাব এবং অর্থের যেন স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি। প্রত্যেকেই

স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারে; এবং উহাদের মধ্যবাহী একটা অন্বয় এবং সংগ্রথন-সূত্রের প্রবন্ধ হইতেই সংস্কৃত কাব্য প্রমূর্ত্তি লাভ করে। অন্যদিকে, আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকে ভাবের সেই স্বতন্ত্রতা না থাকিতেও পারে, কেবল অর্থ বা বক্তব্যের প্রবাহ-সম্বন্ধের জোরেই সংগতি লাভ করিয়া উহা কাব্যের গঠনে উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। প্রবন্ধ এবং সম্বন্ধের এই প্রকৃতিভেদ হয়ত ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও উদ্ভূত হইয়া আছে—হয়ত উভয়ের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির মধ্যেও নিবিষ্ট দৃষ্টিতে এরূপ একটা রীতিপার্থক্যই ধরা পড়িবে। তত্ত্বা-বাগিণী যাহাদের প্রিয় নহে, এ দেশের চিত্ররীতি কিংবা সমাজ-আদর্শেও হয়ত তাহারা প্রীত হইতে পারিবে না।

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে, মেঘনাদবধের প্রত্যেক বাক্য, সংস্কৃতকাব্যের শ্লোক-পরিবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছে না, অথচ পরবর্ত্তী বাক্যের সঙ্গে মিশিয়া, 'ঠাসাঠাসি করিয়া' দাঁড়াইয়াই অর্থের এক-একটা বহমান ধারাগতির সৃষ্টি করিতেছে। ইয়োরোপীয় অমিত্রচ্ছন্দের অন্তরাত্মার মধ্যেও অর্থের এই ধারাগতিটুকুই মুখ্য! মাঘ ভারবি বা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির শ্লোক-গতি, এবং শ্লোকগত বাক্যচ্ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করিলেই বুঝিব, ইয়োরোপীয় stanza শ্লোকবন্ধ বা ইয়োরোপীয় অমিত্রচ্ছন্দের বাক্য এবং 'প্যারা'র সঙ্গে উহার একটা সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক পার্থক্য আছে। ইয়োরোপেও রিনেশাঁসের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বাক্যবিন্যাসের মধ্যে, ক্লাসিক সাহিত্যের এবং আধুনিক সাহিত্যের বাক্যবিন্যাসের মধ্যেও হয়ত আমাদের এই সংস্কৃতরীতির সাধর্ম্ম্যই প্রতীয়মান হইবে। সংস্কৃত শ্লোকের সীমা-নিবদ্ধ দ্বিপাদ, ত্রিপাদ অথবা চতুষ্পাদ বৃত্ত-গতি হইতেই বোধ করি তাহার এই পার্থক্য ও

স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য হইয়াছিল, এবং সংস্কৃতের সাত্মাত্য-ধর্ম্মে বঙ্গভাষার পয়ার এবং লাচারী ছন্দের শ্লোকমধ্যেও উক্ত প্রবৃত্তিটিই অক্ষুন্ন ছিল।

মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য কাব্যের বাক্যরীতির এই ধারাগতি এবং প্রবাহগত রাগিণী বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হইল। মধুর অমিত্রচ্ছন্দ যেমন একদিকে সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক স্থিতি-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেমন বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার প্রাচীনতানিষ্ঠ পদগতি এবং মিলতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ! উহা ভাবের উদ্দাম স্বাধীনতার স্রোতে ভাষাকে ছাড়িয়া দিয়া, বাহ্যিক হাল এবং পাল উভয় গুটাইয়া, 'ভাসিয়া যাওয়া' ব্যতীত আর কিছু নহে। কবিত্বের প্রকৃত ছন্দ প্রকৃত কবিমাত্রের মধ্যেই ভাষার বাহ্যিক মিলতিকে অতিক্রম করিয়া তাহার ভাবাবিষ্ট হৃদয়ের স্রোতের মধ্যেই যে আছে—অন্য কুত্রাপি যে নাই, সাহিত্যের পাঠক মাত্রকে উহা সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়া লইতে হয়! এই স্রোতে নৌকা ভাসাইতে না পারিলে, বাক্যচ্ছন্দের হাজার বাহ্যিক মিলতি সত্ত্বেও রসজ্ঞের সমক্ষে কবিতা একটা বিফল এবং মৃত পদার্থ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হয় না। বিদ্রোহী মধু বঙ্গসাহিত্যের ছন্দের ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রকটিতভাবে মহতী ভাবুকতা এবং ভাব-প্রাণতার সরল আনন্দধর্ম্ম এবং তরঙ্গোন্মাদ আনয়ন করিলেন।

এই প্রসঙ্গসূত্রে প্রাচীন বাঙ্গলাগদ্যের, সংস্কৃত গদ্যের, বলিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য গদ্যের একটা প্রবল এবং পরিব্যাপ্ত মর্ম্মকথাও বুঝিয়া লইতে হয়। উনবিংশ শতকের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেও, ড্রাইডেনী গদ্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যেও, স্বল্প-কতিপয় লেখককে বাদ দিয়া, এইরূপ গদ্য রীতিই

সাধারণভাবে প্রবল ছিল, বলিতে পারি। আমাদের গদ্যের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ওই 'শ্লোক-রীতি'ই প্রবল ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যের প্রত্যেক পংক্তিই যেন শ্লোকের আদর্শে, আপনার ভাবাত্মা এবং অলংকারকে মুখ্য করিয়া, একটা স্বতন্ত্র unit বা পরিব্যক্তি রূপেই দাঁড়াইয়া যাইত; ঐরূপে বহু পরিব্যক্তির প্রবন্ধ হইতে এক একটা পারা (para) দাঁড়াইয়া যাইত—অথবা পারার আদর্শ একেবারেই উজ্জ্বল ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পারার আদর্শ ছিল না বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন 'সূত্র' আদর্শের এক একটি বাক্য—পারাগুলি যেন উহাদের সমষ্টির বিস্তার। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রে বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়াই বাঙ্গালা গদ্যের বাক্য ও পারা আধুনিক আদর্শে পূর্ণ পরিব্যক্তি লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যে 'আধুনিক গদ্য' বলিতে এখন আমরা অর্থের বিশ্লেষণ-রীতিনিষ্ঠ এবং ধারাবাহী গদ্যই বুঝিতেছি। একালে ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও যে প্রাচীন বা প্রাচ্য গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত একেবারে অজ্ঞাত নহে, তাহা বলা যায় না। প্রসিদ্ধ লেখক এমার্শন উহাই প্রবল বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে ইয়োরোপীয় গদ্যের বিশেষতঃ ফরাসী গদ্যের প্রভাব সত্ত্বেও, অনেক স্থলে কাদম্বরীর গদ্যরীতি—প্রাচ্য গদ্যরীতিই প্রমাণিত করিতেছেন। পরন্তু, প্রাচ্য গদ্যরীতি একদিকে কতদূর সৌন্দর্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, যেমন এমার্শনের তেমন রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধ এবং প্রসঙ্গগুলি তাহারই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। তাঁহাদের প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক পারা যেন স্বতন্ত্র অলঙ্কারে, বিশ্লেষণ শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তা ও ভাববত্তার ঐশ্বর্য্যে স্বতন্ত্র পরিব্যক্তিরূপে দাঁড়াইয়া যায়! এই লক্ষণ এত প্রবলভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যে, সমগ্র প্রসঙ্গটির

মূল উদ্দেশ্য-বস্তু, উহার সামগ্র্য-লক্ষ্যটাই যেন 'ঝাপ্ সা' হইয়া—কোথাও বা একেবারে চাপা পড়িয়া যায়! প্রকৃত আধুনিক গদ্যপ্রসঙ্গের মধ্যে যে একটা একত্ব বা ব্যক্তিত্ব থাকে, উহার ধ্বনি অলঙ্কার এবং বাক্যার্থের মধ্যে যে একটা polyphony এবং symphony থাকে—পরস্পর সম্বন্ধশীল বিস্তারিত বাক্যের ও সর্ব্ববিধ অলংকরণের মধ্যস্থ যে একটা একাগ্রমুখী সঙ্গতি এবং বহুস্রোতের মধ্যে ঐক্যতানমুখী যে একটা সঙ্গীতি থাকে, কবি-ধর্ম্মতার গতিকে ইঁহাদের গদ্য মধ্যে অনেক স্থলেই উহা অস্পষ্ট হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত গদ্য-চেষ্টার মধ্যেও এই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। তাই তিনি আধুনিক আদর্শের 'মহাকাব্যের' কবি নহেন—বিস্তারিত নভেলের বা গদ্যগ্রন্থের শিল্পীও নহেন। তিনি স্বক্ষেত্রে অতুলনীয় ছোট গল্পের কর্ত্তা—অতুলনীয় গীতিকাব্যের কবি, ক্ষুদ্রের এবং সূক্ষ্মের অভ্যন্তরস্থ অনন্তের ও অব্যক্তের দৃষ্টিশীল মহাকবি।

কাব্যের ভাষারীতি ব্যতীত কাব্যের গঠন রীতির (technique) দিকেও মধুসূদন প্রতীচ্য গ্রীক আদর্শকেই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম অবতারিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, গ্রীক রীতিই আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যের প্রচলিত রীতি। রামায়ণ মহাভারত এক-একটা সম্পূর্ণ ঘটনাকে, উহার বীজ হইতে এমন কি বীজ-পূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক অবস্থা হইতেও আরম্ভ করিয়া উহার চূড়ান্ত পরিণতি পর্য্যন্ত, উহার সাংসারিক এমন কি পারলৌকিক নির্ব্বৃতি পর্য্যন্ত, ধারাবাহিক ভাবে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। ব্যাস বাল্মীকি প্রত্যেক পাত্রের জীবনগতি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উহার শ্মশানান্ত পর্য্যন্ত, উহার পরলোকগত সন্ততিপর্য্যন্ত অনুধ্যান করিয়াছেন। ওইরূপ অনুধ্যান ব্যতীত, কেবল ঐহিকের আপাত-দৃষ্ট জীবনাংশ বা উহার কোন ভগ্নাংশ ধরিয়া কোন message, কোন জীবন-বার্ত্তা, মানবজীবন

বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত, কোন criticism of life উপস্থিত করা প্রাচীন ভারতীয় কবির পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, বলিতে পারি। মানবজীবন একটা ইহপরলোক-ব্যাপী অব্যাহত সন্ততি রূপেই ঋষিকবির নেত্রে প্রসারিত ছিল। যে কবি এই সমগ্রতা দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার পক্ষে কাব্যচেষ্টা করাই যেন ঋষিকবির আদর্শে একটা অন্যায়! রামায়ণ মহাভারতের আদর্শে এই সাহিত্যশিষ্টাচার সমগ্র পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষে প্রভুতা লাভ করিয়াছিল বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু হোমর রচনা করিয়াছিলেন Illiad অর্থাৎ ইলিয়ম বা ট্রয় নগরের অবরোধ। এই অবরোধও দশবৎসর ব্যাপী সংগ্রাম-ব্যাপারের ফলস্বরূপ ট্রয় নগরের ধ্বংসেই সমাপ্তিলাভ করে। কিন্তু হোমর কেবল শেষ কতিপয় মাসের ঘটনাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া, অকিলিসের ক্রোধ এবং সমর-বিরতি হইতে সূচনা পূর্ব্বক 'টমভাসা' হেক্টরের বধ ও তাঁহার শ্মশানকৃত্য বর্ণনা করিয়াই কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ইলীয়ড প্রকৃত প্রস্তাবে 'হেক্টর' বধ। এই লক্ষণেই ইলীয়ড একদিকে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় 'ইতিহাস কাব্য' হয় নাই, অথবা বঙ্গলালের 'পদ্মিনী' আদর্শের উপাখ্যান কাব্যও হয় নাই, সাহিত্যক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র theme বা বক্তব্যের আলাপশীল কাব্যরীতির আদর্শ রূপেই দাঁড়াইয়া আছে। এই রীতি লক্ষণেই হোমর একদিকে The father of European poetry রূপে স্থির আছেন। আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষও স্বতন্ত্রভাবে এই আদর্শ দর্শন করিয়াছিল—মাঘের শিশুপাল-বধ ও ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ে এইরূপ খণ্ড-বক্তব্যের আদর্শটিই মুখ্য হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন যেমন ছন্দোরীতি, যেমন ভাষারীতি, তেমন গঠন রীতিতেও মাঘ-ভারবির কিছু মাত্র প্রভাব গ্রহণ করেন নাই

বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। তিনি হোমরের 'হেক্টর বধ' আদর্শে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশকেই বক্তব্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক 'লঙ্কাভরসা' ইন্দ্রজিতের নিধন ও শ্মশানকৃত্যেই মেঘনাদ-বধ-কাব্য শেষ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য এই হোমরিক পাশ্চাত্য আদর্শ যেমন মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভবে, তেমন তাঁহার অনুসরণপথে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারেও আসিয়া গিয়াছে, নবীন চন্দ্রের পলাশীর-যুদ্ধেও উক্ত form বা 'কাব্যের কায়া-গঠনের আদর্শ'ই প্রতিফলিত হইয়াছে।

বঙ্গে পূর্ব্ব হইতে পৌরাণিক আদর্শের মনসা ও চণ্ডীকাব্য এবং 'পদ্মিনী' আদর্শের উপাখ্যান কাব্যই প্রবল ছিল। সুতরাং কাব্যের গঠন ক্ষেত্রে এই হোমরিক আদর্শ-পরিচয় একটা বিশেষ প্রাপ্তি বলিয়াই উল্লেখ করিতে পারি।

কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের উপর তৃতীয় পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রীক দেবমণ্ড ও দেববাদ। ইহা যে অনেক দিকে বরং একটা অনক্ত এবং অবাঞ্ছিত পদার্থই বঙ্গসাহিত্যে 'উন্নাবন' নাম-মুদ্রায় প্রচলিত করিয়াছে, অথবা পুনর্জীবিত করিয়াছে, তাহা না বলিলেও সত্য বলা হইবে না।

হোমরের কাব্য পাঠ করিলেই স্পষ্ট হয় গ্রীক দেববাদ কি ছিল, এবং কেন উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের আক্রমণেও এত সহজে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক দেবগণ চরিত্রে দৃশ্যতঃ একেবারে মানুষ অথবা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাও নিম্নতর চরিত্রের জীব বই নহেন। হিংসা, প্রতিহিংসা, নরলোকে প্রভুত্বের জন্য পরস্পর ঝগড়া, পূজা পাওয়ার জন্য লোভ, পূজকের প্রতি অত্যধিক দয়া-পক্ষপাত, দুর্ব্বৃত্ত ও ডাকাত শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাও ক্রূরতা খলতা এবঞ্চ মদ্যমত্ততা—এ সমস্ত হোমরিক দেবচরিত্রে অমানুষিক ভাবেই প্রকট হইয়াছে। গ্রীক আর্য্যগণের লৌকিক ধর্ম্ম হোমরের

ঋাব্যছায়ায় পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছিল বলিয়া কোন গ্রীক দার্শনিক যে অভিযোগ করেন তাহার প্রমাণ প্রতিপদে! প্লেটো কেন যে কাব্যকে তাঁহার রিপব্লিক হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। স্বর্গের রাজা জোভ এবং স্বর্গরাজ্ঞী জুনো—উভয়ের ঝগড়া ইতরজাতীয় নরদম্পতির কোন্দলকেও হার মানায়! মনুষ্য-বুদ্ধির ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে হোমারিক দেবতা মাত্রেই অপরূপ মাত্রায় স্বাধীন। নৈতিক 'নীতি' বলিয়া এক পদার্থ তাঁহাদের নাই।

হোমর কেবল কাব্যের machinery রূপে, দুর্ব্বোধ্য দেব-নিয়তি রূপে এই দৈব-যন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এই যদৃচ্ছা-চালিত নিয়তি শক্তি খাড়া করিয়াছেন, ইহা মনে করিতে ইচ্ছা হয়। হোমরের প্রতি আমাদের ভক্তি আছে। হোমরের কাব্য কবিকল্পনার অত্যুন্নত শিল্প গুণে, ভাষা ও ভাবুকতার কৌলিন্যে এবং সংযম শক্তিতে বরীষ্ঠ! হোমরের মানব চরিত্র গুলিও দেব চরিত্র হইতে আপাততঃ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান। সমুচ্চ মানব-আদর্শ রসিক মহাকবি দেবতাকে এইরূপ কদর্য্য কালিমায় অনুলিপ্ত করিলেন! ইহার মধ্যে একদিকে একটা অপরূপ রহস্য আছে। ইহা অন্ততঃ একদিকে সমগ্র গ্রীক জাতিটার প্রবল সংসারভাব-নিষ্ঠ এবং ভোগসুখাচ্ছন্ন অধ্যাত্মজীবন ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রতিবিম্ব!

উপরে উপরে দুই চারিটি philosopher থাকিলে কি হইবে? প্লেটো অরিষ্টোটল, সক্রেটীস, জেনো থাকিলেও কি হইবে? দুই চারিটি কবি, শিল্পী, jurist বা দেশের ভাগ্যপরিচালক থাকিলেই বা কি হইবে? পরিব্যাপ্ত গ্রীকসাধারণ কি পূজা করিত, ইহপরকালের কোন আদর্শ রাখিত, তাহাদের ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্য কোন্ আদর্শে শাসিত

হইত, উহার সংবাদ হোমরিক দেবচরিত্রের মধ্যেই উজ্জ্বল হইয়া আছে! একটা নীতিচক্র-হীন—'সুদর্শনচক্র'-বিহীন শাসক সম্প্রদায় মনুষ্যের অদৃষ্ট-পরিচালক! সর্ব্বত্র Tyranny, কেবল পক্ষপাত, কেবল might is right! কেবল শক্তির খামখেয়ালি অথবা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ! সমস্ত জাতিটার ভোগজীবনে—সংসারজীবনে এবং অধ্যাত্ম-আদর্শের জীবনে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। স্বেচ্ছাতন্ত্রী দেবগণকে তাঁহাদের রীতিতেই জীবন পরিচালিত করিয়া পূজা! ভারতবর্ষের বৈদিক অদ্বৈতবুদ্ধি ঋষিতন্ত্র অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের 'অধিকার'বাদী এবং ক্রমোন্নতি-লক্ষী কল্যাণ-তন্ত্র বলিয়া কোন আদর্শ সাগরবেষ্টিত এবং বাণিজ্য-লক্ষ্মীর করুণা-পরিপুষ্ট গ্রীসদেশে ছিল না। ভারতীয় অদ্বৈত 'ব্রহ্ম'বাদের অথবা জ্ঞান-বৈরাগ্য-তন্ত্রী মুক্তিবাদের নামগন্ধও গ্রীকজাতির ভাবরাজ্যে কিংবা জীবনে কিছুমাত্র ছায়া ফেলিতে পারে নাই! 'সোনার মিশরী', আবগস্ এবং মীসর দেশের প্রাচীন জড়বাদী সভ্যতার ছায়ায় পড়িয়া গ্রীসদেশীয় আর্য্যজাতি কেবল সংসারসুখ-নিষ্ঠ, বহির্দৃষ্টি-রত এবং বহিঃসৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সংসারের 'খোশা'টুকুর সৌন্দর্য্য উপভোগে বুদ্ধিবরীষ্ঠ, এবং ক্রিয়াকর্ম্মকুশল 'বীর'জাতিরূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গ্রীক-চরিত্র পুরাপুরি 'বীর' আদর্শের চরিত্র; উহার মধ্যে 'দৈব'-প্রকৃতির গন্ধমাত্র নাই—অবশ্য একেবারে পরিমাণ-বিহীন, সৌষ্ঠবহীন বা মোহ-কলুষ 'পশু' চরিত্রও নহে! গ্রীক সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত কেবল এই ক্রিয়া-নিপুণ, সৌষ্ঠবসুন্দর এবং বহির্ভদ্র 'বীরাচার' আদর্শই খ্যাপন করিতেছে! এই ভদ্রতা, এই কলানৈপুণ্য এবং সৌষ্ঠববুদ্ধি হইতেই প্রাচীনজগতের শিল্পসাহিত্যে এবং সমস্ত ললিত-কলা বিভাগে গ্রীকজাতির অতুলনীয় মাহাত্ম্য! হোমরের কাব্যেও

আদ্যন্ত ঐরূপ 'শিল্পতা'রই প্রতিষ্ঠা! 'দৈব' আদর্শ বা অধ্যাত্মতা বলিয়া কোন চরিত্র সাধনা—যাহা রামায়ণ মহাভারতে প্রতিপদে উদ্বন হইতেছে এবং যাহা 'শ্রুতিফল' রূপে আমাদের চিত্তকে উপসংহারে দখল করিতেছে—তাহার ছিটাফোটাও হোমরের মধ্যে নাই! এই বহির্ভদ্র 'বীর' আদর্শের নামই—খ্রীষ্টানের দৃষ্টিতে—pagan আদর্শ!

ভারতীয় অদ্বৈতবাদ—বৈদিক 'আত্মা' বা 'একমেবা দ্বিতীয়ং' বাদ ভারতীয় দেবতাগণকে কবিকল্পনার উৎকট বিজৃম্ভন এবং নিশ্চিন্ত লীলাখেলার হস্ত হইতে নানাদিকে রক্ষা করিয়াছে, বলিতে পারি! বৈদিক দেবতাগণকেও গ্রীকের তুলনায় নানাদিকে নিষ্কলঙ্ক বলা যাইতে পারে। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিকাব্য রামায়ণ মহাভারতের দেবতা-চরিত্রও নানাদিকে ঐরূপ মানুষ কলঙ্ক হইতে মুক্ত আছে। সংস্কৃতের পুরাণ সমূহের মধ্যে আসিয়া, বিশেষতঃ প্রাকৃতভাষার (যেমন বঙ্গভাষার চণ্ডীকাব্য ও মনসাকাব্য প্রভৃতি) পৌরাণিক কাব্যচেষ্টার সম্মুখে আসিয়াই ভারতীয় দেবচরিত্র গ্রীক দেবচরিত্রের সহোদর এবং সমধর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাণে দেবানুগ্রহের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল! কিন্তু ওই অনুগ্রহের মূলে ছিল তপস্যা। অসুর এবং রাক্ষসগণও প্রথম প্রথম তপস্যাবলে শিব এবং শিবানীর বর-যোগ্য হইয়াই সৃষ্টি-মধ্যে ক্ষমতা এবং প্রভুতা লাভ করে; পরে পরে প্রকৃতিগত দুর্জ্জেয় তামসিকতার বশে এবং শক্তি-প্রাবল্যে অন্ধ হইয়াই শক্তির কুব্যবহার করিতে থাকে; উহাতেই ক্রমে বিশ্বনীতির বিদ্রোহী এবং ভুবনের উপপ্লবকারী রূপে পরিণত হইয়া আপনার ধ্বংস আপনিই ডাকিয়া আনে। ইহাই হইল পৌরাণিক 'দেবানুগ্রহ'বাদের এবং অনুগ্রহদর্পিত দৈত্যতা বা রাক্ষস-তত্ত্বের মূল। সুতরাং উহাও খামখেয়ালী গ্রীক 'দেবানুগ্রহ' হইতে কত ব্যবহিত! গ্রীক 'অনুগ্রহ'-

বাদের মূলে সময় সময় ‘পূজা’ থাকিলেও ভারতীয় তপস্যা এবং ‘উপস্থিত বরযোগ্যতা’র আদর্শটুকু মোটেই ছিল না। পৌরাণিক দেব-বাদও ভারতীয় আর্য্যসমাজের দুরদৃষ্টকালের ঘটনা, নানাদিকে দ্রাবিড় ও অনার্য্য আদর্শে কলুষিতবুদ্ধির এবং উহার সঙ্গে রফারফি-বুদ্ধির পরিকল্পনা, তথাপি উহার মধ্যেও গ্রীকের তুলনায় দিনরাত্রির ন্যায় একটা পার্থক্যই অনুভূত হইতেছে! ভারতীয় ধর্ম্মের পরমমিত্র খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ পুরাণের কোন-কানাচ ঘাঁটিয়া ভারতীয় দেবতাগণের যে কয়টি কুৎসা আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই কুৎসাগুলিই গ্রীকের তুলনায় যেন স্তুতিবাদ বলিয়াই শুনাইবে। প্রাচীন পাশ্চাত্য জগতের অতুলনীয় শিল্প-বুদ্ধিশালী এই গ্রীকজাতি আপনাদের অধ্যাত্ম জগতে এই সমস্ত অন্যায় এবং অনীতির দেবতা-মূর্ত্তি কি করিয়া পূজা করিয়াছে? গ্রীক দার্শনিকগণের ধর্ম্ম কেন গ্রীকসাধারণের ধর্ম্ম হইতে এত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল? গ্রীকদার্শনিকগণ সাধারণের ধর্ম্মকে কেন এত ঘৃণা করিয়াছেন? যেই গুণে ভারতীয় ঋষি সর্ব্ব-সাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং দেবতার ‘মানবীকরণ’ আদর্শের আবহাওয়া পর্য্যন্ত উচ্চতর আদর্শে পরিচ্ছন্ন রাখিতে অথবা সংস্কৃত করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহা কি? এবং, কিরূপেই বা উহা পরবর্ত্তিকালের সংস্কৃত পুরাণ এবং প্রাকৃত ভাষার পুরাণ চেষ্টাগুলির মধ্যে আসিয়া অধঃপতিত এবং কলঙ্কিত হইয়া গেল—সেই বৃত্তান্ত একটা স্বতন্ত্র আলোচনা-গ্রন্থের সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই বলিয়া নিবৃত্ত হইব যে, মধুসূদন কাব্যক্ষেত্রে হোমরের প্যাগান দৃষ্টান্তেই প্রবলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; এবং উক্ত উৎ-সাহকে বঙ্গের চণ্ডী ও মনসা কাব্যগুলির দেববাদের আদর্শ প্রবলতর ভাবে সমর্থিত করিয়াই তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদের দেবযন্ত্রকে

আধুনিক বঙ্গকাব্যের ক্ষেত্রে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছে। এইরূপে গ্রীক ও প্রাকৃত বাঙ্গলার পৌরাণিক দেবগণের 'দুর্ব্বোধ্য' কার্য্যতন্ত্রের ছায়াতেই মেঘনাদের 'চঞ্চলা' লক্ষ্মী এবং 'দুরন্ত' 'দুর্নিবার' কামদেবতার কার্য্যপ্রণালী অধ্যয়ন করিতে হইবে। "শম্ভু-স্বয়ম্ভু হরয়ো যেনা ক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্ম্ম দাসাঃ" সেই 'ভুবনবিজয়ী' এবং নরামরে সমানবুদ্ধি দুর্দ্দান্ত মদনের অমানুষিক আলাপ-ব্যবহারও এইরূপ দৃষ্টিতেই সঙ্গতি লাভ করিবে।

মধুসূদন পূর্ব্বতন কোন্ কোন্ কবি হইতে তাঁহার কাব্যের কোন অবস্থা অথবা ঘটনার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাব এবং চিন্তার কোন্ কোন্ উপায় অথবা উপজীব্য পদার্থটি কোন্ কবি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মেঘনাদ বধ পাঠ করিতে করিতে তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়া এক শ্রেণীর অধ্যয়ন কিংবা ব্যাখ্যানের পদ্ধতি হইতে পারে। বিদ্যালয়সমূহে সাহিত্যের অধ্যাপনে পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ উক্ত পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। কিন্তু উহাতে বরং কবির প্রকৃত পরিচয় অপেক্ষা কাব্যার্থের অথবা বাক্যবিশেষের অর্থপরিচয়েই আবশ্যকতর সহায়তা ঘটে;—কবি-প্রতিভার প্রধান মাহাত্ম্যটাই হয়ত আড়ালে পড়িয়া যায়। উপস্থিতক্ষেত্রে ওইরূপ পাণ্ডিত্য অথবা পাণ্ডিত্যাভিমানের প্রণালী অনুসরণ করিতে আমরা অসমর্থ। আমরা বুঝিতে চাই, মেঘনাদ কাব্যের প্রধান প্রাণ-শক্তি কোথায়? কবির রস-নিষ্পত্তির মূলটুকু কোথায়? অনেক আধুনিক কবির ন্যায়,যেমন মিল্টনের তেমন রবীন্দ্রনাথের ন্যায়ই, মধুসূদনকে একজন সমুচ্চশ্রেণীর গ্রন্থজীবী কবি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বসূরিগণের বৃহৎ ভাবচিন্তার বিত্তঋণ ন্যূনাধিক আসিয়া পড়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যে উন্নতিশীল কবিমাত্রের মধ্যে, জাতীয় ভাব এবং চিন্তাসূত্রের বর্দ্ধনকারী

অথবা স্বাধীন-আবিষ্কারী প্রতিভা মাত্রের মধ্যে এইরূপ একটা 'ঋণ' পূর্ব্বভিত্তি এবং পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে ন্যূনাধিক না থাকিয়া পারে না। কেন না, পূর্ব্বাবস্থা হইতে অগ্রসর হওয়ার নামই ত উন্নতি! তবে, বুঝিতে হইবে, ঐরূপে মেঘনাদের আদ্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক উহার 'পূর্ব্বঋণ' নির্দ্দেশ করিয়া আসিলেও মধুকবির প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার বিশেষত্ব নির্দ্ধারিত হইবে না! তাজমহলের ন্যায় মালমসল্লা এবং ইটপাটকেল ত আমাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে। তবু ত এ যাবৎ তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় স্থাপত্যশিল্প রচিত হইল না! মেঘনাদবধের প্রত্যেক শব্দই বঙ্গভাষার কোষগ্রন্থে মিলিবে, উহার ভাববস্তু ও চিন্তার অনেক ছোট-বড় পদার্থই হয়ত মধুসূদনের পূর্ব্বাপর সাহিত্যরাজপথে ছড়াইয়া আছে! তবু ত কোন দ্বিতীয় বাঙ্গালী দ্বিতীয় মেঘনাদ রচনা করিতে পারিল না। ভারতের অপর কোন প্রাকৃত ভাষাও হয়ত মধু-সংঘটন করিতে পারিল না! পরন্তু এই দৃষ্টিস্থান হইতেই মধুসূদন দত্তের প্রকৃত মহাত্মতা এবং দুর্লভতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

সবিশেষ বুঝিতে হইবে মেঘনাদের শিল্পতা-নিষ্পত্তির প্রাণস্বরূপ অদৃষ্ট বাদটি! কেন না, উহা কাব্যটির পূর্ব্বোক্ত দেবতাযন্ত্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ থাকিয়া উহার একটা সিদ্ধান্তরূপেই দাঁড়াইয়া আছে; এবং ওইস্থানেই নিদারুণ ভ্রম নিয়তভাবে ঘটিয়া আসিতেছে। উহা কর্ম্মফল-বাদী ভারতীয় ঋষির 'অদৃষ্ট' নহে—গ্রীক অদৃষ্টবাদ। অনির্ব্বচনীয় এবং 'অচিন্ত্যহেতুক' 'দেবতার ইচ্ছা' বা 'দৈব' বলিতে যাহা বুঝায়, মধুসূদন হোমর হইতে সেই অদৃষ্টবাদই লাভ করিয়াছিলেন—এবং মেঘনাদের রসনিষ্পত্তি বিষয়ে তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের উচ্চশির ঐরূপ 'দৈবা-

দৃষ্ট' বশেই 'ভিখারী' রাঘবের চরণে ধুলি-লুণ্ঠিত হইয়া গেল! অন্ধ, জীবনপথিক মনুষ্য যাহার অর্থ অথবা রহস্য খুঁজিয়া পায় না, সেই অপ্রতিবিধেয় অদৃষ্টের বাধ্য হইয়াই রাবণের পরাজয়, নির্য্যাতন এবং ধ্বংস! রাণী চিত্রাঙ্গদা উহাকে 'কর্ম্মফল' বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু রাবণ তাহা গ্রহণ করে নাই! এই অদৃষ্টবাদই মেঘনাদের কারুণ্য-নিষ্পত্তির মূল! কবি স্বয়ং আপনাকেও যেই অদৃষ্ট-কবলে এবং লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত মনে করিতেন, উহা সেইরূপ অদৃষ্ট! 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'র মর্ম্মতলেও সেই নিদারুণ অদৃষ্ট! এই 'অদৃষ্ট বা বিধিলিপি' না বুঝিলে মেঘনাদের রস-আত্মা এবং রাবণাদির প্রতি সহানুভূতি সম্পূর্ণ বিপ্রতিষিদ্ধ হইয়া যাইবে।

রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারকে বাল্মীকি একটি 'রাক্ষসিক' কার্য্য বা নৈতিক অপকর্ম্ম রূপে উপস্থাপিত করিয়াই রামের দিকে পাঠকের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছেন! কিন্তু মধুসূদনের রাবণ 'আত্মসম্মান'-গর্ব্বী রাজা, অপ্রণয়ী কিংবা অনিচ্ছুক নারীর প্রতি তাহার কিছুমাত্র কামাভিসন্ধি নাই! ভগিনীর অপমানে নিজের প্রতাপ-শ্রী এবং রাজশ্রীকে অবমানিত মনে করিয়া 'আততায়ী' রামের সঙ্গে সমুচিত শত্রুতা এবং স্বকীয় অপমানের প্রতিশোধ সাধনের উদ্দেশ্যেই মধুসূদনের রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ! সে জন্যই মধুসূদনের রাবণ সীতার সতীত্বধর্ম্মের উপর কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে নাই! রাজনীতি-অধিকারের শত্রুতা এবং রণনীতি-অধিকারের অরিতা-কার্য্যরূপেই যে মধুসূদনের রাবণ সীতাহরণ করেন, ইহা মেঘনাদের পাঠককে সর্ব্বাগ্রে, কাব্য-পাঠের প্রবেশ-মুখেই বুঝিয়া লইতে হইবে। তাই, নিজকে "ভিখারী" রামের হস্তে পদে পদে বিধ্বস্ত দেখিয়া মহাবীর

রাবণ নির্দ্দয় ভাগ্যলক্ষ্মী এবং নিদারুণ অদৃষ্টলিপি স্মরণ করিয়াই পদে-পদে ক্ষোভে রোষে ছটফট করিয়াছে ও আমাদের সহানুভূতির দাবী করিতেছে। বলবীর্য্যে এবং ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দী এই সম্রাট্-পুরুষ দৈববলে সামান্য শত্রুর হস্তেই তৃণের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! মহাবীর 'কুম্ভকর্ণ,' 'বীরচূড়ামণি' বীরবাহু এবং 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদের শক্তি-দর্প পর্য্যন্ত চূর্ণ চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল! এস্থলেই গ্রীক অদৃষ্ট-বাদ। এবং বুঝিতে হইবে, ইহা একটা 'মামুলি কথা'ও নহে! এই যুগেও, আধুনিক জগতের 'জড়বাদী' অথবা 'সংশয়ী বিজ্ঞান'-দর্শনের হৃদয়েও মনুষ্যজীবনের অপরিহার্য্য 'দুঃখ'-তত্ত্ব এবং 'মৃত্যু'-নিয়তির বিষয়ে হয় ত এতজ্জাতীয় 'দুর্ব্বোধ্য অদৃষ্টবাদ'ই আছে! যাই হোক, এইদিক হইতে না দেখিলে যেমন কবির মানব জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতা তেমন তাঁহার রাবণচরিত্রের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এবং মেঘনাদ কাব্যের করুণ-রসের মূলরহস্যও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। আরও বুঝিতে হইবে যে, এই 'অদৃষ্টবাদ' না ধরিলে কবি কখনও বাল্মীকি-শিষ্য ভারতবর্ষের চিত্তে 'রাবণের প্রতি পাঠকের কারুণ্য-সহানুভূতি'রূপ রস-নিষ্পত্তি সিদ্ধ করিতেই পারিতেন না। এ ক্ষেত্রেই মধু কবির গভীর শিল্প-দৃষ্টির এবং শিল্পতা-বুদ্ধির পরিচয় আছে!

এই স্থলে দাঁড়াইয়া, মেঘনাদের রস-মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, কবির হৃদয় 'অদৃষ্টবাদ' বিষয়ে পুরাপুরি 'গ্রীক' হইয়া গিয়াছিল; এবং এই গ্রীক অদৃষ্টবাদ বঙ্গ সাহিত্যে (নলোপাখ্যান এবং শ্রীবৎস-চিন্তা প্রভৃতি উপাখ্যানের সহিত পরিচিত বঙ্গসাহিত্যের পক্ষেও) নানা দিকে নব উপনয়ন এবং নূতন প্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি! হেমচন্দ্র মধুসূদনের পথে এই গ্রীক অদৃষ্টবাদকেই 'নিয়তি' নামে, সুরাসুর-মানবের জীবন পরি-

চালয়িত্রী রূপে, বৃত্রসংহারে গ্রহণ করিয়াছেন! যেমন মেঘনাদে 'গ্রীক' দেববাদ, দৈবযন্ত্র এবং অদৃষ্টবাদ দেখিতেছি, তেমন মধুকবির অসম্পূর্ণ কাব্য সমূহের মধ্যেও—সুভদ্রাহরণ এবং সিংহলবিজয় প্রভৃতিতেও—উহাই দেখিতেছি! তিলোত্তমাসম্ভবের মধ্যেও ওই অদৃষ্টবাদ! মধুসূদন রাজনারায়ণকে যে একটি কথা লিখিয়াছিলেন উহা তাঁহার রাবণচরিত্রের মূল রহস্যটাও ব্যক্ত করিতেছে। "তুমি ইন্দ্রের প্রতি অবিচার করিতেছ, ইন্দ্র প্রকৃত বীর পুরুষ! But he can not resist Fate!" 'নিয়তি'কে বাধা দিতে পারে নাই! এই অপ্রতিরোধ্য নিয়তিবাদ, উহা মধুসূদনের উভয় কাব্যের মেরুদণ্ড। মেঘনাদ বধের অন্তরাত্মা বুঝিতে না পারিয়া যেমন তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ, তেমন অসংখ্য বিচারক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "মেঘনাদ কাব্যের মেরুদণ্ড কোথায়"? "এই কাব্যের নায়ক কে?" "বাল্মীকির বীরপুরুষ রামরাবণ এই কাব্যে আসিযা এত 'বিলাপ' করে কেন?" "এই কাব্যের নায়ক রামলক্ষণ না হওয়া ত প্রতীয়মান! কাব্যের রঙ্গভূমিতে, মহিমান্বিতভাবে অঙ্কিত হইলেও, ইন্দ্রজিতের কার্য্য এত স্বল্প যে তাঁহাকেও নায়ক বলা চলে না। কাব্য-ক্ষেত্রে রাবণের জীবনও শেষ হয় নাই; অথচ এই 'বাঙ্গালী' কবির কাব্যটি আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল অপরিহার্য্য দুঃখ-যন্ত্রণার 'বিলাপে' পূর্ণ!" (১) এ-জাতীয় সংশয় এবং বিরুদ্ধবুদ্ধির জিজ্ঞাসা ৬০ বৎসর ধরিয়া বিচারকমহলকে মথিত করিয়া আসিতেছে!

---

(১) "বুঝ যে ঘাঁটায় সখা হেন বাঘিনীরে" ইত্যাদি কথা রামচন্দ্র নর্ম্মকৌতুকের ভাবে বন্ধু বিভীষণকে বলিয়াছিলেন। তাহাও রামের 'নিদারুণ ভীরুতার' দৃষ্টান্ত-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে!

মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "বাল্মীকির সাহচর্য্য যতদূর পারি পরিহার করিব" "একজন গ্রীক—প্রকৃত গ্রীক যাহা লিখিতে পারে সে পথেই চলিব।" তার পর কাব্য শেষ করিয়াও, রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন "আমি মেঘনাদকে কাব্যশাস্ত্রের দোষগুণ আদর্শে বাজাইয়া এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি যে, অতিবড় বিপক্ষ বিচারকগণ—ফরাসী সমালোচকগণও—উহার প্রতি বিরূপ হইতে পারিবেন না।" অদ্বিতীয় সাহিত্য-পণ্ডিত মধুকবির এ সকল কথারই বা অর্থ কি? কেহ কবির প্রতি প্রকৃত সম্মানবুদ্ধি এবং সহৃদয়তার সহিত কথাগুলি 'তলাইয়া' দেখিতে কিংবা "বাল্মীকিকে ভুলিতে"ও চাহেন নাই!

আমরা বলি, মধুসূদনের দিক হইতে দেখিতে জানিলে মেঘনাদকে এ-সকল বিষয়ে অনিন্দিত-শ্রী এবং দিব্যসুন্দর কাব্য বলিয়াই বুঝিতে পারিব! মেঘনাদের নায়ক সপরিজন, নিদারুণ অদৃষ্ট নিয়তির নাগিনী-পাশবদ্ধ এবং অপরিহার্য্যভাবে মৃত্যুকবলোন্মুখ রাবণ। লঙ্কাপুরীর আশা-যষ্টি ইন্দ্রজিতের দৈব নিয়োজিত বিনাশ রাবণাদৃষ্ট-নাটকেব অন্তিমাঙ্কের চূড়ান্ত-পূর্ব্ব দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে! উহার পর, রাবণের শেষ দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান বলিয়া পরম শিল্প-ফলশ্রুতির আদর্শেই কাব্যক্ষেত্রে পরিহৃত হইয়াছে। মানবজীবনের অপরিহার্য্য নিয়তির 'ফলশ্রুতি'ই মেঘনাদ বধ কাব্যতরুর সকল গৌণ-মুখ্য রসধারা, ঘটনা-পল্লব এবং শাখা-প্রশাখার মূল কাণ্ড—কাব্যটির করুণরসাত্মক স্থায়ী ভাবের মেরুদণ্ড! "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?" 'কালো বলী কেবলঃ!"

গ্রীক 'দৈব'বাদের মূলতত্ত্ব যাহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন, গ্রীক ভাস্কর্য্যের পরম শক্তিশালী শিল্প নমুনা লেওকুন (Laocoon) কি অতুলনীয় ভাবুকতায় উহাকে প্রমূর্ত্ত করিয়াছে! লেওকুন-পরিবার

সর্ব্ববলীয়ান্ এবং দুরতিক্রম্য দুরদৃষ্টের মহানাগ-পাশে পড়িয়া ছটফট করিতেছে—ঐ মহাপাশ কোনমতে ছাড়াইবার যো নাই! ধ্বংশ অনিবার্য্য! গ্রীক 'অদৃষ্ট'বাদের দৃষ্টিতে উহাই ত মনুষ্যজীবন! ওই চির প্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি মনে রাখিয়া চিন্তা কর Laocoon Groupএর বাম দিকের মূর্ত্তি বীরবাহু (বা কুম্ভকর্ণ?), ডাহিনে মেঘনাদ—মহাসর্পের দংশন জর্জ্জরিত মেঘনাদ! মধ্যস্থলে, নাগপাশের পূর্ণ পীড়ণের কেন্দ্রস্থলে, মৃত্যু-দংশনের অব্যবহিত পূর্ব্ব মূহুর্ত্তে, ঘণীভূত ক্ষোভ-রোষ-বিষাদের অশক্ত বীর্য্য-মূর্ত্তি রাবণ—মহাপুরুষ রাবণ! ইহাইত লেওকুন প্রমূর্ত্তি—যাহা গ্রীক 'নিয়তি' ভাবের বস্তুগত পরিকল্পনা এবং যাহা গ্রীকপণ্ডিত মধুসূদনের মনে না থাকিয়া পারে না! ইহার ছায়ায় মেঘনাদ কাব্যকে দর্শন কর—উহার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্পষ্ট হইবে, সমস্ত আপাত অসঙ্গতির ও সঙ্গতি হইবে।

রাবণকে নিপাতিত করিবার জন্য তাহার প্রত্যক্ষতার অন্তরালে, তাহার জীবন-পরিচালক যে নিয়তি-চক্র চলিতেছিল, কবি তাহাকেই প্রমূর্ত্তি দানপূর্ব্বক কাব্যের ক্ষেত্রে উহার দেব-যন্ত্র রূপে উপস্থিত করিয়াছেন! রাবণ পদেপদে "বিধি" ও "বিধাতা" রূপে ওই নিদারুণ অদৃষ্ট ষড়্‌যন্ত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে!

অপরাজিত বীর্য্যশালী রাবণ 'বিলাপ' করিয়াছে! দেখিতে হইবে, কাব্যের ক্ষেত্রে ঐ বিলাপের প্রয়োগ-লক্ষ্য! উহার উদ্দেশ্য রাবণের চিত্ত-দুর্ব্বলতা বা কার্পণ্য ত নহে! পাঠকের সমক্ষে নিদারুণ অদৃষ্ট-পীড়ণার অসহ্য শক্তির পরিমাণটুকু প্রকাশ! এবং দুঃখ-পীড়ার এতটা পরিমাণ সত্ত্বেও রাবণের সহ্যতা-শক্তি এবং তাহার ধৈর্য্য ও বীর্য্যশক্তির সঙ্কেত! জীবনে চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষের মুখে নিজের 'অকারণ' দুরদৃষ্টের প্রতি রোষ এবং ক্ষোভজনিত হাহাকার!

যে অসহ্য যাতনায় পদে পদে নিষ্পেষিত হইয়া তিলেতিলে মরিবে, তথাপি কোনমতে আত্মসমর্পণ করিবে না—এমন আত্মনিষ্ঠ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের অশক্ত ক্রোধরোষ-গর্জ্জিত হাহাকার। 'মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য' মহাসর্পের হা হুতাশ! প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালায় দহ্যমান মহা চুল্লীর তপ্ত নিশ্বাস! রাবণচরিত্রের এই রহস্যময় করুণ লক্ষণটি—'গ্রীক' লক্ষণটি বুঝিতে না পারিলেই অবিচার। উহা যে, অদৃষ্টনিয়ন্ত্রিত, বিষাক্ত অঙ্গাবরণে আবদ্ধ হইয়া মহাবীর হার্কিউলিসের হাহাকার! দেবযন্ত্রিত, অনির্ব্বাণ বিষ-জন্য ক্ষত সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়া মহাপুরুষ ফাইলেক্‌টেটের ছটফটি। কুক্ষিদেশে করাল দংষ্ট্রা-বদনা, ত্রিমুখী কুকুরীর অনিবার কামড় সহ্য করিয়াও মনুষ্যজাতির মহামহিম উদ্ধারকর্ত্তা প্রমীথিয়সের 'বিলাপ'-নিয়তি! গ্রীক অদৃষ্টবাদ না বুঝিয়া 'মেঘনাদ বধ' বুঝিতে যাওয়া!

বলিয়াছি, কবি মধুসূদন আপন অদৃষ্টের ডাকিনী-নিয়তির বাধ্য হইয়াই যেমন স্বয়ং জীবনপথে পরিচালিত, তেমন সাহিত্যক্ষেত্রে উহার সহধর্ম্মতা-সূত্রেই গ্রীকশিষ্য! দৈব-নিয়ন্ত্রনা-বাদী হোমর, এস্‌কাইলাস ও সফোক্লিসের শিষ্য! ইংরাজী সাহিত্যেও সম্পূর্ণ গ্রীক আদর্শে বিরচিত সেই অদ্বিতীয় Samson Agonistes এর কবি মিল্‌টনের শিষ্য! গ্রীক সাহিত্যশিল্পের আদর্শ ছিল Humanism মানবত্ব। শিল্প মাত্রই মানব জীবনের তত্ত্বদর্শন বা Criticism of life! যেই 'মানবত্ব' আদর্শে হোমরের দেবতাগণ পর্য্যন্ত অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রণায় মানুষের দেহ-ধর্ম্মে ছটফট করে, সেই মানব-ধর্ম্ম! মানুষের এই ছটফটি দেখাইবার উদ্দেশ্য কি? তাহাদের দৈন্য বা কার্পণ্য দেখাইবার জন্য ত নহে—অদৃষ্ট যন্ত্রণার প্রবলতা, দুর্ব্বিষহতা, একেবারে অসহ্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে! এত যন্ত্রণায় পড়িয়াও, মানবের মহাপুরুষগণ, সাম্‌সন, প্রমীথিয়স বা

ফাইলেক্‌টেটগণ নিজের সূত্র, আত্মমুষ্টি এবং আত্মকেন্দ্র যে ছাড়েন নাই, মহাপুরুষগণের সেই মাহাত্ম্য সমুজ্জল করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে! মহাপুরুষমাত্রের জীবনেই ত এই দুঃসহ নিয়াতর লক্ষণ! গ্রীক দর্শন এবং গ্রীক শিল্প মনুষ্যের জীবন-নিয়তি অধ্যয়ন করিয়া ওই তত্ত্বটুকুই সর্ব্বথা বলীয়ান্ বলিযা দেখিয়াছে। নিয়তির নিদারুণ কাঠুরিযা একেএকে জীবনের সকল সুখ-সোয়াস্তি ও আশাভরসার শাখাদলকে কাটিতেছে,—স্বয়ং দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, মৃত্যুর দংষ্ট্রা-করাল বদন প্রত্যক্ষ হইয়া সম্মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে—তবু নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের আত্মাদর ছাড়বার কথা মাত্র নাই, আত্মসমর্পণের চিন্তালেশ মাত্র নাই! এই ত মনুষ্যত্ব-ইতিহাসের মহাপুরুষ! এই ছট্‌ফটি না বুঝিয়াও মেঘনাদ বুঝিতে যাওয়া!

রাম লক্ষণকে হীন করা হইল কেন? রাবণ মেঘনাদ হইতেই আত্মার ক্ষমতায় যেন দুর্ব্বলতর করা হইল কেন? বাল্মীকিকে না ভোলা, এমন কি অনেকস্থলে কবিগুরুর প্রয়োগ-আদর্শটাও প্রকৃত প্রস্তাবে না বোঝার কারণেই এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে! বেচারা কবি "মাথার দিব্য" দিলেও কেহ তাঁহার দিক হইতে দৃষ্টি করিতে চাহে নাই। ঐরূপ না করিলে রাম লক্ষণের দৈব-পুষ্ট শক্তি এবং রাবণ মেঘনাদের অদৃষ্ট-শক্তি-জন্য পরাজয় ও বিনিপাত কি করিয়া উজ্জল হইত? 'অদৃষ্ট' কাব্যের রসনিষ্পত্তি হইত? বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসও কি অনেকস্থলে প্রকারান্তরে তাহাই করেন নাই? যেমন বলিয়াছি, ইন্দ্রজিতের পতন রাবণ-নায়কের জীবনের অন্তিমপূর্ব্ব দৃশ্য ও চরমের মহাশ্বাস ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে! মেঘনাদের মৃত্যুর পর অপরিহার্য্যভাবে পতনোন্মুখী হইয়া ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত কম্পমানা 'সৌধকিরীটিনী 'সপ্ত

দিবা নিশা' বিলাপ করিয়াছে—আমাদের মনোজগতে দাঁড়াইয়া চিরকাল হাহাকারেই রত আছে; সর্ব্বস্ব হারা রাবণ, নিজের সর্ব্ববল-গর্ব্বের আশ্রয় ইন্দ্রজিৎ পুত্রের চিতাপার্শ্বে মহাবসানের সেই সর্ব্ব-উলঙ্গ ভিখারী বেশে চিরকালের জন্য দাঁড়াইয়া আছে! রাবণের বধ সাধন করিলে বোধ করি মেঘনাদ কাব্যের এতটা মাহাত্ম্য, উহার 'রস' প্রয়োগের এতটা অধ্যাত্ম শক্তি জন্মিতে পারিত না। লঙ্কা কাঁদিতেছে, কিন্তু কদাপি আত্ম-সমর্পণের কথা ত মনে আনিতেছে না! রাবণ বিলাপ করিতেছে অসহ্য পীড়া-ধর্ম্মে—দেহি-ধর্ম্মে, ভুলেও ত রামের নিকট পরাভব স্বীকারের কথাটুকুন ভাবিতেছে না! মধুসূদন তাহাকে কাঁদাইয়াছেন, তাহার আত্মার ঐ বিজয়শ্রী উজ্জল করিবার উদ্দেশ্যে। এই অনম্যমেরুদণ্ডী রাবণ! সংসারে মেরুদণ্ডী মহাপুরুষগণ কি এইরূপে অবস্থার অসহনীয় নিষ্পেষণেও চিরকাল সত্যের জন্য, ভাবের জন্য, আত্ম-মর্য্যাদার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়া যান না—মরিয়া যান না? এই স্থানেই মেঘনাদ কাব্যের moral শক্তি—রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি! মনুষ্যের জন্য দৃষ্টান্ত বা আশ্বাস খুঁজিতে হয়, তাহাও এই স্থানে! এই ত মেঘনাদ কাব্যের শিল্পাত্মা—গ্রীক শিল্পাত্মা—অথচ সার্ব্বজনীন রসনিষ্পত্তি! মানব জীবনের সুগহণ নৈতিক দ্বন্দ্বকে বাস্তব-মূর্ত্তি প্রদান করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বরীষ্ঠ শিল্প-সিদ্ধি! বঙ্গীয় সাহিত্যরসিক মাত্রের অন্তরাত্মা এতকাল যাহা হয়ত অত-র্কিতে বুঝিয়াছে, অথচ বাক্যমুষ্টিতে ধরিয়া আপত্তিকারিগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হয়ত পারে নাই!

বলিতে কি, এইরূপ মহনীয় আদর্শের দ্বিতীয় একটি চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। এই-তন্ত্রীয়, এই-জাতীয় অপর একটী কাব্য বা নাটক

বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। হেমচন্দ্র নিয়তিযন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন; বৃত্রসংহারও সেক্সপীয়রের 'করুণান্ত' নাট্য-আদর্শে উচ্চাভিলাষী বৃত্র-জীবনের একটি ট্রেজিডী হইয়াছে! সেক্সপীয়রের অথেলো, লীয়র, হ্যামলেট বা ম্যাক্‌বেথ—পরম করুণ-রসাত্মক ট্রেজিডী সত্য, উহাদিগকে হয়ত গ্রীক 'ফেট' বা নিয়তির আদর্শেও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু উহাদের নায়কগণের করুণান্ততার মধ্যে "প্রমীথিয়স বাউণ্ড" বা 'ফাইলেক্‌টেটের' ন্যায় মনুষ্যের অন্তর্বলের জয়শ্রী উদ্দিষ্ট হয় নাই! উহারা 'মৃত্যুর কোলেও আত্মার বিজয় গাথা' নহে। কেবল মিল্‌টনই অন্ধ সাম্‌সনের অদৃষ্ট পীড়া-বিজয়ী আত্ম-সামর্থ্যের মধ্যে এবং শেলী 'প্রমীথিয়স আন্‌বাউণ্ড' নামক কাব্যে প্রমীথিয়সের সহতা-শক্তির মধ্যে প্রকৃত গ্রীক-শিষ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। মেঘনাদের ন্যায় এইরূপ বিনির্ম্মল গ্রীকতন্ত্রী করুণ-কাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণও অধিক রচনা করিতে পারেন নাই। এস্থানেই এই বাঙ্গালী কবি মধুসূদন দত্তের মহার্ঘতা!

এই কাব্য রচনা করিতে বসিয়া মধুসূদন স্বয়ং কিরূপ 'মধুমত্ত' হইয়া উঠিয়াছিলেন—মহীয়সী বাক্ দেবতার অধিষ্ঠানে নিজকে কিরূপে একেবারে সপ্তম স্বর্গে উত্তোলিত মনে করিতেছিলেন—তাহার প্রমাণ দেখুন! "মেঘনাদ একটা মহিমাময় কাব্য হইতেই চলিয়াছে! ইহার অমিত্রচ্ছন্দও সঙ্গীতের তত্ত্বকে অপূর্ব্বভাবেই আয়ত্ত করিতেছে! আমার এই ছন্দ যেমন বর্জ্জিলের ছন্দের মতনই মধুরতায় বহিয়া চলিয়াছে, তেমন সরল এবং কোমল ভাষাকেও অবলম্বন করিতেছে! ইহার মধ্যে তিলোত্তমা সম্ভবের সেই দুর্দ্দান্ত সমুন্নতি আর দেখিতে পাইবে না"। পুনশ্চ—"আমার মাতৃভাষা আমার হস্তে এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার দিবেন বলিয়া ত স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই! তোমাকে বলিতে কি, এই কাব্যের স্থল বিশেষ আমার হৃদয়কে

আত্ম-শ্লাঘাতেই পূর্ণ করিতেছে! আমার মধ্যে চিন্তা এবং কল্পনার উদ্রেক মাত্রই যেন ভাষা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এমন সমস্ত কথা, যাহা কখনও জানিতাম বলিয়াই মনে করি নাই! ইহা একটা পরম রহস্য—তোমাকে বলিলাম।”

যে কবি এইরূপে ভাবাক্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়াই কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার সেই কাব্যে অতর্কিতে তাঁহার নিজের বুক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াই উহার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' করিয়া দেয়! এবং সেই রক্তের উত্তাপ প্রাণীমাত্রের বুকে লাগিলেই তাহাকে আবিষ্ট না করিয়া পারে না! কবির পক্ষে পাঠকের হৃদয়কে নিজের দাসানুদাস করিবার অন্য উপায় নাই। মধুকবিও সেই উপায়ে কি করিয়া বসিলেন? মেঘনাদ এমন একটা কাব্য হইয়া গেল—যাহা পাঠ করিতে বসিলে পাঠকের হৃদয় আত্মবিস্মৃত হইয়া একেবারে কবির দাসানুদাস হইয়া যায়! তাহার আর বিচারের শক্তিও যেন থাকে না! কবির হাজার দোষ থাকুক, কবি পাঠকের চিরন্তন সংস্কারকে, এমন কি ধর্ম্মবিশ্বাসকেও যতই প্রচণ্ডভাবে আঘাত করুক, পাঠকের মুখ খুলিবার শক্তি নাই, সে মুগ্ধ—বিস্মিত, স্তম্ভিত! ঠিক 'মৈস্মরী' বিদ্যায় আবিষ্টের ব্যাপার! পাঠক বুঝিতেছে, এ যে এক অসুরের হাতেই পড়িয়াছে! সে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়া, আপন শক্তির প্রবল বাত্যা-চক্রে ফেলিয়া তাহাকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরকে ঘুরাইয়া আনিতেছে! তাহার মনবুদ্ধি এবং বিশ্বাসকে ইচ্ছামত ওলট-পালট করিয়াই খেলা করিতেছে! তাহার কি রা-শব্দ করিবার সাধ্য আছে? আর বিচার এবং সমালোচনা—সে ত পরের কথা! কিন্তু এই বিচার শক্তিও কি পাঠকের অটুট থাকিবে? যে একবার এই প্রচণ্ড যাদুকরের হাতে পড়িয়াছে—একবার মেঘনাদ বধ প্রথম

হইতে শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছে, তাহার বিচার-শক্তিটাও কিবৎ পরিমাণে খোয়াইয়া গেল! সে সমস্ত ভুলিয়াই বলিতে বাধ্য হইল 'মধুসূদন তুমি কবি—যথার্থই বড় কবি!' সাহিত্য-জগতের অন্য বড় কবির তুলনায় মধুর 'হাজারো দোষ' মনের মধ্যে গিজ্-গিজ করিতে থাকিলেও এ কথা না বলিয়া কাহারও ছাড়া নাই।

সেকালে মধুর বিপক্ষদলের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, যাহারা মধুকে নিন্দা-টিটকারী করিতে কসুর করিতেন না, যাহারা তিলোত্তমা সম্ভব পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন "হাঁ, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে, মন্দ হয় নি" তাঁহারা যেমন মেঘনাদকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিতে বাধ্য হ'ন, তেমন একালেও, বঙ্গসাহিত্যের এত উন্নতি সত্ত্বেও, উহার ভাবকতার ভাণ্ডারে এবং ভাষার গতি ও মাধুর্য্যে এত বৃদ্ধিশালিতা, এত মনস্বিতা, এত পরিমার্জ্জনা এবং কোমলতা বিকাশ সত্ত্বেও অনেক পাঠক ঐ কথাই বলিতে বাধ্য হইয়াছে! মধু তাঁহার বন্ধুর নিকট লিখিলেন, "It has silenced our cavillers, is 'nt that a victory, o'ld chap?"

মেঘনাদবধ রচনার সময় মধুসূদনের প্রয়োগ-আদর্শ কি ছিল? আমি যদি প্রকৃত রস উদ্রেক করিতে পারি, তা হইলে বাল্মীকির রামলক্ষ্মণের চরিত্র এদিক-ওদিক হইল, কি রাক্ষসগণের চরিত্র কবিগুরুর হইতে বিপরীত হইয়া গেল, তাহাতে কি আসে যায়? উহারা না হয়—আমারই 'রাম লক্ষ্মণ' এবং 'রাক্ষস'। "রাবণের চরিত্র আমার কল্পনা শক্তিকে আগুনের ন্যায় উদ্দীপ্ত করে, এ একজন জবরদস্ত লোক—Grand fellow! The subjact is heroic; only the monkoys spoil the joke! but I shall look to them" দেখিব আমি, মানুষ আমার রাক্ষসরাজের সঙ্গে বাধ্য হইয়াই

সহানুভূতি করে কি না! ইহাও একটা জবরদস্ত বিদ্রোহের কথা—কিন্তু বাঙ্গালার পাঠকগণকে ত একেবারে কাঁদিয়াই সে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে হইয়াছে!

আমাদের বুঝা উচিত, মধুসূদনের এই জবরদস্তি কিসে খাটিল? মনুষ্য-হৃদয়ের কোন ছিদ্র-পথে কবি আমাদের চিরার্জ্জিত সংস্কারের বিদ্রোহী হইয়াও মেঘনাদকাব্যের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করিলেন? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, রাম লক্ষ্মণের মনুষ্য সহচর ছিল না; কপিসৈন্যে স্ত্রীজাতি ছিল না, সৌধ কিরীটিনী লঙ্কার ঐশ্বর্য্যরাজী ছিল না বলিয়া কবি কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন! অথচ, তাঁহারাই বিজয়ী পক্ষ! কবিকল্পনাকে অবাধে খেলাইয়া পাঠকের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার জন্য কবির দৃষ্টিতে সে দিকে বিশেষ কিছুই ছিল না। একেবারে অসম্ভব ছিল, এমন কথা বলা যায় না; তবে মানিতে হইবে, বাহিক ঐশ্বর্য্যের পূজারি মধুসূদনের পক্ষে—তাঁহার আত্মনিষ্ঠা সহানুভূতি এবং প্রয়োগ-কলার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তিনি একরূপ দুঃসাধ্য সাধনে, অর্থাৎ বিজিতের দিকে পাঠকের সহানুভূতি সাধনে অগ্রসর হইলেন! কিন্তু, কোন্ কৌশলে সিদ্ধিলাভ করিলেন? কবি কোন সূত্রে, মনুষ্যহৃদয়ের কোন ছিদ্রপথে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক এত সহজে অভিভূত করেন, বিজিত এবং বশীভূত করিয়া ফেলেন? তাহার রহস্য আর কুত্রাপি নাই—শিল্পশাস্ত্রের সেই নিতান্ত জানা কথা—করুণরসে সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে কিনা জানি না, যাহার কান্নাতেই আরম্ভ, কান্নাতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাপ্তি—অথচ উহা কোনদিকে মনুষ্যমনের কিছুমাত্র অবসাদকর হয় নাই! করুণ রস স্বয়ং 'আদি' রসেরই একটা গভীরতর পরিণতি—সহানুভূতি এবং প্রীতির উদ্রেকেই উহার প্রধান শক্তি। মধুসূদন উহা যে পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন,

বঙ্গের অপর কোন কবি এ পর্য্যন্ত তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। এই করুণরসে অভিভূত হইয়া তৎকালের কোন সমালোচক বলিয়া উঠেন—"মধুসূদন মিল্টনকেও অতিক্রম করিলেন।" সহৃদয় মধু উহাতেই লিখিয়াছিলেন "মিল্টনকে অতিক্রম! ইহা একেবারে পচা কথা। কেহ কালিদাস বর্জ্জিল অথবা টাসোর সমকক্ষ হইয়াছে বলিলে তবু কিছু অর্থ হয়—কারণ তাঁহারা মানুষ! মিল্টনকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না—কারণ, মিল্টন দেবতা"। যা হোক, এস্থলে কিন্তু করুণ রসেরই বিজয়াশক্তি আমরা টের পাইতেছি! জগতের বড় কবিগণ প্রায় সকলেই আমাদের হৃদয়ের এই করুণ তারে আঘাত করিয়াই চিরস্থায়ী প্রীতিসম্বন্ধ লাভ করিয়াছেন। অন্য ভাব যতই সুন্দর মধুর, অথবা মুগ্ধকর হউক না কেন, হৃদয়কে নাড়া দিবার শক্তিতে কেহই করুণের তুল্য নহে। কবি অপর সহস্রপ্রকারে হৃদয়কে সুখাবিষ্ট শান্ত, তৃপ্ত, নর্ত্তিত বা স্তিমিত করিতে পারেন; দীপ্ত, মত্ত, বিস্মিত অথবা স্তম্ভিত করিতে পারেন, কিন্তু চিত্তের গভীর হইতে গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া উহাকে একেবারে গলাইয়া ফেলার পক্ষে অপর কোন উপায়ই করুণের তুল্য নহে। এ জন্যই কমেডী অপেক্ষা ট্রাজিডীর অধিকতর শক্তি এবং মাহাত্ম্য! আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন জীবনের দুরবস্থার বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা অর্জ্জন করেন, উহাই পরিশেষে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে অমরতা-উপার্জ্জনে সাহায্য করিয়া গিয়াছে।

এই করুণ ভাবটিই তিলোত্তমাসম্ভবের দুর্দ্দান্ত-উদাসী অমিত্র ছন্দকে মোলায়েম করিয়া গিয়াছে। এই মধুসূদন নামক ব্যক্তিটি কেমন বুকের কাছে বুকটি ধরিয়াই কথা বলে! তাহার কোন ফিলজাফী নাই—কিন্তু সাহিত্যে সকল ফিলজাফী যে জন্য, সেই আন্তরিকতা টুকু

যেন লোকটির স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; প্রকৃতিমাতার হস্ত হইতে স্বাভাবিকতার 'পাশ' লইয়াই যেন কবি বঙ্গসাহিত্যে নামিয়াছেন! অন্য মানুষ, অন্য অহঙ্কারী কবি মুখ খুলিতেই তাঁহাদের অহংকার, মুরব্বিপনা এবং মুনশীয়ানাটাই যেন আমাদিগকে পদে পদে আহত করে; কিন্তু এই লোকটি যত অহংকারীই হউক না কেন, তাহার অহংকার যেন বরং প্রীতিকরুণারই উদ্রেক করে! মেঘনাদ বধের রচনারীতির প্রধান মাহাত্ম্য হইতেছে যে, উহা পড়িতে বসিয়া সকলে মনে করে—"ইহা ত আমারই লেখা! আমিও এ রকম লিখিতে পারি।" যদিও, কলম ধরিলেই ভুলটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। মধুসূদনের মধ্যে কোন দার্শনিকতা নাই, কোনরূপ intellectuality মনস্বিতার বাতিক বা তত্ত্ব-বিলাসিতা নাই। কিন্তু, একটু নিবিষ্ট দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে, মধু স্দনের যে তন্ত্রে আঘাত করেন সহস্র মনস্বিতাতেও তাহা পারে না! অপাততঃ সরল কথার মধ্য দিয়াই হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া, উহাকে অধিকার করিয়া, একেবারে বশীভূত করা! এস্থলেই প্রতিভা—একরূপ অজেয় প্রতিভা! অবশ্য, বাঙ্গালীর রসানন্দশীল কবি কৃত্তিবাস এবং কাশীদাসই বাঙ্গালী মধুসূদনকে বাক্য-রীতির এ পথে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা জানি, মিল্টনের ছন্দের মধ্যেও অপরাজেয় প্রাবল্য, উদ্দীপ্তি, ঊর্দ্ধগতি এবং সমুন্নতি আছে, কিন্তু করুণ বাক্যে হৃদয়ের গুপ্তভাবে মধুর ন্যায় স্পর্শ করার শক্তি নাই!

ব্যাপারটাই বা কি! সমগ্র কাব্যটি জুড়িয়া পাত্রগণ অপরিহার্য্য দৈব-দুঃখের মহাপাশে পড়িয়া কেবলই ছটফট এবং হাহুতাশ করিতেছে। রাম লক্ষণের জন্য, সীতা অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিয়া, চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা স্বামীশোকে, রাবণ সর্ব্বস্বনাশী অদৃষ্টের বজ্রপীড়ায় নিষ্পেষিত হইয়া—ক্ষোভে রোষে অথবা নিরাশ্রয় দুঃখেই বিধাতাকে অভিযোগ পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী হাহাকার

তুলিয়াছে! এই কান্নায় কাঁদিয়া আমাদের কি লাভ? কেনই বা উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসাল বলিয়া মনে হয়? উহার মধ্যে যে সংসারবাসী মনুষ্য-আত্মার চিরকালীয় ক্রন্দনের সোদরত্ব এবং সমতা আছে—ঐরূপে মনুষ্য-জীবনের ন্যূনাধিক গুপ্ত অথবা প্রত্যক্ষ সত্যের সংবাদটিই আছে! এই ভবজীবনের অপরিহার্য্য রোগশোক, দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং মৃত্যু-পরাজয়ের মর্ম্মগত প্রতিকৃতি টুকুই আছে! তাই বুঝি, করুণ রসে মনুষ্যের এত সহানুভূতি! কোন-না-কোন মতে চক্ষুর জল ফেলিতে না পারিলে কাব্যপাঠের ফলেই যেন 'পাক' ধরিয়া উঠে না! সুখের অপেক্ষাও বরং দুঃখের কথাতেই যেন মনুষ্য-হৃদয়ে গভীরতর রেখা অঙ্কিত করে! এই আদি-অন্তে অন্ধকারময়ী প্রবাসপুরী, এই মর্ত্ত্যপুরী, এই মৃত্যুপুরী! ইহার অধিবাসী মাত্রেই ত জন্মগত অদৃষ্টে ন্যূনাধিক দুঃখী! পৃথিবী যে মনুষ্যের সকল কামনা পূর্ণ করিতে, তাহাকে কোনদিকেই নির্ম্মল সুখ দান করিতে পারেনা! তাই মনুষ্যের নিহতার্থতা, নিষ্ফলতা এবং পরাজয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ের এতই মমতা—এতই সহোদর স্নেহ!

মধু কাব্যের ক্ষেত্রে করুণরসকে কত মহার্ঘ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট পত্রে তাহার প্রমাণ আছে। "যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে, যে কোমলমধুর এবং করুণ রসে মনুষ্যের হৃদয়কে সমুন্নত (sublime) ভাবলোকে উন্নীত করিতে পারে, সে কবির তরণী কালস্রোতে আপনার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিয়া যায়! পাঠকগণ একযুক্ত হইয়াই সে কবিকে প্রীতি-পূজার অর্ঘ্য দান করে। সংস্কৃতের কালিদাস, লাটিনের ভার্জ্জিল এবং ইটালীয়ের টাসোর দিকে চাহিয়া দেখ! আমার বিশ্বাস, ইংরাজী সাহিত্যে ইহাদের সমকক্ষ একজন কবিও নাই! ইংলণ্ডের মিল্টন মহত্তর জীব! তাঁহার নিজের

শয়তানের মতই মিল্‌টন উচ্চতম ভাবে ভরপুর! কিন্তু 'মধুর' বলিতে যাহা বুঝায়, মিল্‌টনে তাহার লেশমাত্র নাই! মিল্‌টন মনুষ্যের চিত্তকে উচ্চতম ভাব-শিখরে তুলিয়া ধরিতে পারেন; কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে তিনি পারেন না, বলিলেই হয়। উহার ফল কি হইয়াছে? মিল্‌টনের নাম পরম দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে—কিন্তু তাঁহার পাঠক সংখ্যা কত পরিমিত! মিল্‌টন তাঁহার শয়তানের মতই অতুলনীয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয় যে, মিল্‌টন সম্পূর্ণ উন্নত-ক্ষেত্রের জীব; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত সহযোগ নাই! তাহার স্বর্গীয় কণ্ঠ-গীতি আমরা ভয়েবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত দেহে শুনিতে থাকি—যেন গভীর বনের নির্জ্জন গুহা হইতে সিংহের কণ্ঠধ্বনিই কাণে আসিতেছে!"

হাঁ! মিল্‌টনের গম্ভীর কণ্ঠ বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়! সে যে, গভীর অরণ্যের দূরনির্জ্জন কন্দরশায়ী, পুণ্যসত্ব এবং একাকি-চর সিংহের বক্ষঃ-গর্জ্জন! মিল্‌টনের চিত্ত প্রকৃতই "দূরঙ্গমং একচরং অশরীরং গুহাশয়ম"। তাই বুঝি, মিল্‌টনী' ছন্দের অনুপম ধ্বনি-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস ভার্জ্জিল ও টাসোর কোমলমধুর রাগিণী মিলাইয়া, নিজস্ব জীবন ও হৃদয়ের কারুণ্য ধর্ম্মে অতুলনীয় করুণকণ্ঠ আমাদের এই মধুসূদন!

মধুসূদনের শিল্পতা-আদর্শও কি ছিল, মেঘনাদের ভবিষ্যজীবন সম্বন্ধে স্বয়ং কবি কি পরিমাণে নিঃসংশয় ছিলেন, এবং পাঠকগণকেও উহা কোন ভাবে বিচার করিতে তিনি আশা করিতেন, তাহার প্রমাণও সংশয়ী কেশব গাঙ্গুলীর নিকট পত্রে মিলিতেছে—"আমার কাব্য পাঠ করিতে প্রথমতঃ দেখিবে, উহার পরিকল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষার ভাব এবং বস্তুর পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ,

প্রত্যেক বাক্যশ্লোকের গতি এবং উদ্দেশ্য! সমগ্রের শ্রুতিকলেবর দিকে চিন্তাই করিও না—কাল উহার বিধান করিবে। যদি আমি উক্ত সকল দিকেই সাফল্য লাভ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যদি গ্রন্থটিতে প্রকৃত 'কবিত্ব' থাকে, ভাব মধুর এবং বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি উহার ভাষার মধ্যে প্রকৃত সঙ্গীত থাকে, তবে বন্ধুগণকে উহার জন্য চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই! ওই কাব্য ভাসিয়া উঠিবেই—আজ না হয় কাল, না হয় ত্রিশ বৎসর পরে!" সচেতন শিল্পী কবির এই সুদৃঢ়, বিশ্বাস-বলীয়সী ভবিষ্যবাণী ঠিক হইয়াছিল কি না, তাহা আজ ৬০ বৎসর পরে বাঙ্গালী পাঠক বিচার করুক; পরকালের পাঠকও বিচার করিতে থাকুক!

এই সর্ব্বপ্রতীত এবং অগণিত দোষ-সঙ্কুল, দোষ-বলিষ্ঠ এবং দোষ-শ্লিষ্ট মেঘনাদ কাব্য! পাঠক অন্তত বুঝিতে থাকুন যে, ব্যাকরণ-বিশুদ্ধিই কাব্যের জীবন নহে; এবং অলংকার-দুষ্টতাও কাব্যের মৃত্যু-বাণ নহে!

মেঘনাদ বধের অন্য সমালোচনা করিব না। তিলোত্তমা সম্ভবের "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"-জাতীয় সুন্দরী এই কাব্যে আসিয়া প্রমীলা মূর্ত্তিতে বধূধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পরিশেষে প্রেমাস্পদের সহমৃতা হইয়া আমাদিগকে নেত্রজলে ভাসাইয়া গিয়াছে! প্রমীলা পরম ঐশ্বর্য্যমহিমাময়ী নারী চরিত্র, অথবা ঐরূপ নারীত্বের রেখা-চিত্র—স্বভাবেই নরত্বের ক্ষেত্রে রাণীচরিত্র। একদিকে ঐশ্বর্য্য এবং বীর্য্যের দীপ্তিধর্ম্মে, অন্যদিকে ললনাসুলভ কোমলতা, পতি-প্রেম, প্রেম-দাসিত্ব এবং প্রেমপ্রাণতার প্রসাদগুণে উহা পরম উজ্জ্বল-মধুর চরিত্র! কালিদাসের 'ভীমকান্ত' আদর্শের মাহাত্ম্য সম্যক্ বুঝিয়াই মধুসূদন শচী এবং প্রমীলা চরিত্র ধারণা করেন! একদিকে উষারাণীর উৎসাহ দীপ্তি,অন্যদিকে অস্তমিত নিদাঘ-সূর্য্যের সহগমনোন্মুখী

সন্ধ্যা-তপস্বিনীর শান্তকোমল এবং উপরতিময় ললাটের সিন্দূররাগ সংমিশ্রিত করিয়াই কবিশিল্পী যেন প্রমিলাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন! প্রমীলা কদাপি প্রাকৃতজন-রম্যা অথবা প্রাকৃতজন-কাম্যা রমণী নহেন, সাধারণ নরপ্রকৃতি উঁহাকে কেবল দূর হইতে প্রণামপূর্ব্বক 'দেবী' সম্বোধন করিবার জন্যই যোগ্যতা রাখে. মেঘনাদের ন্যায় পুরুষেই কেবল স্বভাব-স্বত্বে উঁহাকে 'প্রিয়া' সম্বোধন করিতে পারে।

এ স্থলে একটা অপরূপ রহস্যও আছে! খ্রীষ্টান কবি কেমন করিয়া এই সহমরণের মাহাত্ম্যগান করিলেন। যে সহমরণ রাজবিধিতেই গর্হিত হইয়া গিয়াছে, যাহার কথা শুনিবামাত্র নাসিকাটী কুঞ্চিত করা আধুনিক তন্ত্রের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা শিষ্টাচার রূপেই দাড়াইয়া গিয়াছে। আসল কথা, সহমরণের যাহারা সহায়তা করে, যাহারা ঐ দৃশ্য দেখিতে ও যাইতে পারে, তাহারা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তি; তাহারা নির্দ্দয়—অসাধারণ বিশ্বাসনিষ্ঠ প্রেমের অপার্থিব, ভীষণ আত্মোৎসর্গে হয়ত কেবল দৃষ্টিকুতূহলী নির্ম্মম ব্যক্তি! এরূপ নির্দ্দয়তার জন্যেই সমাজের শাস্তিভোগ করা উচিত। কিন্তু, যত সমস্ত বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও, যদি কেহ আপনাআপনি সহমরণে গিয়া বসে, তা হইলে সমাজ যেন হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়ায়—সহমৃতব্যক্তির শ্মশানভস্মগুলিই যেন হুড়াহুড়ি করিয়া লুঠিতে আরম্ভ করে! গাথায় কাব্যে, ইতিহাসে সহমৃতব্যক্তির মাহাত্ম্যগানের যেন আর সীমা থাকে না! সেক্সপীয়র ত রোমিও-জুলিয়েতের সহমরণ লইয়া একটা মহানাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন! আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু প্রেমের তরফে আত্মহত্যাটাই গৌরবের জিনিষ হইয়া যায়! যাহারা দেশের বা সমাজের উপকারার্থ যুদ্ধ করিতে যায় এবং যুদ্ধে প্রাণদান করে, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমের বশেই আত্মহত্যা করে না কি?

মনুষ্যের সাহিত্যে উহার কত স্তুতিবাদ, কত সুখ্যাতি! অথচ, ভারতবর্ষে যে মানুষ প্রেমের আদর্শে, দাম্পত্যবন্ধনকে জীবনমরণাতিশায়ী মহাসম্বন্ধ বলিয়া বিশ্বাসে মরিতে পারিত, তাহা বিদ্বেষী ইয়োরোপের মুখে বর্ব্বরতার লক্ষণ বলিয়াই নিন্দালাভ করিতেছে! কবি মধুসূদন বাহ্যতঃ খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও, তাহার হৃদয় যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের সঙ্গে সহানুভূতি-সূত্রেই যুক্ত ছিল, প্রমীলার সহমরণ গানের ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ আছে।

৭

মেঘনাদ রচনার সমকালে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন "আমি একটা খণ্ডকাব্য রচনা করিতেছি। "It is all about poor Radha and her বিরহ।" আরও লিখিয়াছিলেন, "আশ্বস্ত হও বন্ধু, আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী চাপাইতে যাইতেছি না।" "ইটালীর মিশ্র-ছন্দকে বাঙ্গালায় আনা যায় না কি?" মধুসূদনের ন্যায় ছন্দ প্রতিভাশালী কবির পক্ষে অসম্ভব কি? বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পর ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনই সচেতন ভাবে চলিতেছিলেন। ধ্বনির জ্ঞান এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতা না থাকিলে এক ভাষার ছন্দকে অন্যভাষায় অবতারিত করা একেবারেই অসম্ভব। মধুসূদন বাঙ্গালার মূল ছন্দদ্বয়কে, বঙ্গভাষার পয়ার ও লাচারীকে সংমিশ্রিত করিয়া ব্রজাঙ্গনাকাব্যের ছন্দগুলির সৃষ্টি করিলেন। এজন্য উহার প্রত্যেক কবিতাই নব নব মিশ্র ছন্দে উল্লসিত হইতেছে।

ব্রজাঙ্গনার স্বতন্ত্র কবিতাগুলির কাঠাম (form) এবং শিল্প-প্রযুক্তি (technique) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক 'ওড' হইতে অভিন্ন! কোন একটা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ, সম্বোধন বা উচ্ছ্বাস, নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন ছন্দে (vers Libers) উচ্ছ্বাসই ওডের

বিশেষত্ব। বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যে ‘ওড’ এখন নানামুখী গতি এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার ‘রাধা-উক্তি’ রূপে ‘ওড’কে অবতারিত করিলেন! পরে হেমচন্দ্র উহাকে বিস্তার দান পূর্ব্বক কবিতাবলীর ‘পিণ্ডারিক ওড’গুলির মধ্যে উক্ত সূত্রকেই প্রকৃত শিল্প-আদর্শে অনুসরণ করিয়াছেন।

মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণকুমারী একরূপ এক সঙ্গেই কবির সৃষ্টিশালায় মূর্ত্তিলাভ করিতেছিল। “কি মনে কর? ছয় মাসের মধ্যেই একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি কবিতা গ্রন্থ এবং একটি মহাকাব্যের আধাআধি! আর কিছু না হোক, আমাকে অন্তত একটি পরিশ্রমী জানোয়ার বলিয়াই প্রশংসা করিও। বঙ্গসাহিত্যে একেবারে একটি বৃহৎ ধূম্রকেতুর মতই উদিত হইয়া গেলাম!”

এ স্থলেও সব্যসাচীর দৃষ্টান্ত! মেঘনাদের পাঞ্চজন্য এবং ব্রজাঙ্গনার বংশী যুগপৎ বাজাইয়াছেন বঙ্গসাহিত্যের এই মধুসূদন! ভাবের দিকেও ব্রজাঙ্গনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিদ্রোহ আছে! “Poor Radha!” মধুসূদনের রাধা পুরাপুরি বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকা নহেন, তিনি মানবী। মানবীর বিরহোন্মাদ বর্ণন করাই কবির লক্ষ্য; বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধিকাকে গুরুর ভাবে, প্রেমধর্ম্মের আরাধ্যা-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সে লক্ষণটিও ব্রজাঙ্গনায় নাই। রাধিকার মধ্যে চিরকালের ‘বিরহিনী রমণী’কে দেখিতেই কবি মধুসূদন বদ্ধ পরিকর! প্রকৃতির সঙ্গে এ রমণীর অপরিসীম সহানুভূতি—বিশ্বসংসারকে আপন বিরহের দিব্যোন্মাদময়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করাই ‘ব্রজাঙ্গনা’র বিশেষত্ব! এদিক হইতে ব্রজাঙ্গনা বঙ্গসাহিত্যে ইয়োরোপীয় ‘প্রেম’ আদর্শের প্রথম গীতিকাব্য (Love-lyric)। বৈষ্ণবকবিগণ রাধিকা-তত্ত্বে যেরূপ নানাদিক হইতে দৃষ্টি করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি—ইহাতে তাহা নাই; কেবল 'বিরহ'। অবশ্য, মধুসূদন 'বিহার' নামে অপর একটি সর্গ রচনা করিবেন বলিয়াও স্থির করেন; কিন্তু উহা সমাধা করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ-তত্ত্বের দিকে ভগবদ্ভাবে দৃষ্টি রাখার দরুণ বৈষ্ণব কবিগণের 'রাধা'র মধ্যে সময় সময় যেই সুগভীর আন্তরিকতার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাও মধুসূদনের মধ্যে কদাচিৎ মিলিবে! কিন্তু, এই গীতিকাব্যে মধুসূদনের সুগভীর নাটকীয় শক্তির পরিচয় আছে! মধুসূদন সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ-প্রণয়িণী রাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতেই বিশ্ব-প্রকৃতিকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেঘনাদ রচনা করিয়া মধু-সূদন উক্ত প্রণালীর রচনার দিকে যেন একটু উপরতি অনুভব করিলেন—তিনি'বীর'-আদর্শের রচনাক্ষেত্রে নিজের চূড়ান্ত করিলেন বলিয়াই ধারণা হইল। এ বিষয়ে তাঁহার একটি পত্র—"কিন্তু, হয়ত মেঘনাদের পর 'বীর' আদর্শের কবিতাকে বিদায় করিতে হইল। এ ক্ষেত্রে নূতন উদ্যম মাত্রেই আমার পক্ষে পুনরুক্তি ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কিছুই হইবে না! তবে, আমার সম্মুখে রোমাণ্টিক এবং গীতি কবিতার সুবিস্তারিত ক্ষেত্রই দেখিতেছি! গীতি কবিতার দিকে আমার একটা ঝোঁকই বুঝিতেছি।" এ সূত্রেই ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টি। তাঁহার রাধা প্রমীলারই সহোদরা—মানবী। বীরাঙ্গনা কাব্য কিঞ্চিৎ পরে (১৮৬২) রচিত হইলেও, ব্রজাঙ্গনা কবির 'বীরাঙ্গনা'গনেরও সহোদরা, এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান শক্তি ও নাটকত্ব!

সুতরাং, প্রসঙ্গ সূত্রে বীরাঙ্গনার রীতি-বিষয়ও চিন্তায় না আসিয়া পারে না। মধুসূদন যখন যে নারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তদ্-ভাবেই ভাবুক হইয়া, এবং একরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়াই উহা সম্পাদন করেন। বীরাঙ্গনাতেও কবি ভিন্নভিন্ন রমনীচরিত্রে সুতীক্ষ্ণ

সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দের সমাধান বিষয়েও বীরাঙ্গনা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে! প্রবল অহমিকা-তত্ত্ব এবং নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উল্লাসিনী রমণী বলিয়াই উহাদের 'বীরাঙ্গনা' নাম সার্থক হইয়াছে! অবশ্য, বলিতে হয় যে, ওভীদের Heroic Epistles এবং পোপের Epistles এর পথেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নামতত্ত্ব এবং প্রকাশের প্রণালী লাভ করেন। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে তিনি উহাকে সম্পূর্ণ অভিনবরূপে এবং মৌলিক ভাবেই সমাধা করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্য সমাজের যে অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ংবরা' হইতে জানিতেন, সমাজের যে গৌরবময় অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ং তন্ত্র' পরিচালন করার উপযোগী শিক্ষা এবং বিশ্বস্ততা উপার্জ্জন করিতেন, মধুসূদন তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন! এখন সমাজ হইতে রমণীর স্বয়ংশক্তি এবং বীরাঙ্গনা-তত্ত্ব লাভ করিবার যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে? অবস্থা গতিকে যেমন স্ত্রীজাতির তেমন পুরুষ জাতির স্বয়ং-কর্ম্ম এবং স্বাতন্ত্র্যতত্ত্বকেও নানাদিকে সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করা সমাজ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় অধীনতার এবং বিপরীত-ধর্ম্মী রাজশক্তির আধিপত্য-গতিকে সমাজের শক্তি-হ্রাস এবং অধঃপতন হইতেই এ অবস্থা এবং নির্দ্ধারণা সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ এখন কেবল নিজের সমস্ত 'আটঘাট' এবং সদর ও অন্দর দরজা বন্ধ পূর্ব্বক দুর্দ্দিনের মহানিশা যাপন করিতেই যেন নিরত আছে! 'বীরাচারী' রমণীগণের লুপ্ত স্মৃতি সচেতন করিয়া, তৎসঙ্গে সহানুভূতির পথে সমাজের বিলুপ্ত গৌরবের স্মৃতিবুদ্ধি পরিস্ফুট করাই হয়ত একদিকে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল! সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে উহাও হয়ত একটা গুপ্ত বিদ্রোহ!

যাহোক, কবি এ ক্ষেত্রে অপরূপ ভাবেই সাফল্য সিদ্ধি করিয়াছেন! যে দিকেই হউক, এ সমস্ত বীরাঙ্গনার সঙ্গে সহানুভূতি না করিয়া মানুষ পারে না।

এস্থলে আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 'প্রেম'-কবিতার আদর্শও প্রথম আমদানী করিয়াছে; এবং ব্রজাঙ্গনা অন্তত একদিকে পরকালের নানামুখী 'প্রেম'-কবিতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আরও বুঝিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যগন্ধ সত্ত্বেও ব্রজাঙ্গনাকাব্য অন্যদিকে ভারতীয় আদর্শের—বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা! ফলতঃ, এরূপ বৈষ্ণবগুণ সত্ত্বেও উহা পাশ্চাত্যভাবের সংমিশ্রতা সংঘটন করিয়াই পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যে হয়ত একটা দোষের ও অতর্কিত জন্মদাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এই অবস্থান এবং স্বরূপ লক্ষণ প্রত্যেক সাহিত্যরসিককে নিবিষ্ট ভাবেই বুঝিতে হয়।

যেমন বলিয়াছি, ব্রজাঙ্গনা নিতান্তঃ বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা। বৈষ্ণব আদর্শে স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই 'রাধা'ই এবং রাধিকা-ভাবের সাধক। বিশ্বের চরম 'সচ্চিদানন্দ'-তত্ত্বকে 'শ্যামসুন্দর'রূপে পরিকল্পনা পূর্ব্বক, উহাকেই স্বামী এবং প্রাণ-নাথ এবং পরমার্থরূপে বৈষ্ণব স্ত্রীপুরুষগণ সাধনা করেন; বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রাচীন সহজিয়াগণের সমস্তে এরূপ 'প্রেম' সাধনাই সমধিক উজ্জ্বল। সুতরাং, বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে যাহাই গান করুণ না কেন, তাঁহাদের বাক্য অধ্যাত্মভাব গন্ধ ছাড়াইয়া গিয়া যতই জড়তাগন্ধী অথবা কামগন্ধী হউক না কেন, সমস্তকে চূড়ান্তের সেই 'রাঙ্গাচরণে নৈবেদ্য' রূপে গ্রহণ করিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতামাত্রের এই 'নৈবেদ্য' লক্ষণ না বুঝিলে আমরা 'বৈষ্ণব আদর্শ' কিছুই বুঝিলাম না।

এখন, মধুসূদন খৃষ্টানকবি হইলেও, এবং তাঁহার কবিতায় বৈষ্ণবী অধ্যাত্মতা সবিশেষ উজ্জ্বল না হইলেও, ব্রজাঙ্গনাকাব্যের অকপট রাধা-'মুখোশ' এবং কৃষ্ণকামিনী রাধিকার সমস্ত ভাব-বিলাস এবং প্রেমোন্মাদ যে বৈষ্ণব লক্ষণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনামুখী কবিতা তাঁহার বাঙ্গালিত্ব, এবং বাঙ্গালিত্বের মধ্যেও আবার বঙ্গীয় বৈষ্ণবী প্রকৃতির প্রভাব এবং শিষ্যতাই প্রমাণিত করিতেছে! প্রেমের বুলি ধরিতেই 'ইয়োরোপীয় প্রেম'তন্ত্রী খৃষ্টান কবির পক্ষেও যে 'রাধা'-প্রকৃতির বশ্যতা অপরিহার্য্য হইয়াছে—এস্থলেই বঙ্গে বৈষ্ণব আদর্শ-প্রাবল্যের প্রমাণ এবং কবির 'বাঙ্গালী বৈষ্ণব'ত্বের লক্ষণ। সেইরূপে, রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী—কবি স্বয়ং উহাকে যতই 'সস্তা' মনে করুণ না কেন—একটা অসামান্য বাঙ্গালী গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবতন্ত্রীয় কাব্যগ্রন্থ! বুঝিতে হইবে, মুখ্য ভাবে পাশ্চাত্যশিষ্যতা এবং 'ব্রহ্মপন্থিতা'র মধ্যেও বাঙ্গালীবৈষ্ণব-তন্ত্রের ওই রাধা-মুখোশ এবং রাধারীতি প্রবল এবং উজ্জ্বল না হইয়া পারে নাই! উহার পর, রবীন্দ্র নাথের ব্রহ্মমুখী কবিতা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতে, বলিতে গেলে বাঙ্গালীর ব্রহ্মসঙ্গীত গুলিতেই, আত্মনিবেদনের বৈষ্ণবী ধারা, কীর্ত্তনী রীতি এবং রাধামুখিতাই উজ্জ্বল হইয়াছে! সুতরাং উহাদের রাধা-মুখোশ বা স্ত্রী-মুখিতাও যে সঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়! এস্থলে আরও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মপন্থী রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিও 'রাধা'রীতি-অবলম্বনেই উহার 'অঞ্জলিত্ব' এবং প্রধান ভাব-তত্ত্ব টুকু সিদ্ধি করিয়াছে; উহা বৈষ্ণবীয় 'মধুর' রস অবলম্বনেই ইয়োরোপের খৃষ্টানগণের সমক্ষে—ভগবানের প্রতি 'পিতৃ'-ভাব সাধক খৃষ্টানগণের সমক্ষে—অপরিচিত ভাবপন্থার কবোষ্ণমধুর এবং রহস্যমধুর (mystic) কবিতারূপেই অতুলনীয় শক্তিসিদ্ধি করিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে

এরূপ 'সুদূরতা' এবং 'অস্পষ্ট মধুরতা'র মধ্যেই উহার প্রধান শক্তি।

কিন্তু, দেখিতে হয় যে, এ সমস্ত সংসারভাবের 'প্রেম' কবিতা নহে; এবং এই রাধা-রীতির 'মধুরতা'ই যেমন বাঙ্গালী প্রেমকবিতার প্রধান শক্তিস্থান, তেমন উহার পতনস্থান এবং দৌর্ব্বল্যস্থানও এ স্থলেই আছে! আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরুষকবিগণের অধিকাংশ 'প্রেম' কবিতা এরূপ পতনস্থানই প্রমাণিত করিতেছে! পুরুষকবিগণও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাধা-মুখোশ ছাড়িতে জানিতেছেন না, এবং বৈষ্ণবত্বের বাহিরে উহা যে কি অনর্থময়, বেরসিক পদার্থ তাহাও বুঝিতেছেন না। ঐ সমস্ত যেমন বৈষ্ণব কবিতা হইতেছে না, তেমন প্রেমের কবিতাও হইতেছে না, হইতেছে কেবল অ-প্রেমের কবিতা—অবৈষ্ণব বা ভাক্ত-বৈষ্ণব কবিতা!

যেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব নাই, নৈবেদ্য লক্ষণ নাই, কেবল সংসার ভাবের প্রেম কবিতা—পরিষ্কার স্ত্রীপুরুষের মিলন বিরহ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ আকুলতা এবং অভিসারের কবিতা, সেখানে রাধা-মুখশ এবং রাধারীতি! আমাদের পুরুষ 'প্রেমিক'গণের মুখেও রাধারীতি! আমরা পূর্ব্বতন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, 'আমরা প্রেম জানি না'। আমাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেহকেহ তর্ক এবং আপত্তি জানাইয়াছেন। এস্থলে আমাদের দৃষ্টিস্থান হইতে কথাটাকে বুঝিয়া লউন! পুরুষের মুখে স্ত্রী-মুখশ পরা', স্ত্রীভঙ্গিমার কবিতা! উহা ত 'প্রেম' প্রকাশের সহজ রীতি নহে—সত্য প্রেম প্রকাশের পদ্ধতিও ও নহে! উহা কি করিয়া আমাদের আধুনিক প্রেমকবিতায় এত প্রবল এবং উজ্জ্বল হইল! আরও দেখিয়া লউন, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার রাধা-মুখশের মধ্যেই আমাদের 'প্রেম' কবিতার প্রথমপতনের ওই আদিম সূত্রটি!

যদিও মধুসূদনকে আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং অপরাধের জন্য দাঁয়ী করা যায় না! স্বয়ং বৈষ্ণবী রীতির মধ্যেই হয়ত বি-চেতন ব্যক্তির জন্য এ সঙ্কটস্থান গুপ্ত আছে।

অবৈষ্ণব বা 'ভাক্ত-বৈষ্ণব' কবিতা কাহাকে বলিব? যেখানে রাধার ভূমিকা মাত্র আছে, মেয়েলী ঠাঁট এবং 'ভরং' টুকু আছে, স্ত্রৈণ আকার ইঙ্গিত, চেষ্টিত এবং ভঙ্গিমা আছে, মেয়েলী হাবভাব চোর-কটাক্ষ চাপারীতি এবং আঁচলের বাতাস আছে, পরকীয়া খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা অথবা অভিসারিকার আলোক-ভয়াতুর আকুলিবিকুলি এবং কথা-বার্ত্তার প্রণালী আছে, গুপ্তপ্রেমের দিবাভীত আকুলিবিকুলির অবলম্বন যাতিযুথি-মল্লিকা-কোকিলা-ভোমরা মলয়া এবং জ্যোছনা আছে—অথচ কৃষ্ণ নাই! কৃষ্ণের পদে কবি স্বয়ং। একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলেই স্পষ্ট হইবে, কৃষ্ণের পদে আর কেহ নহে, স্বয়ং কবি। এ স্থলে পাঠক আর একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতেই দেখিবেন, আর্টের ক্ষেত্রে—কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রেই উহা কত বড় অনাচার! সাংসারিক প্রেমনীতির ক্ষেত্রে যেমন কবির আত্মপক্ষে, তেমন পাঠকের দিকেও কত বড় পাপাচার।

পুরুষ কবিগণ স্ত্রীমুখে আপনার মন হইতে একটা স্ত্রী খাড়া করিয়া—আপনাকেই 'ভালবাসিতেছে'। আপনার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য কবিত্ব অথবা গুণিত্বকে পূজা করিতেছে! আত্মবিলাসে, অহমিকা-বিলাসেই রত হইয়াছে—এবং পাঠককে সহপথিক করিতেছে। আমাদের এরূপ 'প্রেম-কবিতায়' একটি স্ত্রীলোকই বক্তা, উহা স্ত্রীকর্ত্তৃক পুরুষ পূজা! স্ত্রীলোকটি পুরুষটাকে কতমতে কাকুতিমিনতি স্তুতি-আরতি আলিঙ্গন এবং বন্দন করিতেছে, কেবলি বলিতেছে "ওগো প্রিয়তম আমি তোমাকে যে ভাল বেসেছি,আমার সেই অপরাধ "কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা",বলিতেছে "তুমি আমারি গো তুমি আমারি",

পায়ে লোটাইয়া কাঁদিয়াকাঁদিয়া বলিতেছে"লহ লহ মোরে"; কিন্তু পুরুষটি নিশ্চল-নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত শান্ত ভাবে বসিয়া! ওই পূজা গ্রহণ করিতেছে! ভুলেও কদাপি মুখে আনিতেছে না "আমি তোমারি"! পুরুষটির মধ্যে কোন প্রকার আত্মবিতরণ, আত্মনিবেদন অথবা প্রেমে আত্মবিস্মৃতির লেশগন্ধও নাই! মনুষ্যত্বের সাধনক্ষেত্রে যৌন-প্রেমের প্রধান মাহাত্ম্য কোথায়?—মানুষকে স্বার্থবিস্মৃতির এবং আত্মোৎসর্গের পথে উন্নয়নে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেম-উপাখ্যান অথবা কবিগণের আত্মপ্রেম কাকলীরই বা সাফল্য কোথায়? মানুষ কেন ব্যক্তি বিশেষের পিরীতি-কচকচি শ্রবণ করিবে? জীবনতন্ত্রে কোন্ নৈতিক সূত্রে উহার সার্থকতা? উহার প্রধান সার্থকতা কি এই নহে যে—সৌন্দর্য্যের এবং আনন্দের পথেই উহা, মনুষ্যকর্তৃক স্বার্থশৃঙ্খল-চ্ছেদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, হৃদয়কে মহত্তম আত্ম-ধর্ম্মে উন্নীত করে? হৃদয়কে উচ্চতম স্বাধীনতার শিখরে, দিব্যভাবে উপনীত করে? প্রত্যেকের সহভীয় পথেই অন্তত্তম লোকে উদ্গতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন-সাধনার সাহায্য করে? সে সম্ভাব্যতার লেশগন্ধও যে আমাদের 'প্রেম' কবিতায় নাই!

রিনেশাঁসের (Renaiseance) পর হইতে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কবিগণের ব্যক্তিত্বগন্ধী এবং আত্মসম্পর্ক-গন্ধী প্রেমকবিতার প্রচলন হইয়াছে। পিত্রার্ক ও দান্তে উহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কামবৃত্তির দৈবীকরণ! (deification of Love) আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কবিগুরু দান্তে তাঁহার 'ভাইটা নোভা' ও 'ডিভাইন কমেডী'তে সংসারভাবের 'প্রেম'কেই আধ্যাত্মিক দেবত্ব ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রদান পূর্ব্বক উহার লোকালোক-বিজয়ী মহিমাসঙ্গীত গান করিয়াছেন! তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পথে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য কবিগণের অহমিকা-মুখর প্রেম সঙ্গীতে ভরপুর! মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যও—অবশ্য স্বাধীন পথেই—

কালিদাস ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির ভিতর দিয়া "ভগবান্" কুসুমায়ুধের স্তুতি-প্রণতি এবং আরতিতে মুখর হইয়াছে! তাঁহাদের সমসূত্রে, বঙ্গের সহজিয়া ও বৈষ্ণব কবিগণের চিত্তমন্দিরে 'পিরীতি'-দেবতা 'ভুক্তিমুক্তি'-প্রদাতার আসন লাভপূর্ব্বক উপাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কবিগণ সময় সময় ভাবের বশে রাধাকৃষ্ণের 'মুখশ' ফেলিয়া দিয়া, অকপট অহমিকাতেই গান ধরিয়াছেন। চণ্ডীদাসের "শুন রজকিনি রামি" উহারই দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রীতি-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এরূপ 'অহমিকা'-রীতি এখন আর বাধিতেছে না; উহা কোনদিকে অশিষ্টতা বলিয়াও ধারণা জন্মাইতেছে না—এই অহমিকা সাহিত্যে শিষ্টাচারসম্মত হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। মানুষ এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রেও চাহিতেছে—সরলতা। পাপই হউক আর পুণ্যই হোক, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশিনী সরলতা টুকুন একটা পরম 'রস'রূপেই সাধুবাদের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

এরূপ সহজপথে, অহমিকা পথেই কবিগণ প্রেমের গান ধরুন, উহা অন্ততঃ শিল্পতার ক্ষেত্রে ব্যভিচারী হয় না। কিন্তু, পুরুষের মুখেই এরূপ স্ত্রীমুখ্য রীতি, বিশেষতঃ স্ত্রী কর্ত্তৃক পুরুষ-পূজার কবিতা! উহাকে 'ভাক্ত বৈষ্ণব' ব্যতীত আর কি বলিব? যদি বলি, উহা প্রেম নহে—আত্মবিলাস—সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের অহমিকা-বিলাস—সাহিত্য রসিকের অথবা 'রস'-পিপাসিতের পক্ষে ভয়ানক কুসঙ্গী, তাহইলে কি বলিবার আছে? জীবনের নৈতিক ক্ষেত্রে এই অনৃতভাব এবং অনৃজু রীতি ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিব না; ঐরূপ বিচার করিবার জন্য অন্ততঃ শিল্পসমালোচকের কোন ক্ষমতা নাই বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বই হইতেছে স্বরূপ কথন। কিন্তু, উহা ত নিদারুণ সত্য! এই অপূর্ব্ব-অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ধারা আমাদের সাহিত্যে

বৈষ্ণবরীতি হইতেই অতর্কিতে প্রবল হইয়াছে। এ সমস্ত স্ত্রী-মুখী কবিতার 'আমি'টুকু যে রাধিকা নহেন, অথবা কবিও যে রাধাকেই গুরু-স্থানীয় করিয়া কিংবা তাঁহার মুখেই ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করিতে-ছেন না, তাহা কবিতাগুলিন হৃদয় দিয়া পাঠ করিলেই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে সহৃদয়তাই প্রমাণ। কবিগণ যেন আপনাদের অহংতত্ত্ব হইতেই একটী 'নারী' বহির্ভাবিত করিয়া উহার পূজালাভ পূর্ব্বক পারতোষ উপার্জ্জন করিতেছেন! শিল্পীর দিক হইতে উহাই নিদারুণ সত্য। পুরুষকবিগণের পক্ষে তাঁহাদের আমিত্ব-বিলোপী অথবা আত্মদানী কোনরূপ ভাবক্রিয়া,হৃদয়গতি এবং রসানুভূতির একেবারে অসদ্ভাব! উহা তেইবর্ত্তমান যুগধর্ম্ম এবং যুগলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক এরূপে, 'স্রোতের শিউলী'হইয়াই চলিয়াছি! ভারতীয় সমাজের মধ্যে উপার্জ্জনধর্ম্মী হইবার জন্য 'প্রেমের' পক্ষে তত অবকাশ নাই, 'প্রেম পূর্ব্বক পরিণয়'-প্রথা এ সমাজে প্রচলিত নহে। ভারতীয় দাম্পত্য-ধর্ম্মে প্রেম একটা পরিণয়-পরবর্ত্তী সাধনা, এ কারণেই হয়ত ঈদৃশ অস্বাভাবিকতা কোনকোন দিকে সম্ভবপর হইয়াছে। ফলে, আমাদের পুরুষকবিগণের এ সমস্ত প্রেমকবিতা ইয়োরোপীয় প্রেম কবিতার ন্যায় প্রকাশ্যভাবে উপার্জ্জনধর্ম্মী নহে, আবার স্ত্রীমুখী এবং পরস্বমুখী বলিয়া উহার মধ্যে সহজ কামগন্ধও অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে না। আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে কামগন্ধী কবিতাকে নিন্দা করি না, উহা স্বাভাবিক—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্"; এবং স্বভাবের বর্ণনা করাও কাব্যশিল্পের আমল বহির্ভূত নহে। কিন্তু, আমাদের প্রেমকবিতায় সরল 'উপার্জ্জনধর্ম্ম'ও নাই, স্বাভাবিক কামগন্ধও নাই—উহা যেন কেবল মেয়েমুখো ভাবুকতা, অনৃত ভাবোন্মত্ততা, পরের মুখশ পরিয়া আত্মপূজা! একটা পরম ভণ্ডতাগ্রস্ত এবং শিল্পতাবিদ্রোহী ও রস-বিদ্রোহী গ্লানিকর

পদার্থ! জগতের অন্য কোন সাহিত্যে ইহার জুড়ি আছে কি না, জানিনা। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে সহজতা এবং ঋজুতাই প্রধান শক্তি। হেমনবীনের কয়েকটি সরল প্রেমকবিতা এবং নিধুবাবুর হৃদয়োচ্ছ্বাসময় প্রেমসঙ্গীতগুলি বাদ দিলে, প্রথম নারী-পরিচয়-জাগ্রত রবীন্দ্রনাথের কড়ি-ও-কোমল এবং মানসীর কয়েকটি মনোরম পুরুষমুখ্য কবিতা বাদ দিলে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে মুক্তকণ্ঠ এবং ঋজুপ্রকৃতির প্রেম দৃষ্টান্ত নির্দ্দয়ভাবেই দুর্ল্লভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহাই হইল বর্ত্তমানের প্রেমকবিতার 'আর্ট'!

এই আমিত্ববাদের কবিতা প্রসঙ্গে মধুসূদনের শেষ সাহিত্য-কার্য্যের ধারাও বুঝিয়া লওয়াই আবশ্যক। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী তাঁহার ইয়োরোপ প্রবাসের সময়ে, ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ অব্দের মধ্যেই রচিত হয়। সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা (রিনেশাঁস) নব যুগের ইটালীর সৃষ্টি—ইয়োরোপের সকল সাহিত্য ইটালী হইতে এই অভিনব সাহিত্যশিল্পের কায়া-প্রাণের নমুনা শিক্ষা করিয়াছে। উহা হইতে আধুনিক 'গীতি-কবিতা' ও নিজের শতসহস্রমুখী অহমিকা-তত্ত্বকে লাভ করিয়াছে; এবং ছন্দের নির্দ্ধারিত শৃঙ্খলা-বন্ধন ছেদপূর্ব্বক অগণিত উপস্থিত ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শেক্সপীয়র মিলটন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সনেট ইংরাজী খণ্ডকাব্য-সাহিত্যের একটা প্রধান সিদ্ধি। মধুসূদন সনেটকেও বঙ্গসাহিত্যে অবতারিত করিলেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, মধুসূদনের সমকক্ষ কবি বঙ্গসাহিত্য এখনও উৎপত্তি করিতে পারে নাই। সনেটের মধ্যে একটা চিত্তসংযম আছে, ভাব-তত্ত্বে এবং ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে নিপুণ অধিকারের প্রয়োজন আছে, যে কারণে সনেট রচনায় প্রতিপত্তি লাভ করা সুলভ নহে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বোক্ত কবিগণ সনেটের মুখেই আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদের

অধ্যাত্মমূর্ত্তির পরিচয় লাভ করিতে হইলে সনেট গুলির মধ্যেই অনু-সন্ধান করিতে হয়। মিল্‌টনের "Soul animating strains though few" সাহিত্য-সেবিগণের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। মধু-সূদনকে জানিতে হইলে—কবি মধুসূদনটি কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত এবং প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলেও—চতুর্দ্দশপদী কবিতাই খুঁজিতে হইবে। সাহিত্যিক মধুসূদনের বাক্‌শক্তি এবং বাক্‌সংযম, চিত্তশক্তি এবং চিত্তসংযম কি পরিমাণে ছিল, তিনি বিশ্বসংসারের কতদূর আপনার অস্মিতার অধিকারে আনিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাইতে চাইলেও সনেট গুলিই অন্বেষণ করুন। একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া উপায় থাকিবে না। এ সমস্ত কেন আমাদের বিদ্যালয়াদিতে পঠিত হয় না, বুঝিনা; আমরা যে উহাদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই—তাহাতেই প্রমাণিত হয়। এ লোকটির হৃদয় কতদূর সুপ্রসন্ন এবং প্রসারিত ছিল। কোনগুণে এ ব্যক্তি নব্যবঙ্গসাহিত্যের জনক হইতে পারিয়াছিল! আমাদিগকেও আত্মপ্রসার লাভ করিতে হইলে কিরূপে তাঁহার শিষ্যত্ব-পথেই চলিতে হইবে! কোন্ গুণে এ লোকটি যেমন আমাদের দেশের, তেমন ইয়ুরোপের অন্তরাত্মাটিকেও পুঁথির ন্যায় পড়িয়া লইয়াছিল; নিজের মধ্যে একেবারে পরিপাক করিয়াই নূতন রূপে আবার বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিল!

মধুসূদনের গ্রাস করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, পরিপাকের এবং প্রকাশের শক্তিও তেমনই অসাধারণ। তবে, মধুসূদন যে বঙ্গভাষায়, খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি-অনুরূপ সমর্থ-শিল্পী অথবা সূক্ষ্মশিল্পী হইতে পারেন নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহার অল্প বয়সের ইংরাজী কবিতাগুলির মধ্যেই স্থানে স্থানে যে সূক্ষ্মতার এবং

গভীরতার আভাস পাই, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনাতেও আমরা সকল সময় উহার সমকক্ষতা অথবা পরিণতি খুঁজিয়া পাই না। উহার কারণ কোথায়? ইংরাজী ভাষার মহত্তর শক্তি, এবং শ্রেষ্ঠতর ঐশ্বর্য্য। মধুসূদন সুলভ শিক্ষা-পথেই ইংরাজীতে সেক্সপীয়র-মিলটন এবং বায়রণ-ওয়ার্ডসোয়ার্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু, বঙ্গভাষায় ক্রিয়াযোগী তাবৎ শক্তিই মধুসূদনকে স্বয়ং অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। বঙ্গভাষার অন্তরাত্মাটি চিনিয়া লইতেই কত সময় এবং শক্তির ব্যয় করিতে হইয়াছিল! তাঁহার বাঙ্গলা রচনায় সূক্ষ্ম ভাব-ধারণা যে অনেক সময় অব্যাহত হইতে পারে নাই—স্থানে স্থানে যে আসিতে-আসিতেই আসে নাই, সচেতন-শিল্পী কবি সে বৃত্তান্ত পুরাপুরি বুঝিয়াছিলেন। এ জন্য মধুসূদন অত্যধিক সূক্ষ্মতার দিকে না যাইয়া, বৃহৎ তুলিকা-হস্তে কেবল ভাবের বৃহৎ প্রবাহগতি এবং বিপুল উচ্ছ্বাসের ধারণাতেই অবহিত হইয়াছিলেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই নিজকে এ জীবনের জন্য কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশপদীর প্রধান রস কবির আত্মসম্পর্ক ও আত্মপ্রকাশিনী সরলতা, এবং গভীর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি। হোমর হইতে হ্যুগো, বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র, ভিক্টর ইমেন্নুয়েল হইতে 'ঈশ্বরী পাটনী', আকাশের তারা হইতে 'শ্রীমন্তের টোপড়' কিছুই কবির আনন্দদৃষ্টি, প্রীতিদীপ্তি এবং মমতানুভূতি হইতে বাদ পড়ে নাই! বাহ্যতঃ পৈতৃক সমাজধর্ম্মদ্রোহী হইয়াও, সাহেবিয়ানয়ে রত থাকিয়াও মধুসূদন মনে প্রাণে ভারতবাসী হিন্দু এবং 'বাঙ্গালীর বাঙ্গালী' ছিলেন। মধুসূদনের সাহিত্যচর্য্যা যেমন কেবল যশোলিপ্সায় আত্মবিলাস মাত্র ছিল না, তেমন উহার কেন্দ্রগত পরিচালনী শক্তিটাও ছিল স্বদেশ-প্রীতি। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া

চতুর্দ্দশপদী পর্য্যন্ত কেবল উক্ত প্রীতি-বীজের ক্রমান্বিত এবং নানামুখীন বিকাশ! কবির অহমিকা, কবির ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, তাঁহার রচনার মধ্যে বিদেশী বস্তু ও বিদেশী সাহিত্যের আবহাওয়া, তাঁহার শিল্পতন্ত্রের প্রাচীনতা-বিদ্রোহী রীতি এবং উন্নতি লক্ষ্য, এ সমস্ত আমাদের তরুণ বয়সে এক নিদারুণ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল—অনেকের মনেই করিয়াছে। "দেশের সমাজ-হৃদয়ের সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র যোগ ছিল না, তাঁহার প্রতিভা আকাশে অস্থানিক শিকড় বিস্তার করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে"—এরূপ স্থূলদৃষ্টি এবং অর্দ্ধদৃষ্টির পরিচয়ও আমরা একদিন দিয়াছিলাম। শিল্প-ক্ষেত্রের যেই বিদ্রোহ-মতি এবং উন্নতিলক্ষ্য হইতে বঙ্গসাহিত্যের এত লাভ উদ্বর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই আপাত-দৃষ্টিতে মধুসূদনকে অপরাধী করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যের গ্রীক Humanism বা মানবিকতার আদর্শও দেবতাগণকে মানবিক সুখদুঃখ এবং ভাল মন্দের প্রকৃতিতে প্রাকৃতভাবে উপস্থিত করিয়া একশ্রেণীর বিচারককে অত্যধিক রুষ্ট করিয়াছিল; মেঘনাদের 'রাবণ-সহানুভূতি' তাঁহার বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর অভিরুচি বিরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য "মানুষের ভাল লাগে কেন", "বাঙ্গালীর ভাল লাগে কেন", "হিন্দুরও ভাল লাগে কেন", এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা-চিন্তাই আমাদের চিত্তকে কুবিচারের বশবর্ত্তিতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এরূপ চিন্তা পথেই মধুসূদনের সার্ব্বমানবিক রসাদর্শ ও স্বাদেশিক ভাব-বস্তুর ভক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সর্ব্বজনতার সহিত স্বাদেশিকতার সম্মেলন না করিয়া কোন কাব্যই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের যাবতীয় কাব্য কবিতা-নাটক এইরূপে অন্তরঙ্গভাবে সার্ব্বজনীন হইয়াও ভারতবর্ষীয়ত্ব এবঞ্চ বাঙ্গালিত্ব সিদ্ধি করিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমাদিগকে 'হৃদয় দিয়া' বুঝিতে

হইবে। এমন কি, স্বদেশীয় সমাজতা এবং ধর্মতার ক্ষেত্রে স্বয়ং বিধর্মী হইয়াও মধুসূদন যে কিছু মাত্র বিদ্রোহভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহা সাহিত্যশিল্পী মাত্রের বিস্ময়স্থলী হইয়া থাকিবে। নিজের শিল্পাদর্শ এবং শিল্পি-জীবনকে দেশকালের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা হইতে বিশেষভাবে অসঙ্গ রাখিতে না জানিলে এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা কখনও সম্ভবপর হইত না। দেখিতে হইবে, এরূপ অসঙ্গতা অপর কোন আধুনিক বাঙ্গালী কবির সাধ্য হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে সংস্কারক, প্রচারক অথবা বিশ্বাসীর গোঁড়ামী ছাড়াইয়া, তিনি যেমন কেবল মানবিক স্থায়ীভাবের ক্ষেত্রেই স্বকীয় কাব্যকবিতার শিল্পতা সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমন অন্যদিকে, গোঁড়া হিন্দু বা শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব অথবা খ্রীষ্টান না হইয়াও প্রকৃত শিল্পীর মতই স্বদেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্য্যে চিরকাল পরমমুগ্ধ মমত্ববুদ্ধিই সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাব-বস্তু এবং সাহিত্যরীতির পথে হইলেও, তাঁহার শিল্পের একটা প্রধান সিদ্ধিই উহাদের বাঙ্গালিত্ব। বঙ্গমাতার অপর এক ভারতরত্ন এবং মধুভক্ত বরপুত্র, বর্ত্তমানযুগের কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রকৃত জাতীয়তাসাধক বরপুত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের দেশপ্রাণতাকে প্রাণেপ্রাণে আস্বাদন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিব—"মধুসূদন ইয়োরোপে ছিলেন; কিন্তু অন্তর তাহার ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুলকুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন ঘাটে ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায় সেই স্থানে বসিয়া, তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন; ও না জানি কতই আনন্দ পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত

স্বর্ণীর, তাহা তিনি ভারসেল্‌সে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন! জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে, বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগর পারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল! "বাঙ্গালার ফুল বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার ফলে" তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল!"

এই ত চতুর্দ্দশপদীর দেশ-প্রাণ এবং মধু-প্রাণ বাঙ্গালী মধুসূদন!

তবে মধুকবির অনেক ক্ষুদ্রকবিতার মধ্যে নানাস্থানে একটা ব্যাহত শক্তি এবং পদগতির একটা অসচ্ছলতা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আজ, পঞ্চাশ বৎসর পরে, তাঁহার আবিষ্কৃত কবিত্ব-পথে যাতায়াত করিয়া আমাদের অনেক ক্ষীণশক্তি এবং ক্ষীণমস্তিষ্ক কবিতা-লেখকও যে স্থূলদৃষ্টিতে তদপেক্ষা বহুতর বা আপাততঃ ভাব-বস্তুর ক্ষুদ্রকবিতা এবং গীতিকবিতা চয়ন করিতে পারিতেছেন, তাহাও অনেকেরই ধারণা হইতে থাকিবে। কিন্তু মধু ছিলেন বৃহৎ ভাব-প্রাণতার বিমুক্ত আকাশবিহারী পক্ষী! গীতিকবিতার, বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের এই সঙ্গীতজাতীয় কবিতার ক্ষুদ্র পঞ্জরের মধ্যে তাঁহার পাখা মেলিবার এবং নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশও যেন হয় না! এজন্য কোন কোন কবিতায় যেন মধুসূদনের শিল্পাদর্শটিই পৃথক বলিয়া মনে হইবে এবং উহাদের ভাব-গ্রহ কিংবা উল্লাসও যেন কাহিল বলিয়াই মনে হইবে। উহারা যেন তাঁহার চিত্ত-স্পন্দনকেই ধরিতে পারিতেছে না। উহাদের ছন্দ, তাল, ভাষা এবং ভাবভঙ্গী যেন পরস্পর সহযোগী হইতে জানে নাই; কোথাও হয়ত 'বুদ্ধি' আসিলে ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলে

ভাষা বিগড়াইয়া যাইতেছে! গতি, দীপ্তি, কায়া এবং আত্মা ওতপ্রোত হইয়া উহাদিগকে এক একটী স্বতন্ত্র 'প্রাণী' রূপে খাড়া করে নাই; অথচ প্রাণী না হইলে কবিতাই হয় না। কিন্তু, যেমন বলিয়া আসিয়াছি, অপরাধ শিল্পীর ততটা নহে, যতটা অপ্রাপ্তবয়স্কা বঙ্গবাণীর। বঙ্গের সরস্বতী তখন যাবৎ, সংস্কৃততন্ত্রের বাহিরে, কেবল বৈষ্ণবী প্রেমভাবুকতা এবং 'গ্রাম্যজীবন'তার পথেই স্বাধীন শক্তিসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, মধুসূদনের মর্ম্মগত 'বিশ্বজন'তা, বলীষ্ঠ সাহিত্যবুদ্ধি এবং পৌরুষপ্রশস্ত ভাবুকতার ধারণাপথে তখনো যেন 'সমর্থ' হইয়া উঠিতে পারেন নাই। মধুসূদনের ইংরেজী কবিতাগুলির পাশাপাশি রাখিলেই বুঝিতে পারি, তাঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গলা কবিতার শিল্প-শক্তির মধ্যে পার্থক্যটি কোথায়। ঠিক "নওল কিশোরী" এবং পূর্ণযৌবনা ভাবিনীর মধ্যে যাহা পার্থক্য। যেমন ব্রজাঙ্গনায়, তেমন চতুর্দ্দশপদী কবিতায়, কবি যেখানেই না গভীর মনস্তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেখানে ন্যূনাধিক ব্যাহৃতি এবং ইচ্ছাকৃত বিরতির ভাবটিই যেন আমাদের চিত্তকে আঘাত করে। মনে হয়, ইংরাজীভাষায় হইলে কবি যেন আরও কত সুন্দর ও গভীরতর ভাবুকতায় ডুব দিতে পারিতেন, বঙ্গভাষাতেই আর কিছুকাল সাহিত্যজীবন অব্যাহত রাখিতে পারিলে, আরও কত-কি যেন করিয়া যাইতে পারিতেন! এ সকল কবিতাগ্রন্থ উহাদের স্বক্ষেত্রে, ভাবসামর্থ্য এবং আন্তরিকতায় এখনও বঙ্গসাহিত্যে অনতিক্রান্ত আছে সত্য; কিন্তু মধুসূদনের মনোযোগী সঙ্গী হইলেই বুঝিতে পারিব, আর কিছুকাল আত্মপথে চলিলে তিনি বঙ্গভাষাতেই উহাদের বস্তু এবং ভাবকে কি উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি এবং গভীরতর স্ফূর্ত্তি দান করিতে পারিতেন! বঙ্গে দ্বিতীয় মধুর জন্ম হইবে না; এবং একালে উহার সম্ভাবনাও নাই। মধু বঙ্গভাষার

আর্য্য-অংশে যে শক্তিসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কোন কোন দিকে পরকালের বঙ্গসাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু অনেক দিকে যে পারে নাই, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যই যে সুসম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা বঙ্গসাহিত্যের সাধকমাত্রেই বুঝিতেছেন।

এখন কৃষ্ণকুমারীর কথা পাড়িয়াই এ সূত্রের উপসংহার করিব। শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী বঙ্গসাহিত্যকে সুখান্ত নাটক দিয়াছে; বিষাদান্ত নাটকের অভাব ছিল। মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলেও একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ! সংস্কৃতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, উভয়ে বিষাদান্ত হইলেও, ভারতীয় আর্য্য জাতির মন ভবজীবনের অবসানকে—মানুষের মহাযাত্রা এবং মহা-প্রস্থানকে—সমুচিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে জানিলেও, প্রাচীনভারত তাহার সামাজিক নাট্যোৎসব-আদিতে কোন বিষাদান্ত প্রয়োগ আদবেই যেন পসন্দ করে নাই! সমাজের বাহিরে চতুর্থ-আশ্রমের একটা স্বতন্ত্র সর্ব্বনাশ এবং সর্ব্বত্যাগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়াই, বোধ করি সংসারজীবনের মধ্যে আবার উহাকে আমল দিতে চাহে নাই! ঐরূপে সংন্যাসের মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সর্ব্ব-সমতার আদর্শ পরিপোষিত ছিল বলিয়া, আবার সমাজগণ্ডীর মধ্যেও সমতা এবং স্বাধীনতার প্রাবল্য পোষণ করিতে যেমন চাহে নাই। যেরূপেই হউক, ভারতীয় সাহিত্যে বিষাদান্ত নাট্যাভিনয় আদবেই জন্ম অথবা পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। ভারতের সাহিত্যশাস্ত্রাদিও উহা পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছে। গ্রীক-সাহিত্যের নব পরিচয় যেমন খ্রীষ্টান ইয়োরোপকে বিষাদান্ত নাটকের সহমর্ম্মী হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তেমন একালের সকল ইয়োরোপীয় সাহিত্যেই যেমন গ্রীক-আদর্শের তেমন খ্রীষ্টান-আদর্শের বিষাদান্ত নাটকও সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীক নাটকের

পরিচালক তত্ত্ব যেমন fate বা অপরিহার্য্য অদৃষ্ট, তেমন খ্রীষ্টানী আদর্শের বিষাদান্ত নাট্যতত্ত্বকেও 'sacrifice' বা আত্মোৎসর্গ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। বলা বাহুল্য, উভয় আদর্শই স্বতন্ত্র অথবা সম্মিলিত ভাবে বিষাদান্ত নাটকের নিয়ামক হইতে পারে। ভারতবর্ষ গ্রীক 'অদৃষ্ট' অথবা খ্রীষ্টান 'উৎসর্গ' উভয়ের সহিত অবাধে সহানুভূতি করিতে পারে, তাহার সমাজবুদ্ধি এবং ধর্ম্মবুদ্ধির ক্ষেত্রেও উভয় আদর্শের চূড়ান্ত সহানুভূতি ঘটিতে পারে। এ প্রসঙ্গে সেদিকে আর বাক্যব্যয় করিব না। মধুসূদন বিশ্বনাথের 'পাতি' উপেক্ষা করিয়াই বঙ্গের সাহিত্যে এই নব নাটকের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইলেন, এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যেই কৃষ্ণকুমারীর সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন! অভিনয়ের সুবিধার জন্য, মধুসূদন কবিত্বের দাবী এবং প্রেরণা উপেক্ষা করিয়াও অভিনেতা এবং সামাজিকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন—অর্থাৎ নাটকটি গদ্যেই রচিত হইল। কিন্তু হায়, যেজন্য মধুসূদনের এই পরাজয় স্বীকার, আকাশবিহারী পক্ষীকর্ত্তৃক ইচ্ছাবৃত পক্ষচ্ছেদ, সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইল না। অশুভান্ত নাটক বলিয়া, বেলগাছিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনাদের গৃহে ওই 'অমঙ্গলা' অভিনয়ের স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন! তৎপূর্ব্বে মধুর প্রহসন দুইটি এরূপ একটা 'প্রবল বাধা' হইতে অভিনীত হইতে পারে নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' ভালমন্দ উভয়দিকে তৎকালের সমাজজীবনের এত নিখুঁত প্রতিকৃতি হইয়াছিল যে, উহাদের তালিম দেখিয়াই শ্রোতৃবৃন্দ গায়ে পড়িয়া সমাজের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তিকে ওই সমস্ত সাহিত্যচরিত্রের একেবারে 'আসল' স্থির করিয়া ফেলিল! উক্ত সমস্ত ক্ষমতাশালী 'আসল' ব্যক্তিগণের রোষদৃষ্টি এবং বাধা বিঘ্ন হইতেই প্রহসন দুইটি অভিনীত হইতে পারে নাই। মধুসূদন সে ঘটনা স্মরণ করাইয়া

দিয়াই লিখিলেন, "মনে রাখিও, তোমরা ইহার পূর্ব্বে প্রহসন দুটীর বেলাতেও আমার পক্ষচ্ছেদ করিয়াছ, এখন তোমরা নাটকটাও অভিনয় না করিলে আমি বঙ্গভাষায় কলমই ছাড়িয়া দিব—না হয় হীব্রু অথবা চীনা ভাষাতেই লেখনী চালাইতে হইবে।" কিন্তু, কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় ঘটিয়া উঠিল না। বলিয়া রাখি, উহার প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর পর, বাঙ্গালায় স্বাধীন বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পরেই উক্ত 'অমঙ্গল' নাটকটীর প্রথম অভিনয় হয়। মধুসূদনের নাটক-রচনার তৃষ্ণা উক্ত প্রতিষেধ হইতে চিরকালের জন্য একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; উক্ত ঘটনা হইতে তাঁহার জীবনেও একটা অসাধারণ স্থল-কম্পের সূচনা হয়।

মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, "রাজারা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গলা নাটককে উৎসাহিত করেন, আমি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারি। যদি না করেন, তবে 'মাথা কুটা' ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর কি? অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—alas born an age too soon!" "How will you answer at the bar of Posterity!" পরকালের পাঠক, এস্থলে দাঁড়াইয়া বুঝিয়া লউন, কবি-হৃদয়ের ইহা যে গভীরতম দীর্ঘনিশ্বাস! মধুসূদন সংসারজীবনে দুঃখ-দৈন্য-দুরদৃষ্টের তাড়নায় আর যত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, উহাদের কোনটাই ইহার সমতুল্য নহে, কিংবা ইহার তুল্য এতবড় অনিষ্টফলও প্রসব করিতে পারে নাই। সংসারে কবির এস্থলেই প্রধান দুরদৃষ্ট—হাহাকার—মৃত্যু-যন্ত্রণা! "অকালে, অসময়ে জন্মধারণ করিয়া—মরিয়া গেলাম! আমার স্থিতি হইল না—দেশের লোক আমার পোষণ করিল না—দেখিল না—বুঝিল না! কি করিতাম—কত করিতে পারিতাম!" এস্থলেই মধুর কবি-জীবনের আর একটি বড় ঘটনা—বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের মস্তকেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ

বজ্রপাত! এই অসাধারণ শক্তিশালী কবি সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে কি করিতে—কত করিতে পারিতেন! মধুর পর আর যে সমুচ্চ কবি-শক্তি-শালী প্রকৃত নাট্য-প্রতিভার সংঘটনা বঙ্গে ঘটে নাই, তাহা দ্রষ্টামাত্রেই বুঝিতেছেন। এ ঘটনা আমাদের চিরকালায় অনু-শোচনার স্থান হইয়া রহিল।

বলিতে হইবে, কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। টডের 'রাজস্থান কুসুমের কাহিনী' সকলের পরিচিত; মধুসূদন উহাকে অবলম্বন করিয়া একটা সুন্দর করুণান্ত নাটক রচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনা এবং সৃষ্টিশক্তির এবং প্রকৃত নাট্যরচনাশক্তির বহুল পরিচয় ইহাতে আছে। এখন যাবৎ বাঙ্গালার কোন নাটক উহাকে শিল্পতা-বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারে নাই। উৎসাহ পাইলে মধুসূদন যে কি করিতে পারিতেন,এ নাটক হইতে তাহার পরিচয়ও লাভ করিতে পারি! কবির দীর্ঘনিশ্বাসটীর পুনবাবৃত্তি করিয়াই বলিতে ইচ্ছা করে—alas born an age too soon!

নাটকটিকে সেকালের অভিনয়-যোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে মধুসূদন তাঁহার কবিত্বের ডানা স্বয়ং কাটিয়া রাখিয়া, মাটীতে হামাগুড়ি দিয়াছেন বই নহে—উহাকে সাহিত্য হইতে দেন নাই। সেক্সপীয়রের নাটকগুলির ন্যায় সাহিত্য আদর্শে রচিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যের একটা চিরগৌরবের সম্পত্তি হইতে পারিত! তবু, যাহা পাইয়াছি তাহার মাহাত্ম্যই আমাদের চিন্তা করা উচিত। কৃষ্ণকুমারী রচনার উপলক্ষে মধুসূদনের যে সকল চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে—সে সমস্তও বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যসেবী মাত্রের পুনঃপুনঃ চিন্তার বিষয় হইয়াই আছে।

উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণার সৌন্দর্য্য রবে আকৃষ্ট হইয়া জয়পুরের কামুক রাজা জগৎসিংহ এবং মারবারের রাজা

মানসিংহ উভয়ে তাঁহার পরিণয় প্রার্থনা করেন—উভয়ের প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণাকে না পাইলে তাঁহারা উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়; অথচ প্রতিদ্বন্দ্বীগণ উভয়েই প্রবলতর; সুতরাং রাজা এবং পাত্রমিত্র সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করাই জল্পনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী দেশের কল্যাণে এবং বংশের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বিষপানেই প্রাণত্যাগ করেন। এ ইতিহাসকে অবলম্বন পূর্ব্বক মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনা করিয়াছেন। "আমি জগৎসিংহকে ইতিহাসে যেমন পাইয়াছি, তেমনই করিয়াছি—ক্ষুদ্র চেতা এবং বিলাসী ব্যক্তি। ভীমসিংহ বিষন্ন প্রকৃতি এবং গম্ভীর চরিত্রের লোক; ভীমসিংহের মহিষীও তাঁহার মতই বিষণ্ণ চরিত্র এবং গম্ভীরা না হইয়া পারেন না"। বিলাসী জগৎসিংহের দিক হইতেই কবি ঘটনার সৃষ্টি পূর্ব্বক নাটকের চক্র নির্ম্মিত করিতেছেন। এই বিলাসীর আবার একটা 'বিলাসিনী', তাহার আবার একজন সখী এবং ধনদাস নামক একজন দুষ্কর্ম্ম-সহচর সৃষ্টি করিয়া কবি ঘটনাচক্রকে ঘর্ঘররবে ছুটাইয়াছেন। "ইহা যখন বিয়োগান্ত নাটক, আমি কেবল হাস্য-উদ্রেকের উদ্দেশ্যে কোন দৃশ্যের অবতারণা করি নাই। উহাতে নাটকটির স্থায়ীভাব বিনষ্ট করিত। কিন্তু চলিবার পথে যখন কোন হাস্যকর কথা সহজে আসিয়া গিয়াছে, তাহাকেও উপেক্ষা করি নাই। এ বিষয়ে আমার উপদেশ এই হইতে পারে যে, 'বিয়োগান্ত নাটকে ইচ্ছা করিয়াই হাসি তুলিবার চেষ্টা করিওনা, তবে যদি কোন হাসির কথা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তা'হইলে গৌণ দৃশ্যগুলিতে উহাকে উপেক্ষাও করিবেনা; উহাতে বরং একটা আনন্দজনক বৈচিত্র্যই আসিবে। সেক্সপীয়রের তাহাই প্রণালীছিল। তাঁহার শ্রেষ্ট বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে সেক্সপীয়র কখনও ইচ্ছা করিয়া হাস্য-রসিক হইতে যান নাই'।"

কৃষ্ণকুমারীতে, নাটকীয় অবস্থা এবং ঘটনার স্বাভাবিক গতি হইতে এবং চরিত্রের ভাবগতির পরিণতি হইতেই মনে যে রসের উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর, কবি কেবল সে দিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল ভাবপ্রধান কথা, সঙ্গীততন্ত্রীয় ভাবুকতা অথবা উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার দ্বারা মানুষকে আবিষ্ট করিতে যান নাই। তিনি যেই শিল্পতার আদর্শে চলিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও পাইতেছি। "আমরা এসিয়াটিক জাতি; ইয়োরোপীযগণ হইতে যে আমরা অতিরিক্তমাত্রায় ভাবপ্রবণ, তাহাতে সন্দেহ হয় না। সেক্সপীয়রের মাহমাময় নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি কর! Midsummer Nights Dream এবং রোমিও-জুলিয়েত ও অপর দুই-একটা ব্যতীত এমন নাটক নাই যাহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে 'রোমাণ্টিক' বলা যায়। রোমাণ্টিক কিনা, যে ভাবে 'শকুন্তলা' বোমাণ্টিক। উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয় নাটকে তুমি মনুষ্য-জীবনের কঠোব সত্যসমূহেব ধারণা পাইবে, সমুন্নত ভাবুকতা এবং ভাবধর্ম্মী বীবাচারই পূর্ণ পবিমাণে পাইবে। আমাদের মধ্যে কেবল মধুবতা, কেবল কোমলতা, কেবল 'রোমান্স!' আমরা জগতেব সত্যমূর্ত্তি বিস্মৃত হইবা কেবল পরীবাজ্যেব স্বপ্ন দেখিতেই লাগিয়া আছি। এ দেশে প্রকৃত নাটক এখন যাবৎ সামান্য মাত্রও উন্নতি কিম্বা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। + + + ভাষার বিষযেও আমি বঙ্গভাযার স্থায়ী প্রবণতাব দিকেই লক্ষ্য রাখিব— সেক্সপীযব যেরূপে ইংরেজী ভাষার স্থায়ী তত্ত্বটাকেই তাঁহার নাটকাদিতে অবলম্বন করিয়াছিলেন!"

ইহাও প্রাচীন তন্ত্র বিরুদ্ধে আর একটা বিদ্রোহেব সুর, সন্দেহ নাই। কিন্তু, মধুসূদন যে উহার অনুসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন নাটকের সৃষ্টি করিবেন আশা করিয়াছিলেন, আরও ৩।৪ খানি নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে যে দেখাইবেন ভাবিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী

হইতে পারে নাই। কৃষ্ণকুমারী নাটকেই তিনি গ্রীক এবং খ্রীষ্টান আদর্শের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারীকে তাঁহার পিতার আদেশে হত্যা করা হইলেই উহা হইত একটা গ্রীক নাটক—'অপরিহার্য্য অদৃষ্ট বাদের নাটক'. কিন্তু কৃষ্ণার ঐ নিয়তি না করিয়া মধুসূদন তাঁহার দ্বারা 'আত্মোৎসর্গ'ই দেখাইয়াছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তরাবেশ নামক পদার্থের ফল না হইলে কবিকে এই সূক্ষ্ম কথাটি যোগাইতেই পারিত না। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মাত্র আঁচরেই সমগ্র নাটকের প্রবৃত্তি এবং রস-নিষ্পত্তি কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর ভাষার মধ্যে মধুসূদন বঙ্গ-ভাষার যে গার্হস্থ্যশক্তি, সেই গ্রাম্যতাবর্জ্জিত অথচ 'আটপৌরে' সামর্থ্য আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে অপূর্ব্ব। বাক্যপ্রতিভাশালী মধুসূদন ব্যতীত এই অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার ঘটিত না, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে উহার অবতারণা যে সম্ভব ছিল না, তাহাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'শিল্প-দৃষ্টি' বিদ্যাসাগর কিংবা ভূদেব, প্যারীচাঁদ বা রাম নারায়ণের মধ্যে নাই। কৃষ্ণকুমারীর এ মাহাত্ম্য অনেক সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কবিত্বের অনুরোধে আমি সত্যকে বিস্মৃত হইয়াছি। বর্ত্তমান নাটকে আমি নিজের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমি কবিত্বের জন্য চারিদিক খোঁজ করিয়া চলিব না—অবশ্য আপনা আপনি আসিয়া পড়িলে আমি উহাকে ছাড়িয়াও যাইব না। তবে, ঐরূপে চলিতে গিয়া কবিত্বের সঙ্গে অনেকবার দেখা পাইব আশা করি। আমি এমনসমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব যাহারা স্বাভাবিক মতেই

কথা কয়, কেবল কবিত্ব কপ্‌চাইতেই চায় না। সেক্সপীয়রের উহাই ত আদর্শ ছিল।”

কথাগুলি নাট্যশিল্পীর পক্ষে কত মূল্যবান্‌! এই শক্তিমান্‌ কবি হইতে আমরা অনেক আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু যে মহাশক্তি মধুসূদনকে পরিচালিত করিতেছিলেন তাঁহার গতি বিরূপ হইল—মধুসূদনকে বিলাত ছুটিতে হইল। কৃষ্ণকুমারীর প্রতিষেধ যে মধুর জীবন-পরিবর্ত্তনের একটা প্রবল কারণরূপে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উহা হইতেই যেন নিজের শক্তি-সম্মানহীন সাংসারিক অবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি অত্যধিক সজাগ হইয়া উঠিয়া মধুসূদনকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল; ফলতঃ, একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! দুরবস্থার অপচ্ছায়াকে ডিঙ্গাইবার জন্যই কবি সাগর লঙ্ঘন করিলেন—ছায়াটিও সঙ্গে সঙ্গেই রহিল! মধুর পক্ষে বিলাত যাওয়া এবং Madhusudan Dutt, esq. হওয়ার অর্থই হইতেছে—জীবনের নবগুণ অভাব-বৃদ্ধি অথচ অর্থাগমের হ্রাস। সহিষ্ণুতার স্খলন হইতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, বলিতে পারি। কবি মর্ম্ম-যাতনায় লিখিয়াছিলেন, “এ দেশে টাকা ব্যতীত কোন সম্মান নাই। তোমার যদি টাকা থাকে, তা হইলেই তুমি বড় মানুষ। এ জাতি এখনো অধম অবস্থা অতিক্রম করে নাই। এদেশে বড় লোক কে? চোরবাগান এবং বড়বাজারের অস্তিত্বহীন ব্যক্তি সমূহ। টাকা চাই ভাই, টাকা! যদি মনে কর, আমি সাহিত্যে কিছু করিয়া যাইতে পারিতাম—আমার শক্তি ছিল। কিন্তু আমি অবস্থাগতিকে শক্তিকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাইতে পারিলাম না। আমি যাহা করিয়া গেলাম, হে আমার স্বদেশ, উহাতেই সন্তুষ্ট হও!”

এখানেও ডাকিনীর কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছেন না কি? যে ব্যক্তি সরস্বতীর পদামৃত পান করিয়াছে, অমর হইয়া গিয়াছে, এই নশ্বর দুনিয়ার

বড়বাজারের এবং চোরবাগানের লক্ষ্মীপেচাদের দেখিয়া তাহার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইল কেন? মধুসূদন দত্ত নামক বঙ্গদেশের চিরজীবী লোকটি, নিজের অহংতত্ত্বে এমন নিত্যসচেতন ব্যক্তিটি কতকগুলি ক্ষণজীবী এবং ব্যক্তিত্বহীন মনুষ্যের সমক্ষে নিজকে ছোট মনে করিতে পারিল! নিজকে এত ছোট মনে করিল যে, নিজের অমর কৌলিন্যটুকু ভুলিয়া ঐ গুলাকে একেবারে ঈর্ষ্যা করিয়াই বসিল! এস্থানেই নিয়তি—একেবারে গ্রীক অদৃষ্ট। চিত্তের যে অসামান্য সংযমসাহায্যে মধু কাব্য লিখিতেন —অসাধারণ সংযম ব্যতীত ঐ সমস্ত কাব্যের এক পংক্তিও যে লেখা হইতে পারে না তাহাই বুঝিয়া লউন—সে অসামান্যতার সঙ্গেসঙ্গেই এত বড় প্রচণ্ড পাগলামী!

এ স্থলেই মধুকবির জীবনমর্ম্মের নিদারুণ এবং দুর্ব্বোধ্য অদৃষ্ট। যিনি সাহিত্যে সরস্বতীমাতার চরণকমলের মধুপ্রার্থী, তাঁহাকে যে সর্ব্বাগ্রে নিজের সাংসারিক অদৃষ্টে "যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট" হইতে হইবে। এ দিকে বরঞ্চ একেবারে সংন্যাসীর মত হওয়াই যে দরকার! যেগুণে তিনি তপস্বী হইয়া মানুষের জন্য অজানা ভাবরাজ্যের বাণী-দূত হইবেন, সে গুণটিই যে তাঁহাকে দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক তপস্যাহীন করিবে! আবার—অপরিচিত রাজ্যের খবরদারী করেন বলিয়া— সে গুণটিই যে তাঁহাকে প্রথম প্রথম সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধেয়, এমন কি, হেয় এবং অবজ্ঞেয় করিয়াও তুলিবে! সাধারণের অবজ্ঞার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলাই যে তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য অদৃষ্ট! বাণী মাতার পদামৃতই তাঁহাকে যদি বলদান করিতে না পারে, তবে এ সংসারে তাঁহার যে আর কোন সহায়ই রহিল না! মধুসূদনের এইটি ভুল হইয়াছিল যে, তিনি মনে করিলেন, কবি থাকিয়াও দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে অপর সমস্ত লোকের ন্যায় অর্থ-তপস্বী হইতে পারিবেন; তিনি

নিজের অধিকার ভুলিয়া, পরের ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিতে গিয়াছিলেন।

ইহা মধুচরিত্রের একটা অসাধারণ দুরদৃষ্ট! আমরা দেখিতেছি, এ দুর্ব্বলতার পথেই তাঁহাকে সংসারে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, পরিশেষে, প্রাণে বাঁচিয়া থাকিয়াও, সরস্বতী মাতার দয়াবঞ্চিত হইয়া নিদারুণ হাহাকারে দিন কাটাইতে হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, তথাপি মধুর সহৃদয়তার হ্রাস হয় নাই—তিনি মনুষ্যদ্বেষী অথবা বিষাক্ত-হৃদয় হইয়া পড়েন নাই! মধু তাঁহার এক সমালোচককে কি লিখিয়াছিলেন দেখুন—"আমি তোমার বন্ধু বলিয়া কেবল বন্ধুতার খাতিরে মুখ-চাওয়া সমালোচনা বা প্রশংসা একেবারেই করিও না। ঠিক যাহার উপযুক্ত মনে কর, তাহাই আমাকে দিও। আমার মতন এমন পোষাকুকুর আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেজ নাড়ে নাই!" পৌরুষনিষ্ঠ সাধুতা এবং সহৃদয়তার সঙ্গেসঙ্গেই অন্যদিকে ওইরূপ স্থিতিচঞ্চল দুর্ব্বলতা। কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনাতেই যে মধুকে বিরূপ করিতে পারে নাই, উহার মূলে যে আত্মনিষ্ঠা এবং কেন্দ্রনিষ্ঠা আছে, তাহার সঙ্গে কবির উক্তরূপ আত্মবিস্মৃতির সঙ্গতি করা যায় না। কবিগণের মধ্যে এইরূপ একটা না একটা দুর্ব্বোধ্য অসঙ্গতি সময় সময় দেখা যায়। আমরা বঙ্গের এমন এক বড় কবিকে—একেবারে অমৃতপদে উত্তীর্ণ কবিকেই—জানিতাম, যাঁহার আত্মাদর এবং আত্মচৈতন্যই তাঁহাকে জীবনপথে আত্মবল দান করিতে যেন পর্য্যাপ্ত নহে! যিনি কোনরূপ বিপক্ষতা এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার লেশমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না। ভক্তি পূজা এবং প্রণামাঞ্জলি ব্যতীত যাঁহার দিন চলাই ভার হইয়াছিল; যিনি নিজের সমালোচক নামক দূরদৃষ্ট জীবটাকে কোথাও দেখা পাইলে একেবারে খুন করার মতই ভাবগতিক না দেখাইয়া পারেন নাই!

একেবারে ব্যাঘ্রের অনুরূপ জিঘাংসাদৃষ্টি এবং জাতিসর্পের রোষ-বৃষ্টি! ললিতকলার কোন সিদ্ধ সেবক এবং অকৃত্রিম সারস্বতের জীবনে কি করিয়া এইরূপ অনিভীষ্ট পদার্থের সম্ভাবনা এবং অবকাশ ঘটিতে পারে? এরূপ পরপ্রেক্ষা এবং পরজীবিতার প্রয়োজন থাকিতে পারে? উত্তর ইয়োরোপের অমর শিশু-গল্প-শিল্পী হান্স এণ্ডার্সনের জীবনীতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ঘনিষ্ট দৃষ্টি করিলে হয়ত অনেকশঃ মিলিবে। কিন্তু কবির প্রতি স্নেহসহকারে দৃষ্টি করিতে পারিলেই এ দুর্ঘটনা সহ্য করিতে পারা যায়। এ ঘটনা যে অনেকের পক্ষেই একরূপ অপরিহার্য্য! যে ভাবতন্ময়তার দরুণ তিনি বড় কবি, যেই স্নায়ুতন্ত্র বহিঃসংসারের সুখদুঃখের সম্পর্কে অপরূপভাবে সংগ্রাহী হইয়া তাঁহার দেহকে কবি-দেহ করিয়াছে, যাহাতে তাঁহার দেহকে ভাবের উপযুক্ত গ্রাহক এবং কবি-আত্মার-উপযোগী 'গৃহ'রূপে স্থির করিয়াছে, সেই ভাব-ধর্ম্ম এবং স্নায়ু-ধর্ম্মই ত আবার তাঁহাকে সমালোচনায় অসহিষ্ণু, বিরুদ্ধবাদে অসহন এবং অহং-ভাবুক করিয়া গিয়াছে! যে গুণে তিনি একজন বিশেষধর্ম্মী বড় কবি, সে গুণেই তিনি একটি বিশেষ-দোষান্বিত অসামাজিক জীব। দেখা যাইবে শিল্পী মধুসূদনের প্রতিভাচরিত্রে তাদৃশ কোনরূপ অসহিষ্ণুতা অথবা পরাপেক্ষা ছিল না; থাকিলে, পুলিসকোর্টের ওই আমলাটি, সমাজের সঙ্গে সকল প্রীতিযোগভ্রষ্ট ওই দরিদ্র ব্যক্তিটি চারিদিকের এত বিরোধবিপক্ষতা এবং নিন্দাঠাট্টা-টিটকারীর মুশলপাত মাথায় বহিয়া অবিচলচিত্তে সেকালের ক্ষেত্রেই আপন পথ কাটিয়া লইতে এবং অপরিচিত ভাব-গঙ্গার প্রবাহকে অনিচ্ছুক বাঙ্গালীর দ্বারদেশে রাখিয়া যাইতে পারিতেন না।

আবার, মধুসূদন কেবল ত কবি ন'ন, একজন পণ্ডিতও ছিলেন!

কোন কবির পক্ষে পুঁথি-পাণ্ডিত্য অথবা অর্জ্জিত বিদ্যার যে পরিমাণে প্রয়োজন মধুসূদন উহা চূড়ান্ত মাত্রাতেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেখিতে হইবে, তথাপি তাহাকে পাণ্ডিত্যের প্রধান রোগটি স্পর্শ করিতে পারে নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিবৃত্ত-বুদ্ধি, অগ্রগতির প্রবৃত্তি এবং পরাক্রমের প্রবৃত্তিই হয় ত প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির প্রধান গুণ। উহা হইতেই মনুষ্যের মন নিত্যকাল নব নব ক্ষেত্রে পরাক্রমী হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিতেছে, অজ্ঞাতের নব নব অন্ধকার-দেশে বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী অগ্রগামী করিয়া চলিয়াছে, বিচার-বিতর্ক-নির্ব্বাচন করিয়া, গ্রহণ বর্জ্জন এবং স্বয়ং অর্জ্জন করিয়া জ্ঞানের অধিকার-সীমা বর্দ্ধিত করিতেছে! কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি ও প্রণালীর পাপবিপত্তি এবং অনিষ্ট সম্ভাবনাও নিতান্ত কম নহে! পাণ্ডিত্যের ওই পরাক্রমী বিচিকিৎসা হইতে যেমন পরের প্রতি আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও বিজিগিষার উৎপত্তি হয়, তেমন জ্ঞানব্যক্তির অধ্যাত্ম-তরফেই অতি সহজে অনাদর, অপ্রেম, রোষ-বিষ-বিদ্বেষ, এমন কি জিঘাংসার উৎপত্তি হইতে পারে। উহা হইতেই মনুষ্য-আত্মায় প্রীতিভক্তি এবং পূজা-দাক্ষিণ্যের দিব্যগন্ধ এবং অমৃতরসের মন্দাকিনী ধীরে ধীরে শুকাইয়া আসিতে পারে। পর-বিদ্বেষ, পরদ্রোহ, অসহিষ্ণুতা এবং আত্মম্ভরতার প্রাবল্য ঘটাইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিকে রুক্ষচরিত্র, সংসারদ্বেষী, জীবদ্বেষী এবং জীবন-দ্বেষী করিয়াই রাখিয়া যাইতে পারে! অধ্যাত্মক্ষেত্রে হয় ত এ স্থলেই পাণ্ডিত্যের মহাপাতক এবং মহারোগ। অনেক গ্রন্থজীবী পণ্ডিত, Philosopher এবং বিদ্যাব্যবসায়ীর মধ্যে এই অধ্যাত্মরোগের নিদারুণ লক্ষণ এবং উপসর্গ সমূহ লক্ষ্য করা যাইবে। ইহারা সরস্বতী-মাতার চরণাশ্রয়েই একদিকে উত্তুঙ্গ জ্ঞান-কৌলিন্য এবং পূজা

পদবীতে উত্তীর্ণ হইয়াও অন্যদিকে যেন কেবল অর্দ্ধমনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই হ'ন না! কেবল বাহ্যিক পাতকই ত পাতক নহে! ইঁহারা সংসর্গী মনুষ্যের হৃদয় এবং চরিত্রকে অধ্যাত্মলোকে পাতিত করিতেই সাহায্য করেন; উহাকে অপ্রেম, আত্মম্ভরতা এবং বিযাগ্রতাই শিক্ষা দেন! এ কারণেই হয়ত অনেক শুষ্ক পণ্ডিত এবং দার্শনিক বাহ্যতঃ একেবারে নিষ্পাপকর্ম্মা হইয়াও মানবসমাজে কদাপি অমৃত পদবী কিংবা মনুষ্যের অধ্যাত্মরাজ্যে রাজ-পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ, স্থলবিশেষে, হয়ত তাঁহাদেরই শিষ্যসেবক কবি ও ভক্ত—হয়ত তাঁহাদেরই দীক্ষা-প্রাণিত ধর্ম্মসাধকগণ উক্ত পদবীতে দাঁড়াইয়া আছেন! মধুসূদনের মধুচরিত্রে—গ্রন্থপাণ্ডিত্যের বিশালতা এবং সংসারের সহস্র দুর্ব্ব্যবহার ও তাঁহার নিজের অসামান্য দুরদৃষ্ট সত্ত্বেও—এই অপ্রেম এবং রুক্ষতা যে শিকড় গাড়িতে পারে নাই, তিনি যে "নিত্যকাল মধু ছিলেন". এ পুণ্যলক্ষণটিই আমাদের হৃদয়কে তাঁহার পক্ষপাতী করিয়া রাখিতেছে।

মধুসূদনের সহৃদয়তা ও সাহিত্যচর্য্যার 'যজ্ঞ' আদর্শ টুকু না বুঝিলে কবির প্রকৃত অধ্যাত্মমূর্ত্তি বুঝিতে ভুল হইবে। মধুসূদন, বিশেষতঃ কিশোরবয়স্ক যুবক মধুসূদন নানাদিকে ইয়োরোপীয় টাইটানিক ভাব, self assertion বা 'চণ্ডমুণ্ড' দলের প্রচণ্ডতা-ধর্ম্মের বাধ্য হইয়াই যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ কারণে, তিনি কেবল অহমিকা, প্রবল আত্মবিলাস এবং উৎকট যশোলিপ্সা হইতেই সাহিত্যসেবা করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ ভ্রম জন্মিতে পারে। এক সময়ে আমরাও এই ভ্রান্ত ধারণার বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু, যেমন পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তিনি পৈত্রিক রক্তধর্ম্মেই অন্তরাত্মায় ক্ষাত্ররীতির যজ্ঞবিলাসী এবং দাতা ছিলেন।

এ যজ্ঞধর্ম্মেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-অর্থে চিরকাল সুখচিন্তা এবং আত্মাভিমানকে বলি দিয়াছেন; ক্রমে, উক্ত ধর্ম্মই মুখ্য হইয়া মধুর সকল সাহিত্যচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পরিশেষে তিনি যেন কেবলই বলিয়াছেন---"চাই, কেবল চাই আমার স্বদেশের সাহিত্য-উন্নতি। আমি যে পর্য্যন্ত পারিলাম করিয়া গেলাম। প্রাণমনে এই প্রার্থনা, আমা' অপেক্ষাও শক্তিধর এবং ভাগ্যবান লোক আসিয়া আমার সাহিত্যকে বাড়াইয়া যাউক।" ইংরেজী ছাড়িয়া যখন বাঙ্গালা ধরিয়াছেন, বঙ্গভাষার শক্তিসামর্থ্যের তরফে নব উপনয়ন লাভ করিয়াছেন, "মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে" চিনিয়াছেন, তখন যেমন এই কামনা; যখন সরস্বতী সেবা পরিহার করিয়া লক্ষ্মীর কৃপা-লক্ষ্যে "জলধি বাঁধিবার" জন্য উদ্যত হইয়াছেন তখনও এই প্রার্থনা—

এই বর হে বরদে, মাগি তব কাছে,
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।"

আমি না পারিলাম, আমার পর এ বঙ্গদেশে এখন সমস্ত লোকের জন্ম হউক, যাহারা ভারতবর্ষের গৌরবমণি হইয়া আলোক বিকীর্ণ করুক! বঙ্গভাষার অন্তঃসুপ্ত প্রভূত সামর্থ্য এবং উহার মহনীয় সম্ভাব্যতায় আশান্বিত হইয়া আমাদের কয়জন বাণীসাধক এমন দীপ্ত ভাবে বলিতে পারিয়াছেন—

নব শশীকলা তুমি ভারত আকাশে,
নব ফুল কাব্যবনে, নব মধুমতী!

দেশের জন্য কবির এই অহমিকা-বিস্মৃতি তাঁহার কবিচরিত্রের 'মধু' হইয়া উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইয়াছে এবং 'চতুর্দ্দশপদী'তে আসিয়া উহাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই 'মধু' বঙ্গের অন্যকোন কবির মধ্যেই পাইব না। অনেকে যেই অহমিকা লইয়া কবিকৃত্য আরম্ভ

করেন, তাহা হইতে দীর্ঘজীবনেও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই! মধুসূদনের একটী পত্র দেখুন—"আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী লিখিয়া রাখ, অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় মহীয়ান্ হইবে! কালে, আধুনিক ইয়োরোপীয়-গণের ন্যায়, আমরা প্রাচীন 'ক্লাসিক' কবিগণকে অতিক্রম করিতে পারি বা না পারি, অন্ততঃ তাঁহাদের সমকক্ষ হইব। আমাদের সাহিত্যে ইদানীং এমনসমস্ত লোকের প্রয়োজন, যাহাদের প্রাণে উন্মাদনা আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত তপঃখেদ বরণ করিতে পারে। নিজেদের মধ্যে যদি প্রতিভা না থাকে, আমরা অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াই যাই। কখনও কি স্যাক্‌ভিলির নাম শুনিয়াছ? ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ ব্যক্তির 'গরবোডাক্' নাটকই প্রথমতঃ ইংরাজীতে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করে—পরকালে শেক্‌সপীয়র যে ছন্দকে মহীয়ান্ করিয়াছেন! বাতি জ্বালো—জ্বালো ভাই, নিজে জ্বলিয়া যাও!"

সারস্বতজীবনের এই নিষ্ঠা-পূত, বিনয়মধুর এবং বিশ্বাস-বরীষ্ঠ আদর্শ! এরূপ সহৃদয়তাও কবিজীবনের একটা স্বতন্ত্রসিদ্ধি, একটা দুর্ল্লভ সাহিত্যরস!

স্বদেশের সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়ে মধু-প্রাণ কবির এই দুরদৃষ্ট এবং অসম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুশোচনা চিরকাল ধিকি ধিকি করিয়াই জ্বলিতে থাকিবে। কারণ যেমন যায় তেমনটি আর হয় না। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের চারিটি বৎসর মাত্র কাজ! এই চারি বৎসরে একটা ঝড়ের মতই মধুসূদন ট্রাজেডী ও কমেডী, প্রহসন, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ওড্, সনেট ও মেলোড্রামা প্রভৃতির অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া এ সাহিত্যকে এক নিশ্বাসে প্রথম শ্রেণীর 'আধুনিক সাহিত্য' পদবীতে তুলিয়া ধরিয়াছেন! মধুসূদনের পূর্ব্বে শতবৎসরাবধি ইংরেজী সাহিত্যের

সহিত বাঙ্গালী-চিত্তের সংশ্রব ঘটিয়া থাকিলেও অপর কেহ যে এ কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই, উহাতেই মধু-কবির অতুলনীয় বিশেষত্ব এবং মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই মধু-সংঘটন না হইলে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতিও সম্ভবপর হইত কি না তাহাও চিন্তাস্থল হইয়া আছে। ইউরোপীয় সম্পর্কে আসিবার পর ভারতের অপর কোন জাতি যে বাঙ্গালীর ন্যায় আধুনিক সাহিত্যপন্থায় অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে কথার কোন অর্থ থাকিলে উহার প্রধান কারণ স্বরূপে মধুকেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। ভারতের অনেক জাতি সাহিত্যে আধুনিকতন্ত্র এবং ইউরোপীয়ভাব মধুপথ হয়ত এখনো খুঁজিয়া পায় নাই। অমিত্রচ্ছন্দটিই ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মধু-প্রতিভার কতবড় আবিষ্কার—বঙ্গসাহিত্যে উহা কত বড় দান তাহা বুঝিতে চাহিলে, এ টুকু বুঝিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, ভারতের বহু প্রদেশ-ভাষা এখনও উহার ধ্বনি এবং কায়াপ্রাণের প্রকৃত রহস্যের ঠিক পায় নাই! এখনও বহু সাহিত্যে ছন্দ-ভগীরথের জন্ম হয় নাই! উহাতেই ধারণা হইবে, সে সকল সাহিত্য এখনও আধুনিক বাণি-পন্থা হইতে কতদূরে আছে। এখনও স্বাধীন ভাবুকতার মধুচ্ছন্দা ভাগীরথী নবজীবন এবং নব উপনয়ন দানে উহাদের উদ্ধার সাধন করে নাই। তাই, সুযোগ পাইলে মধুসূদন আরও-কত-কি যে করিতে পারিতেন, সেকথা চিন্তা করিতেই মন বিষাদে আক্রান্ত হয়। সৃষ্টিশক্তিশালী ভাবুকতার ওজন করিয়া বলিতে হইলে, মধু অপেক্ষা বৃহৎপ্রাণ ও সৃষ্টিশক্তিমান্ পুরুষ ত এ সাহিত্যে জন্মায় নাই! কবির নিজের কথাটীর পুনরুক্তি করিয়াই বলিতে বাধ্য হইতেছি—"Alas! born an age too soon!
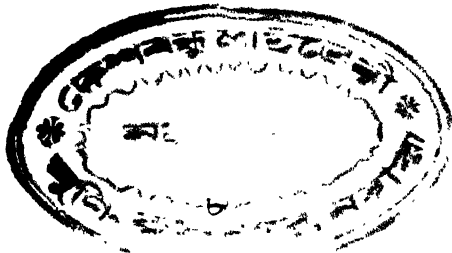
সাহিত্যের তরফ হইতে মধুসূদনের সাংসারিক জীবনগতির দিকে সম্যক্‌দৃষ্টি করিতে বসিলে আমরা কি পাই? কোন্ লক্ষণ মুখ্যভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? দুইটি বিষম সাংসারিক ভুল। প্রথম, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ; দ্বিতীয়, বিলাতে গিয়া ব্যবহারাজীব হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন। অন্তরাত্মার ধর্ম্মপিপাসা অপ্রতিবিধেয় হইয়া এবং তাঁহার বলাধান করিয়া যে তাঁহাকেহিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রেরণ করে নাই, উহা পরজীবনের দৃষ্টান্ত এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সাক্ষ্য হইতে উজ্জল হইতেছে। সাংসারিক সুবিধা-বুদ্ধি হইতে, যাহা অনেক সময়েই ধর্ম্মবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায় তাহা হইতেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ যেন তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে! ঐ পরিবর্ত্তনের মূলশক্তি সুতরাং ধর্ম্মসাধনা অথবা পরমার্থ-কামনা নহে—অর্থ কামনা। আবার বারিষ্টার হওয়ার মূলশক্তি ও অর্থকামনা। উভয় কার্য্যই যেমন তাঁহাকে হিন্দু-সমাজের ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তেমন তাঁহার আর্থিক অভাব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহাকে দাতব্যচিকিৎসা-লয়ের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য করিয়াছে; আবার তেমনি, তাঁহার আর্থিক অবস্থাকেও একান্তভাবে কেবল অসহায় আত্মচেষ্টার অধীন করিয়াই রাখিয়া গিয়াছে। অথচ, তাঁহার চরিত্রে অর্থধ্যান, অর্থতপস্যা বা অর্থসাধক পুরুষকার কখনও প্রবল ছিল না—এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃত স্বাধিকার ছিল না। তিনি অন্তরাত্মায় অতিপ্রবল ভাবুক, ভাবসাধক এবং অন্তরাত্মার স্বধর্ম্মেই 'সারস্বত' ছিলেন। এ অবস্থায়, যেমন সকল শ্রেয়ঃকামী সাহিত্যিকের বুঝা উচিত, যেমন মনুষ্য মাত্রের বুঝা উচিত,

তেমন মধুসূদনেরও বঝা উচিত ছিল যে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মনুষ্যের শিক্ষার আদিম এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—এই অধিকার বা স্বধর্ম্ম-নিরূপণ। আমি কে? আমি জীবনে কি করিতে পারি? জীবনের শ্রেয়ঃকামী পথিকমাত্রকেই আদিবন্ধে এ প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ব্বক জীবনক্ষেত্রে আপনার অধিকার এবং ব্যবসায় নিরূপণ করিতে হয়। অনেক মনুষ্যের, অনেক শক্তিশালী মনুষ্যের জীবন সংসারে বিফল এবং নিষ্ফল হইবার মূলতত্ত্ব হয়ত এইরূপ অধিকার-নিরূপণের অভাবমধ্যেই দেখিতে পাইব! ধর্ম্ম ত্যাগী হইয়াও, পিতার স্নেহবশে, তিনি ত একরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবেই পৈত্রিক বিত্তের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে উচিত কর্ম্মছিল—উহার উপর নির্ভর করিয়া, মধ্যবিত্ত-ভাবেই সাংসারিক জীবন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সারস্বতী সিদ্ধিকে লক্ষ্য করা। তিনি তাহা করিলেন না—ঐ অর্থ বারিষ্টারী উপার্জ্জনে অপব্যয় করিলেন! আন্তর ধর্ম্ম এবং ব্যবসায়কর্ম্মের বিরোধ মধুজীবনের উজ্জল অধ্যাত্ম লক্ষণ! তাঁহার সকল সাংসারিক ব্যর্থতার মূলতত্ত্বও হয়ত এ স্থানেই মিলিবে। দুইটি মহাডাকিনী নিত্যকাল মধুসূদনকে দুইদিকে ডাকিয়াছে! প্রচলিত কথায় বলিতে গেলে উহাদের নামই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। স্বভাবসিদ্ধ সারস্বতী প্রকৃতি, 'কবি'-প্রকৃতি ও পৈত্রিকী অর্থবিলাসিতা এবং ঐশ্বর্য্যলিপ্সা! হায়, মধুজীবনের সকল বিপদুৎপাতের মধ্যে এই Law of heredity, এই পৈত্রিক পাপ, পাপের উত্তরাধিকার এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত-ফল এত প্রবল এবং পরিস্ফুট যে, এমিলী জোলার কোনো নবেলী নায়ক-নায়িকার মধ্যেও বোধ করি এতটা পরিস্ফুট হইতেছে না! নব্যবঙ্গের প্রথমকবি পিতৃপুরুষীয় পাপের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। মানুষ মধুসূদন

পৈত্রিক পাপে অহর্নিশি পুড়িয়াছে; কবি মধুসূদন সকল জ্বালা-পোড়ার মধ্যেও আপনার স্বুবর্ণধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যের 'অমর' লোকে উঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে। এক জনের মধ্যেই দুইটি ব্যক্তি। যে পর্য্যন্ত এ-দুটি ব্যক্তি একযোগে, একান্তঃকরণে কার্য্য করিয়াছে, সে পর্য্যন্তই মধুসূদন কবি; সে সহযোগিতার মধ্যেই কবি মধুসূদনের জীবন-শক্তি এবং শক্তি-প্রয়োগের সাফল্য। মধুসূদনের জীবনতলে অর্থ-তুরাকাঙ্ক্ষা প্রবলতা এবং প্রকট আধিপত্য লাভ করার পর হইতেই কবির বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা, উৎকেন্দ্র গতি এবং অধ্যাত্মমৃত্যুর সূচনা। এরূপে সাংসারিক মধুসূদনের মৃত্যুঘটনার বহুপূর্ব্বেই কবি মধুসূদনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বঙ্গের অহমিকাধর্ম্মী কবিগণের মধ্যে মধুসূদন অন্যতম, ইহা পূর্ব্বে সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছি। মনুষ্যের পক্ষে যে অহংকার একবারে পরিত্যাগ করা কত কঠিন, তাহা দার্শনিকতার তরফ হইতে সকলেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন; এবং কবিগণের অহঙ্কারটিও সদয়ভাবে সহ্য করিতে পারেন। এক্ষেত্রে একেবারে ক্ষমার দাবী ত চলে না—সদয় বিচার। জীবনে পরম মধুরতা এবং লালিত্যকর্ষণার সতর্কসাধক কবিগণের অন্তঃপুরেই কি করিয়া অবিনয় এবং বর্ব্বরতার এপ্রকার একটা 'আগাছা' দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিয়া যাইতে পারে? কাব্যের সকল পুণ্যরস নষ্ট করিয়া উহার সত্যমূল্য এবং গৌরবের হানি করিতে পারে, এমন কি, ভক্তপাঠকের মনের আস্থা হ্রাস করিবা উহাতে একেবারে বিদ্রোহ এবং ঘৃণার বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে, এমন শত্রুপদার্থ ত জগতে আর নাই! এসকল রসিকব্যক্তি এমন বেরসিক এবং রসবিদ্রোহী কি করিয়া হইতে পারেন? এই দুর্ব্বলতাটুকুর প্রতি হৃদয়বান ব্যক্তিরই দয়া হওয়া উচিত। আমাদের সাংখ্যদর্শনের মতে

অহংকার ব্যতীত নাকি সৃষ্টিই হইতে পারে না! সাহিত্যে 'কাব্যের সৃষ্টি এবং প্রকাশের মূলেও হয় ত ঐ অহংকার পদার্থটি নানাদিকে এবং অনেকের বেলাতেই অপরিহার্য্য। এইদিকে, অনেক কবির মধ্যে, হয় ত একেবারে মদমত্ততাই প্রধান শক্তি! উহা এ ক্ষেত্রে the last infirmity of noble minds। কিন্তু, মধুসূদনের অহংকারে—বোধ করি তাঁহার পরিণাম জানি বলিয়া—যেন চোখে জল আসে! নবীনচন্দ্রের অহংকারে—উহা এত সরল এবং মোটা যে—হাসি পায়। আর রবীন্দ্র-নাথের অহংকার তাঁহার অনেক রচনার ভাঁজেভাঁজে, তাঁহার কথার মুনশিয়ানা স্বর ভঙ্গীর পরতে-পরতে যেন বৃশ্চিকলোমে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া স্পর্শমাত্রই সচেতন পাঠকের অধ্যাত্মদেহে বেদনা জন্মাইতে থাকে! বলিতে কি, এ সমস্ত পাঠকের ঘোর অধ্যাত্মশত্রু; এবং এ স্থলেই হয়ত মনুষ্যরসনায় তাঁহাদের কবিত্বের অমৃত মধ্যে একটুকু কটুতা আছে। ইহার মধ্যে হয়ত একটা উৎকেন্দ্রিক রুক্ষতা আছে—একটা সৌজন্য-মিষ্টতা এবং লালিত্যেরও অভাব আছে, যাহা হেয় না হইয়া পারে না। অনেকের সঙ্গে সামাজিক উলমিলন এবং আলাপ ব্যবহারের সময়েও হয়ত এই অহংকারটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থলে অকস্মাৎ 'দাঁড়া তুলিয়া' কামড় দিতে আসে! কোন কোন কবি একদিকে যেমন ভক্তগণের প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যদিকে বিপক্ষগণ হইতে তেমন হাসি-ঠাট্টা-টীট্‌কারী এবং মস্কারীও যে বহন করেন, উহার অধিকাংশ যে এই অহমিকা বা দম্ভের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিপ্রসব স্বরূপেই সামাজিকের চিত্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পুরস্কার এবং তিরস্কার উভয় অসাধারণ! সরস্বতীর অন্যকোন বিভাগের সেবকাদৃষ্টে উহার বিংশতিতম অংশও ঘটে না। এসকল অসাধারণ ব্যক্তির হস্তে অনেক সময় যেন সাধারণ

শিষ্টাচারটুকুই প্রত্যাশা করা চলে না! কেবল নির্ব্বিকল্প ভক্তিমান্ এবং পূজারী হইয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই বুঝি এই বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম আশা করা যায়। কিন্তু উপায়ান্তর আছে কি? এরূপ বেদনা এবং শত্রুতার দিকে কোমড় বাঁধিয়াই ত তাঁহাদের সঙ্গ করিতে হইবে! আর মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় সাহিত্যে নানাদিকে অভিনব এই অহংবাদ, আধুনিক কবিতার এই আসুর ধর্ম্ম, এই টাইটানিক আদর্শ! ইহার প্রধান ভিত্তিটাই বহুস্থলে যেন অভিমান! ইঁহাদের 'মধু' উপভোগ করিতে হইলে, সুতরাং 'হুল' টুকুও সহিয়া লইতে হইবে। এ সকল মহানুভব ব্যক্তিকে স্বদোষ বিষয়ে একেবারে অচেতন বলাও ত চলে না। অকপট মধুসূদন অনুতাপ করিয়াছেন "মাৎসর্য্য বিষদশন কামড়য়ে অনুক্ষণ"; রবীন্দ্রনাথও যেন চীৎকার করিয়াই উঠিয়াছেন—

> "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।
> সকল অভিমান হে আমার ডুবাও চোখের জলে!"

দেখা যাইবে, জানিয়া বুঝিয়াও স্বদোষক্ষেত্রে তাঁহাদের হাত নাই। দেখিবেন, ভগবৎ প্রার্থনার মধ্যে, চোখের জলের পশ্চাতে উক্ত অভিমানটাই যেন ফিরিয়া উঁকি দিতেছে! উহা যেন ভক্তির অশ্রু নহে—আহত অভিমানের বিদাহ জনিত অশ্রু! অভিমান ত ছাড়ে না! এই অভিমান এবং সংসারের বিভিন্নরুচি মনুষ্যের বিরুদ্ধতা ও বিপক্ষতা হইতেই সুতীব্র 'অপমান'-বুদ্ধি এবং 'অবজ্ঞার' জ্বালা অনেককে ভগবৎ সান্নিধ্যেও যেন শান্তিলাভ করিতে দেয় না! ফিরিয়া ফিরিয়া, মর্ম্মশূল জাগাইয়া রাখিয়া নীচের দিকেই টানিতে থাকে! কবি-কৃত্যের মধ্যে, কবির ব্যবসায়ের মধ্যে হয়ত এ স্থলেই প্রধান অধ্যাত্ম-সঙ্কট! কবি এবং ঋষির মধ্যে এস্থলেই যেন বিজাতীয়তার দুরতিক্রম্য

ব্যবধান। এই চেতঃ-খিল ছাড়াইতে পারিলেই হয়ত কবিগণ ঋষিত্ব লাভ করেন।

যাহোক, আমরা যাহাকে 'অহংকার' বলিয়া আসিয়াছি, আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে, উহারই ভদ্রজনোচিত আধুনিক পরিভাষা—আত্মাদর। এই অহংকার প্রকুপিত হইলে মনুষ্যকে বিনাশ করে সত্য, কিন্তু সাম্য-অবস্থায় সংসারপথে তাহাকে নানামতে রক্ষাও করিয়া থাকে।

বলিতে পারি, উক্ত অহংকার টুকুই সংসারবর্ত্মে দরিদ্র মধুসূদনের প্রধান বল ছিল এবং উহাকে হারাইয়াই তাঁহার অধঃপতন। তিনি বাণীপুত্র, লক্ষ্মীপুত্রগণকে ঈর্ষ্যা করিয়া আপনার কৌলিণ্যলাঘবরূপ সেই যে মহাপাতক তিনি করিলেন, সমস্ত পরজীবনে তিনি উহার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন বলিলেই যেন তত্ত্বকথা বলা হয়। মধুজীবনের মধ্যে অন্য সমস্তই লঘু পাপ, কেবল ইহাই অতিপাতক বলিয়া আমরা মনে করি। লক্ষ্মীর পুত্রগণকে ঈর্ষ্যা! তাঁহার সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং একদা কবিত্বশক্তির একেবারে বিলোপ উক্ত অতি-পাতকের উত্তর ফল! তিনি যতকাল ট্রান্স্‌লেটর ছিলেন, তাঁহার অভাব কম ছিল। যেমন বলিয়া আসিয়াছি, সাহিত্যসেবী মাত্রকে আদৌ সাংসারিক অভাববোধ হ্রাস করিতে হয়—উহাকে সারস্বত জীবনের প্রধান 'স্বতঃসিদ্ধ' বলিয়া ধরিতে হয়। অভাব অধিকন্তু অভাববোধ অল্প ছিল বলিয়াই তিনি অপেক্ষাকৃত নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্কলুষ মনোজীবন যাপন পূর্ব্বক 'কবি মধুসূদন' হইতে পারিয়াছিলেন; তিনি মানসসরোবরের বাণিচরণবিলাসিনী ভাবুকতার শুক্লপদ্ম চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন! উক্ত পাতকের পরেই যেন সরস্বতী-মাতা প্রিয়পুত্রের নিকট হইতে পরমদুঃখে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন! তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের সারস্বত ফল চিন্তা করিলে

এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধনীদরিদ্র-ভেদ মনুষ্যমনের অভাববোধের মধ্যেই নহে কি? এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে তাহার মত দরিদ্র যে কেহ নাই! বাণীপুত্র মধুসূদন নিজের চিত্তে লঘু এবং দরিদ্র হইয়া পড়াতেই তাঁহার পাতিত্য ঘটিয়াছিল। বিলাতগমণের পর হইতে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভা কাহিল হইয়া, নবনব ক্ষেত্রে ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধিলাভে অশক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুভদ্রাহরণ ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি কাব্যের যে পরিমাণ খশড়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারি যে উহাদের সঙ্কল্পিত রচনা কেন অগ্রসর হইতে পারে নাই! মেঘনাদ এবং বীরাঙ্গনার পর মধুসূদন ভাবুকতাব কোন প্রৌঢ়তর ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে পারেন নাই; হয়ত, স্বভাবধর্ম্মে তাঁহার ক্ষমতার লাঘব বিশেষতঃ লাঘববোধ হইতেই উহাদের রচনা ব্যাহত এবং পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু, অনেকস্থলে ভাবচর্য্যা এবং ঐকান্তিক ধ্যানযোগের অভাব হইতেই কবিপ্রতিভা নবনব উন্মেষের ক্ষেত্রে দুর্ব্বল এবং অসমর্থ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিতে পারিব, ঐরূপে লক্ষ্মীর একান্ত সেবা হইতে হেমচন্দ্রও একদিন সারস্বত ঋদ্ধি হারাইয়া, বাহ্যিক অন্ধতা অপেক্ষাও ঘোরতর আধ্যাত্মিক অন্ধতার মধ্যে ন্যূনাধিক শোড়ষবর্ষকাল জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ঐকান্তিকতা হইতেই বরং নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা কিঞ্চিৎ অধিককাল বর্ত্তিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথও এখন যাবৎ—'পলাতকার' সময় পর্য্যন্ত—নিজের পথে, গীতি-কাব্যতার ক্ষেত্রে নব নব উপার্জ্জন করিয়া চলিতে পারিতেছেন। প্রতিভা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে; এবং জন্মসিদ্ধ কবিগণও সরস্বতীর কৃপা হারাইয়া একদা হৃতসর্ব্বস্ব এবং ভিখারী হইয়া পড়িতে পারেন। সরস্বতীর পথও "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। নিয়ত-

ভাবে জাগ্রৎ-চৈতন্যময় এবং অতন্দ্রিত থাকিয়াই যে এ পথে চলিতে হয়।

এই মধুসূদনের মধ্যে একটি বালক আছে! তাঁহার নিজেরই অপরিচিত, সুধামত্ত বালক! তাঁহার জীবনের মধ্যে বালকটিকে দেখিতেছি, তাঁহার কবিতার মধ্যেও সে বালকটিকে শুনিতেছি! তাঁহার অপরিসীম দানবিলাসিতার মধ্যে সেই বালক! যেমন অর্থদান, তেমনি হৃদয় দান! জীবনের সর্ব্ব অবস্থায়, সকল সুখদুঃখের মধ্যে, সকল গোয়ার্ত্তমীর মধ্যে আনন্দ-নর্ত্তনশীল সেই বালক! জগৎ-বৃন্দাবনের জীবহৃদয়বিহারী বংশীধারী সেই বালক! ভোলানাথের কৃতপুত্র, সুপথে-অপথে নির্ব্বিচারে বিচরণশীল অথচ উদাসীন প্রমথ-বালক! এ ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি সহকারে মধুসূদনের প্রবল চরিত্রতত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন—

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল কেশ।
ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায় ধরায় আসিয়া
কাঁদিয়া হইলে শেষ।
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন
জয়মাল্য শিরে পরি!

শিল্পী মধুসূদনের অনেক দোষ আছে—তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদ বধেই অনেক শিল্পাপরাধ আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও হয়ত ঐ সমস্ত চিনিয়া লইতে পারে। আমরা সে সমস্ত লইয়া মাথা ঘামাইব না। কিন্তু ঐ বালকটিকে চিনিয়া উঠিতে পারেন কয়জন? মেঘনাদেও যেযে স্থানে বালকটীর কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়ভাবেই মধুর—সম্যক্ দেখা এবং বোঝারও বহির্ভূত!

আমাদের নিজের হৃদয়কন্দরবাসী অনির্ব্বচনীয় নিত্যবালকটিই উহা চিনিয়া উঠিতে পারে। এ স্থানেই মধুসূদনের প্রকৃত কবিত্ব—অননুকরণীয়, অমর কবিত্ব! ইহাও সত্য যে, সংসার ঐ বালকটিকে জাঁতায় ফেলিয়া পিষিয়া মারিতে চাহিয়াছিল—পারে নাই।

কবি কে! যিনি চিন্তা করেন বুদ্ধির ভাষায়, প্রকাশ করেন হৃদয়ের ভাষায়। যিনি দ্বিভাষী। যাঁহারা কথা শোনামাত্র আমরা একপদে দুটী ভাষাই বুঝিতে পারি। যিনি যাদুকর—এক কথা বলিতে ওইরূপে দুটী-কথা বলিবার যাদুবিদ্যা যাঁহার আছে। আমাদের এই বালক, নিজের স্বীকারেই দার্শনিক নহে। মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য্যে এবং তত্ত্বপদার্থে কোনরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহার নাই বলিলেই চলে! এই বালক বন্ধুকে লিখিয়াছিল I hate philosophy. তাহার দৃষ্টি বৃহতের দিকে এবং মহৎভাব-পদার্থের বিকাশেই নিবদ্ধ। কিন্তু তাহার হৃদয় যেমন আপনার ভাবগতিব সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দে ছন্দ রাখিয়াই চলে, যেমন তাহার ছন্দ এবং ভাষাও ঐ আনন্দচ্ছন্দে মত্ত হইয়া এবং উহার তালে তালে পা ফেলিয়াই চলিতে পারে, তেমন আনন্দকে পরের হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহে সংক্রামিত করিয়াই চলিতে পারে! আনন্দমূর্ত্তি বালককে দেখা মাত্র সমপ্রাণতাব অবিতর্কিত সাধর্ম্ম্যেই আনন্দিত না হইয়া কে থাকিতে পারেন! উহার দিকে সপ্রেম দৃষ্টি না করিয়া এবং স্বয়ং বালকভাবেই আবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন এমন পাষাণহৃদয় সাহিত্যপথিক কে? মধু-কবিতার এই স্বতঃসিদ্ধ আনন্দমত্ততা এবং অনির্ব্বচনীয় সংক্রামনী শক্তির মধ্যেই উহার প্রকৃত কবিত্ব। মধু যেমন ক্ষুদ্রকবিতার কবি নহেন; তেমন তাঁহার কবিতায় অল্পপদ-পংক্তিতে অর্থধারণার শক্তিও খুব জবরদস্ত

নহে। এই বালক কোনপ্রকারে আত্মচিন্তক অথবা তত্ত্বচিন্তক না হইয়াও, কেবল ভাবুকতা ও ভাবানন্দের সৌভাগ্য এবং ভাবের সংযোগিনীশক্তির বলেই কবি—চিরকালের সম্ভজনীয় কবি। তাহার শিল্প-বুদ্ধি এবং শিল্পশক্তি সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক অবিকল থাকিতে পারিয়াছে।

সাহিত্য-রসিককে সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের ধারা পরিচয় করিতে হয়। ঐতিহাসিকের নেত্রে সাহিত্যে ভাবের নূতন ধারা, নব জীবন, নব আবিষ্কার, এ সকল মুখ্য কথা। মধু যেমন কাব্যে, নাটকে ও প্রহসন প্রভৃতিতে, উহাদের ছন্দ এবং আকৃতি-প্রকৃতির আদর্শে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তেমন, মধু-প্রবর্ত্তিত খণ্ড কবিতা এবং গীতিকবিতার যুগও যে এখনযাবৎ বঙ্গে চলিতেছে, উহা তাঁহার সনেটগুলি দৃষ্টেই ধারণা হইবে। আধুনিক গীতিকবিতা নানা ছন্দে কেবল সনেটেরই ভাবগত অথবা বস্তুগত বিকাশ। (মধুস্থদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির মধ্যে যে ভাবুকতা ও চিন্তাশক্তির দেখা পাই, যে সুস্থির ধৃতি এবং নিসর্গ ও মনুষ্য প্রকৃতির দিকে যে অবিক্লবা সহানুভূতি ও অবিকারী মস্তিষ্কের পরিচয় পাই, উহাদিগকে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে মহার্ঘ ও দুর্ল্লভ পদার্থ বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সমস্ত কবিতার মধ্যে কুত্রাপি ভাবোন্মত্ততা বা একদেশদর্শী আবিষ্টতা নাই। সাহিত্যের প্রাচীন মহাকবিগণের ভাবুকতার মধ্যে, তাঁহাদের দৃষ্টি এবং বাক্য-প্রণালীর মধ্যে যে-ই একটা বৃহৎ সামর্থ্য এবং সংযমের লক্ষণ আমাদের হৃদয় প্রত্যক্ষ করে, তাহা এ সাহিত্যে মধুস্থদনেই সর্ব্ব প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছে। উহা মধুস্থদনকে যেমন তিলোত্তমাসম্ভবে, তেমন মেঘনাদ বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনাতেও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ পথ-পক্ষপাতী ভাবোন্মত্ততা হইতে রক্ষা করিয়াছে। হেমচন্দ্রই মধুস্থদনের এই আন্তর ধর্ম্মের

প্রকৃত সহানুভূতিশীল উত্তরাধিকারী, এমন কি অনুকারী ছিলেন। হেমচন্দ্র যে সময়-সময় সংযম-ক্ষেত্রেই বরং অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাই আমাদিগকে দেখিতে এবং বুঝিতে হয়। ভাবুকতার সংযমশীল পৌরুষ এবং বীরধর্ম্মী সৌন্দর্য্যদৃষ্টিই মধুসূদনের শিল্পী-আত্মার প্রধান লক্ষণ। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এবং রবীন্দ্র নাথের গীতিকবিতা ও সঙ্গীতে আসিয়া এই ভাবুকতা যে কোন কোন দিকে বিহ্বলতা বিক্ষিপ্ততা এবং অতিরিক্ততা অবলম্বন করিয়াছে, হয়ত উক্ত পথেই স্থানে স্থানে গভীরতর বাবি-বিহারী হইয়া আমাদের সহানুভূতির দাবী করিতেছে, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। এই শিল্পতার দিকে দৃষ্টি করিলে, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র যেমন বিলাতী 'ক্লাসিক' আদর্শেব কবি, তেমন নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও 'রোমান্টিক' আদর্শের কবি বলিয়াই সংস্কার উদ্রেক করিতে থাকিবেন। চতুর্দ্দশপদীব বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপী, কালিদাস, কৃত্তিবাস, পরিচয় ১।২, কবি, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, আশ্বিনমাস, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশাকালে নদীতীবে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, বিজয়াদশমী, পৃথিবী, আমবা, মিত্রাক্ষর, শণি, শূন্যনাম্নী সুন্দরী, সমাপ্তি প্রভৃতি পাঠ করুন! বঙ্গদেশের মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের রঙ্গভূমিতে পূর্ণচেতন শিল্পবুদ্ধি এবং হৃদয় লইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন; সুতরাং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের পূর্ব্বশূরিগণের বিশেষবিশেষ মাহাত্ম্যে তিনি যেমন জাগ্রত আছেন, তেমন ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের সমাজ-সাহিত্য-নিসর্গের কোন সৌন্দর্য্যে অথবা মাহাত্ম্যেই তাঁহার হৃদয়দ্বার কোন দিকে অর্গলিত নহে! কবি প্রত্যেকের উপস্থিত বিশেষত্বই সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নেত্রে দর্শন পূর্ব্বক সুনিপুণ শিল্পসাধকের প্রণালীতে বিভাবিত করিতেছেন! সকল কার্য্য চূড়ান্তরূপে সমাহিত বা সুষমাময় হইয়াছে

কি না, সে বিচার করিব না। কিন্তু, শমতা, সমপ্রাণতা এবং সহানুভূতি! যাহা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে বা পরকালের কোন কবিতে সুলভ নহে, তাহাই যেন মধুর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে! পরকালের 'গীতি কবিতা' হয়ত মধু হইতে কোন কোন দিকে অগ্রগামী এবং সূক্ষ্মতর দেশগামী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, কবি-আত্মার ওই সৌন্দর্য্যবিহ্বল আনন্দের সুসংযত এবং সমশীর্ষী প্রকাশ! যাহা মধুসূদনে পাই, তাহা যে অন্যত্র দুর্ল্লভ! বঙ্গের অন্তরঙ্গে যে রাধা-আনন্দ আছে, যাহার দরুণ প্রথমেই 'কান্তসঙ্গীতের' উষাকীর্ত্তন পূর্ব্বক বঙ্গভারতী জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এই খ্রীষ্টান কবির চিত্ত তাহাও যেন অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়াছে! কোনদিকে অতিরিক্ততা না করিয়া শান্ত-সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং সংযত ভাবেই ধরিয়াছে! মধু কবির এই সুসংযত ভাব-চেতনা, এই সেন্টিমেণ্টাল না হইয়াও সৌন্দর্য্য-ধারণা—ইহাকে একেবারে অনন্য-সাধারণ বলিতে পারি। এইরূপ সংযম গুণেই কাব্য সাহিত্য সাংসারিক লোকের দৃষ্টিতে, নীতিধর্ম্মের 'সাধক'গণের দৃষ্টিতে যুবক-হৃদয়ের পক্ষে 'কুসঙ্গী' বিবেচিত না হইয়া পারে। এই সংযত এবং বলিষ্ঠ চিত্ত, দ্রঢ়িষ্ঠ স্নায়ুতন্ত্র— যাহা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অথচ আবেশধর্ম্মে কুত্রাপি আত্মবিস্মৃত নহে! মধুশিল্পীর এই শক্তি-সিদ্ধি, সবল শাক্ত আদর্শ, এই অপ্রমত্ত ভাব-শক্তি, এই সমশীর্ষতা—এই level headedness! এসমস্ত বঙ্গীয় কাব্যজগতে এখনো মধুসূদনের বিজয়ী বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই শিল্পি-বিশেষত্বের নিরূপণ সূত্রেই আমরা অন্যত্র বলিয়াছিলাম—মধুসূদন শাক্ত, হেমচন্দ্র শৈব এবং নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথ বৈষ্ণব।

শিল্পক্ষেত্রে এই সমশীর্ষতা এবং চিত্ত প্রসারের দরুণেই হয়ত শিল্পী মধুসূদনের কাব্যাদিতে স্বাজাত্য এবং স্বাদেশিকতার কোনরূপ গোঁড়ামী

লক্ষণ' বলীয়ান্ হইতে জানে নাই। ইহা নিশ্চিত যে, যেট রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং উহার উৎপীড়নার জ্ঞান হইতে উত্তরকালে হেম নবীন ও বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রেই স্বাজাত্য বা নেশনেলিজামের লক্ষণ প্রবল হইতে পারিয়াছে, উহা ইংরেজ-রাজত্বের ও বঙ্গে বিলাতী প্রভাবের সে যুগে তখনো সবিশেষ চৈতন্য অথবা প্রাবল্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রবল হইলে পাশ্চাত্যকর্ষণায় শ্রদ্ধাশীল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম-স্বীকারী কবির মধ্যে উহা কোন্ মূর্ত্তি অবলম্বন করিত, তাহাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু, মধুসূদন যে নিদানতঃ কেবল 'কবি মধুসূদন' ছিলেন, তিনি সাহিত্যের তপোবনে নিজকে যে নিবিড় অসঙ্গতায় স্থির রাখিতেই সমাহিত ছিলেন, নিজকে যে তিনি কেবল সর্ব্বমানবিক ভাবুকতার সাম্যক্ষেত্রে 'কবি'রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেই লক্ষ্য করিতেন, তাহা চিন্তা না করিয়াও গত্যন্তর নাই।

মনের উদ্ভাবনী শক্তি এবং হৃদয়ের সৌজন্য-সহানুভূতিময় প্রসার বিষয়ে ইহাপেক্ষা বড় প্রতিভা এ যাবৎ বাঙ্গালীর সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। বিধাতা যুবক-সেক্সপীয়র ও মিলটন-প্রকৃতির প্রতিভাকেই যেন এক-যুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন! উহার মধ্যে মিলটনের বীর্য্যবত্তা এবং কণ্ঠসমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুবক সেক্সপীয়রের বহুমুখিতা, পৌরুষ-তেজস্বী হৃদয়াবেগ, উদার সহানুভূতি এবং অমায়িক রসিকতার আভাসটিই নানাদিকে পাইতেছি। তবে এ সমস্ত সদ্‌গুণ-বীজ উচিতমতে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এলিজাবেথ-যুগের কবিগণের ন্যায় নাট্যক্ষেত্রেই উড়িবার মতন কবিত্বের পাখা মধুসূদনের ছিল—কেবল বঙ্গসমাজ এবং বাঙ্গালার সাহিত্য-আকাশে তখনও সেরূপ পাখা লইয়া উড়িবার মতন অবকাশ ছিল না। একটু পাখা মেলিতে এবং নড়িতে-চড়িতে পারিলেই তাঁহার মধ্যে সেক্সপীয়রের

তীক্ষ্ণচরিত্র সৃষ্টি, ভাবুকতার বিদ্যুৎবৃত্তি এবং পরিপূর্ণ গঠনশক্তি ছিল কিনা পরীক্ষা হইতে পারিত! মধুসূদনের নাটকীয় রীতির প্রধান পরিচয় —অবলম্বিত বিষয়বস্তুতে তাঁহার সহানুভূতি, অমায়িক হৃদয়যোগ— অবিকৃত এবং নিরভিমান সহযোগ। নবীনচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি, তাঁহাদের বিষয়বস্তু যতই প্রাচীন বা দূরবর্ত্তী অথবা বিভিন্নক্ষেত্রী হউক না কেন—কথনও যেন ভুলিতে পারেন না যে তাঁহারা উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, আপন উদ্দেশ্যতন্ত্রী কবি বা দার্শনিক। তাঁহাদের নাটকীয় চেষ্টাতেই, তাঁহাদের চাল চরিত্রে, কথাবার্ত্তায়, ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে স্ব স্ব ভাবুকতার বিশিষ্ট অভিমান ফুটিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মধুসূদনের নাটকীয় সহানুভূতি এত প্রবল ছিল যে, ব্রজাঙ্গনায় বা বীরাঙ্গনায় তিনি যেই 'বহুরূপী খেলা' খেলিয়াছেন উহাতে অমিত্রচ্ছন্দের 'মধুসূদনী গন্ধ' টুকুন ব্যতীত শিল্পীর অপর কোন ব্যক্তিত্ব-পরিচিহ্ন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বলিতে হয় যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার যে জাতি এবং কৌলীন্য দেখাইয়া গিয়াছেন—এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্য কোন কবি উহার 'মেল' অথবা সাদৃশ্য দেখাইতে পারেন নাই। তিনি শিল্পের যে ঋজু-মধুর ভাবুকতার পথ, স্বাভাবিকতার যে মধুপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, উহার প্রকৃত কোন উত্তরাধিকারী কিংবা স্বাধীন বৃদ্ধিকারী এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জন্মে নাই। দুঃখকে এত ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিয়া ট্রাজিডী রচনাকরার স্বাভাবিক যোগ্যতা, অনম্যমেরুদণ্ডী বীর-জীবনের নিদারুণ অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রনা এবং মৃত্যুবিজয়ী বিনিপাত অঙ্কিত করিবার এমন শিল্পক্ষমতা অপর কোন বঙ্গ কবিই লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে যখন মনোবৃত্তি সমূহের আগ্রহ সতেজ থাকে, অন্তরাত্মার গ্রাহিকা শক্তি ও পরিপাকের ক্ষমতা যখন তীব্র ও সচেতন থাকে, তখন যদি কবির অদৃষ্টদেবতা একবার তাঁহাকে সত্যজীবনের সর্ব্বরসের সদাব্রতে স্বয়ং-কর্ত্তা অথবা

ভোক্তা হইবার অবসর দেন, জীবনের সত্য-অনুভূতির বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পথেই তিনি যদি অন্তরাত্মার সর্ব্বতোমুখিতা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবিত্বের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা সৌভাগ্যযোগ আর নাই! স্বয়ং জ্বলিতেপুড়িতে হইলেও কবির পক্ষে উহাই সৌভাগ্য। মধু-জীবনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি, জীবনদেবতা তাঁহাকে সত্য-শিক্ষার সে মাহেন্দ্রযোগ দিয়াছিলেন; হৃদয়রক্তের বিনিময়েই তিনি কবি হইবার যোগ্যতা-পাশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সত্য-বুদ্ধি এবং হৃদয়ের প্রসার, সর্ব্ববিধ অবস্থা অথবা ঘটনায় নিপতিত মনুষ্যের সহিত সহানুভূতি করিবার শক্তি এবং সৃজনী শক্তিও সামান্য ছিল না। ঘটে নাই কেবল উপযুক্ত ভূমি এবং অবস্থার অনুমতি। নাট্যক্ষেত্রে সৃষ্টি-চেষ্টায় ভাব-তন্ময় হইবার জন্য অদৃষ্ট-দেবী যেমন তাঁহাকে অবকাশ দেন নাই; সামাজিক পরিবেষ্টনীকেও তাঁহার সহকারী করেন নাই; ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা ছন্দ এবং প্রযোগ প্রণালী পর্য্যন্ত সহজলভ্য করেন নাই। কবিকে সমস্তই 'করিয়া কর্ম্মিবা' লইতে হইয়াছিল! সেকস্পীয়রের পূর্ব্বে যেমন চসার স্পেন্সর মার্লো ছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যে মধুসূদনের স্বক্ষেত্রে তেমন কোন পূর্ব্ব-শূরি ছিল না।

মনুষ্যজীবনের এই যে অপরিহার্য্য দুঃখতত্ত্ব, সংসারে মহৎ-জীবনের পক্ষেই অধ্যাত্মতঃ অপরিহার্য্য এই যে ভীষণকরুণ দুরদৃষ্ট—ইহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবি-প্রতিভার সামর্থ্য এবং কৃতিত্ব পরীক্ষার স্থল! উহাই দেবতার ইচ্ছা বা Fate আদর্শ-বাদী গ্রীককবির মধ্যে আসিয়া প্রমীথিয়স্, ইডিপস্, আন্তিগণ এবং আজেকস্ রচনা করিয়াছিল; গ্রীকপরিচয় প্রভাবে ওই দুঃখ-দৃষ্টিই মনুষ্যজীবনের পাপপুণ্য-সমর এবং পুরুষকার ও ঘটনাসংঘর্ষের গভীর তত্ত্বদর্শী হইয়া ম্যাক্‌বেথ্ হ্যামলেট্, অথেলো এবং লীয়র রচনা করিয়া আসিয়াছে; আধুনিক যুগে, খ্রীষ্টানী

আদর্শের প্রজ্ঞা লাভ করিয়া উহাই নবেলের ক্ষেত্রে Toilers of the sea এবং ঝেনোনী প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। ভারতীয় হিন্দু-কর্ষণার পক্ষে উভয় দৃষ্টিভুমির সঙ্গেই সহানুভূতি করা কত সহজ এবং সুলভ তাহা পূর্ব্বে সঙ্কেত করিয়াছি। অদ্বৈতবাদী, জন্মান্তরবাদী, কর্ম্মফলবাদী এবং সকল অশুভ দৃষ্টান্তের মধ্যেও শুভতত্ত্বে দৃষ্টিশীল হিন্দুর চিত্ত গ্রীক এবং খ্রীষ্টান উভয়ের অপরূপ সামঞ্জস্য-ক্ষেত্রে আপনাকে স্থির করিয়াই ট্রাজিডী সিদ্ধি করিতে পারে—রামায়ণ মহাভারতের সমাধান মধ্যে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর সমক্ষে এই অতুলনীয় সামঞ্জস্যই প্রমূর্ত্ত হইয়া আছে। ভারতীয় আদর্শের এই মহনীয় সম্ভাবনাকে আধুনিক সাহিত্যজগতে অনুরূপভাবে প্রমূর্ত্ত করার কর্ত্তব্যটি এখন এদেশের আধুনিক শিল্পী মাত্রকে আহ্বান করিতেছে। সাহিত্যজগৎ প্রাচীনতন্ত্রে বীতস্পৃহ হইয়া, একঘেয়ে প্রাকৃতবাদে ঝালাপালা হইয়াই যেন নূতনত্বের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার ক্ষমতা এবং সঙ্গতি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই আছে। আধুনিক ইয়োরোপেও বরং প্রকৃত গ্রীক-শিষ্যতার পরিচয় পাই, এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হেবেলের ট্রাজিডী গুলির মধ্যে। যেমন গ্রীক আদর্শের, তেমন প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের ট্রাজিডীও কি হইবে? ধর্ম্মতার সংগ্রাম, অধ্যাত্মক্ষেত্রের ব্যক্তিত্ব সংগ্রাম—আত্মধর্ম্ম বা আত্মব্যক্তিত্ব রক্ষা করার জন্য অদৃষ্টের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম—আপাততঃ নিহত হইয়াও ধর্ম্মতার বিজয় লাভ—মৃত্যুর কবলগত হইয়াও আত্মধর্ম্মের অমৃত লাভ! ইহা উচ্চতম ট্রাজিডীর এবং মহত্তম কবি-প্রতিভার সাধ্য বিষয় নহে কি? এই মহাকর্ম্ম যে মধুসূদনের ট্রাজিডী-প্রতিভার বীজশক্তির সুসাধ্য ছিল, মেঘনাদ কাব্যের সমাধান তাহাই প্রমাণিত করে। উহা সংসাধিত হইতে পারে নাই। সুতরাং গ্রীক আদর্শের মহতী কারুণ্যগাথা এবং

উচ্চজাতীয় কাব্যের বিষয়ে বা উচ্চতম ধর্ম্মতা-সংগ্রামের নাট্যট্রাজিডির বিষয়েও মধুসূদনের বংশাভাবের তত্ত্বই বরং দেদীপ্যমান হইয়া আছে।

নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও মধু যেই কবিত্বশক্তির সংযোগ করিয়াছেন উহাতে যুবক শেক্ষপীয়রের আত্মীয়তা গন্ধ পাইতেছি। শব্দ সমষ্টির মধ্যে মধু যে আনন্দ সংগ্রহ করিতে জানিতেন, উহা মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে কেবল কালীদাসাদির মধ্যেই পাওয়া যায়। মধুর এই শব্দ-চিত্রের এবং শব্দ-সন্ধানের প্রবৃত্তিকেও নব্য বঙ্গের অপর কোন কবি অনুসরণ করিতে, কিংবা উহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সে দিকে যান নাই; রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন পথে আপন সাহিত্য-জীবনের অতুলনীয় সার্থকতায় উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গভাষা সোজাসুজি ভাবে কতদূর ধরিতে পারে, কতদূর পর্য্যন্ত ভাবকে "মূর্ত্তিমান্" করিতে পারে, বঙ্গভাষার আর্য্য-অংশের শক্তিই বা কতদূর, তাহার পরীক্ষা মধুসূদনের পর আর ঘটে নাই বলিলেই হয়। মধুসূদন যে বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় ছন্দশিল্পী ও বাক্যশিল্পী, তাহা কখনও অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না; ছন্দশিল্পী মধুসূদন বঙ্গভাষার অন্তরঙ্গ শক্তি, উহার আর্য্য অংশের এবং দেশীয় অংশের সামর্থ্য কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দের ও নবনব মিশ্র ছন্দগুলির সমাধান এবং ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। এক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তরকারী যুগপুরুষ এই কবি! একটা জাতির হৃদয়দ্বার অপূর্ব্ব-তর্কিত শক্তিপথে অবারিত করিবার সৌভাগ্য-গৌরবেই পূজনীয়পদে অধিষ্ঠিত কবি! বঙ্গাভিধানের ক্ষেত্রেও, উহার নানা সমস্যার সমাধান বিষয়ে দৃঢ়সবল উন্নতি-দৃষ্টি এবং উন্নতির আদর্শেই নিত্যসচেতন কবি! যেমন বলিয়া আসিযাছি, ভাবকে পরিস্ফুট মূর্ত্তিদান করাই সাহিত্যজগতে সংস্কৃত কবিগণের প্রধান মাহাত্ম্য। ভারতীয় ভাব-

বুদ্ধি, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম্ম—সমস্তই মূর্ত্তিবাদী! একদিকে মহা অদ্বৈতবাদী হইয়াও ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ভাবকে মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য 'পরিকল্পনায়' স্থির করিতে এবং স্থায়ী করিতেই চাহিয়াছে। সঙ্গীততন্ত্রের অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয় রাগরাগিনীকেই যেরূপে মূর্ত্তিদান করিতে চাহিয়াছে! বলা বাহুল্য, সকল শিল্পতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা, এই মূর্ত্তি! সকল কারিগরির প্রধান সঙ্কটসমস্যাও মূর্ত্তি নিরূপণের ক্ষেত্রে। মূর্ত্তি ব্যতীত কোন শিল্পই স্থায়ীভাবে দাঁড়াইতে পারে না। সেই আর্য্য মাহাত্ম্যের প্রকৃত উন্নতিশীল উত্তরাধিকারী মধুসূদনের পর আর মিলে নাই। মধুকবির এই পৌরুষনিষ্ঠ রসানন্দ এবং ভাবের রসানন্দমধুর প্রমূর্ত্তিবাদ হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ইদানীং দূর হইতে দূরতর হইয়াই চলিয়াছে!

তথাপি, স্বীকার করিতে হয়, মধু হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্যই মানুষের একজীবনের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার প্রত্যক্ষ উপার্জ্জনগুলিই মধুসূদনকে অমর করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অমরপদবী একটা স্বতঃপ্রমাণিত উজ্জ্বল পদার্থ। উহা কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্ম্মধ্বজার উপর সংস্থাপিত নহে যে, ধর্ম্মরুচির পরিবর্ত্তনে উহার মূল্য কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইবে; উহা এমন কোন দার্শনিক অথবা সামাজিক সমস্যাভঞ্জনের প্রতিজ্ঞা অথবা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে না যে, অদ্যকার দুর্ল্লভ সত্য আগামীকল্য মামুলীকথা বা 'পচা কথা' হইয়া যাইবে। উহা মুখ্যতঃ মনুষ্যহৃদয়ের নিত্যসত্য স্থায়ী ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই হয়ত সাহিত্য-দার্শনিকগণ কাব্যে স্থায়ীভাবের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন! মেঘনাদবধ মনুষ্য-হৃদয়ের এমন একটা চিরস্থায়ী ভাব-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বাঙ্গলাভাষী

মনুষ্য আছে, এবং ঐ মনুষ্যের মধ্যে হৃদয় বলিয়া পদার্থ আছে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের মধ্যেও দুরদৃষ্ট এবং দুঃখ-দুরবস্থার উৎপাত আছে, পুরুষকারের পরাজয় এবং সর্ব্ববিনাশী নিস্ফলতা আছে, সে পর্য্যন্তই মধুসূদনের মাহাত্ম্য নষ্ট হইতে পারিবে না। সে পর্য্যন্ত ওই মেঘনাদ বধটি পাঠ করিয়া, মানুষ কাঁদিয়া কাঁদিয়াই মধুসূদনকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবে।

মধুসূদন শিল্পের ক্ষেত্রে ফিলজাফীকে ঘৃণা করিয়াছেন। কথাটা বুঝিতে পারিলেই আমরা 'কবি' মধুসূদনকে প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারিব। মধুসূদন চিন্তা-শিল্পী নহেন, ভাব-শিল্পী। তিনি এক্ষেত্রেই প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের বংশ-সূত্রে দাঁড়াইয়াছেন। বাহ্যিক শিক্ষা-দীক্ষায় পুরা দমে ইয়োরোপীয় হইলেও মধুসূদন যে স্বভাবতঃ এবং অন্তরঙ্গতঃ 'বাঙ্গালী কবি' ছিলেন, উহা তাঁহার শিল্প-প্রণালীর 'জাতি' বিচার করিলেই বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালী কবিগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ চিন্তা (Thought) অপেক্ষা ভাবের (Sentiment) দিকেই সমধিক প্রবণতা দেখাইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস হইতেই নাভি-সম্পর্কে মধুসূদন তাহার কবিত্বের রক্ত-সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবিগণ—বিশেষতঃ কৃত্তিবাস ও কাশীদাস—যে চিন্তা অপেক্ষা ভাবকেই মুখ্য করিয়া আর্য্যভারতের মহাকাব্য দ্বয়কে 'বাঙ্গালা মূর্ত্তি' প্রদান করেন, তাহা সাহিত্যচিন্তক মাত্রকেই স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিতে হয়; আরও দেখিতে হয় যে, ভাবুকতাই হয়ত শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালিত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যেও, হয়ত এখন যাবৎ, চিন্তাজীবী অপেক্ষা ভাব-জীবীর সংখ্যাই অধিক আছে; এবং উভয়ের সমুচ্চ সামঞ্জস্য-সাধক শিল্পীর সংখ্যাও হয়ত এখন যাবৎ পরিমিত আছে। মনুষ্য মধ্যে সাধারণতঃ কাহারও idea, কাহারও বা sentiment

প্রবল। হয়ত উহা রুচিভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে—সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোনরূপে শ্রেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতার নির্দ্ধারণাও হয়ত দাঁড়াইতে পারে না। দেখা যা'ক, ভাব-শিল্পী কি করিয়া ফিলজাফী ঘৃণা করিয়া পারেন! কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে ফিলজাফীর প্রধান সামর্থ্য কি লইয়া? পদার্থের প্রাণতত্ত্বে যোগ বা অভিনিবেশ। পদার্থের যেই লক্ষণে কবি পাঠককে অভিনিবিষ্ট করিতে চাহেন, তাহাতে স্বয়ং দৃষ্টিসিদ্ধ হইয়া, উহার সঙ্গে স্বয়ং যুক্ত হইয়াই পাঠককে অনির্ব্বচনীয়ভাবে সংযুক্ত করিবার শক্তি! পদার্থ যেই অধিপতি লক্ষণে পাঠকের মনে মুদ্রা লাভ করে—স্ফুট প্রতীতির উৎপত্তি করে—অথবা কবি উহার যেই লক্ষণে পাঠককে সুপ্রতীত করিতে লক্ষ্য রাখেন, তাহাকে ধরিতে পারা লইয়াই ভাবুকতার প্রধান শক্তি। কবি স্বয়ং পদার্থ-তত্ত্বে যুক্ত হইয়া, ভাষা দ্বারে, যে-কোন প্রণালীতে পাঠকের মনে উহার স্ফুটপ্রত্যয় উদ্রেক করুন না কেন, উহা পারিলেই তিনি সত্যের বর্ণনায় কবি-সিদ্ধি লাভ করিলেন। এ ক্ষেত্রে কেবল ফলেই প্রমাণ—ফলেন পরিচীয়তে। প্রকাশের ক্ষেত্রে কবির এই প্রত্যয়-সাধনের উপায়টির নাম দিতে পারা যায়—ভাষার 'মন্ত্র শক্তি'। সুতরাং, কবিত্বের প্রধান লক্ষণটিই যদি রস-প্রত্যয়—বা আধুনিকের ভাষায়—সৌন্দর্য্য-প্রত্যয় এবং সৌন্দর্য্যের অনুভাবনা হয়, তন্মধ্যেও এই স্ফুটনীশক্তি এবং ভাষার মন্ত্র-সিদ্ধির কার্য্যই ত দেখিতে পাইতেছি!

এখন, মধুসূদন ভাবুকতার এই স্ফুটনীশক্তি এবং ভাষার মন্ত্রশক্তি বিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন, ফিলজাফী ঘৃণা করিয়াও যে উহা আত্মসিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যগুলি প্রতিপদে তাহা প্রমাণ করিবে। মধুসূদনের বর্ণনা প্রণালীর, বিশেষতঃ তাঁহার করুণ বর্ণনা এবং বিলাপ গুলির অভ্যন্তরেই দৃষ্টি করুন! এই বর্ণনার বিশেষত্ব কি?

উহার নাম দিতে পারি, বৈচিত্তভাব। রাস্কিন যাহাকে Pathetic fallacy বলিয়াছেন, বৈষ্ণব রস-দার্শনিকগণের পথানুসরণে বলিতে পারি, উহার নাম 'বৈচিত্ত'। কবিগণ যেমন ভাষার স্ফোটশক্তির সাহায্যে পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা বা সত্য বর্ণনা করেন, তেমন রসাবিষ্ট মনের বিবর্ত্ত এবং বিকার বর্ণনার পথেও রসোদ্রেক করেন। পদার্থের বিদ্যমানে-অবিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানে-বিদ্যমানতার আরোপ করিয়া, অতীতের সুখ-দুঃখময় স্মৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা জাগাইয়া মধুসূদন কি সহজ ভাবে পাঠকের হৃদয়কে করুণাবিষ্ট করিতেছেন! কোন দার্শনিক তত্ত্বোদ্গার এই সরলতা এবং এই সহজ কারুণ্যের সমান উপপত্তি দান করিতে পারে না! মধুসূদনের যে-কোন করুণ বর্ণনার অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিয়াই বুঝিতেছি যে, কবি নিজের জন্মসিদ্ধ সহানুভূতি ও সত্যানুভূতির ভূমি হইতে এই ভাবযোগ এবং রসোদ্রেকের সারল্য (naivette) রূপী অসাধারণ ফল চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সারল্য আধুনিক তত্ত্ববার্তিক-গ্রস্ত যুগে একেবারে দুর্ল্লভ—ইহা প্রাচীন মহাকবি হোমর ও বাল্মীকিব্যাসের আত্মসিদ্ধি। ফিলজাফী না-ই-বা থাকিল! এবং কবিও নামটি না-ই-বা স্বীকার করিলেন!

অপরিসীম গ্রন্থ-পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মধুসূদনের মধ্যে যে একটা নবতা এবং রস-মধুর 'তাজা ভাব' আছে, একটা বালকত্ব-সুলভ লীলার লক্ষণ আছে, তন্মধ্যেই তাঁহার প্রধান কবিত্ব এবং তাঁহার মহাত্মতা। উহা ঠিক 'বুনো' নিসর্গের বা গিরি-নদী-সমুদ্রের এবং অরণ্যানীর 'তাজাভাব' নহে; কলিকাতা সহরের 'ইডেন' উদ্যানের কৃত্রিমতা-সজ্জিত তাজা লক্ষণও নহে। উহা নগরের ইট পাথর এবং গ্যাসালোক সম্পর্কের চৌহদ্দি হইতে বহু দূরে, ভাবুকতার

ভারতসমুদ্র-বক্ষে নবদ্বীপভূত নবীন ব্যক্তিত্বের নিত্যরস-নবীন এবং মলয়জশীতল শ্যামলতায় পরিস্ফুট 'তাজা' ভাবের লক্ষণ! এস্থলেই মধুসূদন, ক্ষিতি-পরিব্রাজক এবং বিশ্বরস-গ্রাহী হইয়াও, বঙ্গসাহিত্যের 'বাঙ্গালী কবি!' এই সবল সরসতার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার মধ্যে ভাবুকতার কৌলীন্য এবং কণ্ঠের অভ্যুন্নতি! মধু বাঙ্গালার গ্রামীন অথবা গ্রামনী যেমন নহেন, তেমন বাঙ্গালার 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' ও নহেন। যেমন বলিয়াছি, তিনি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বতা-দীক্ষিত এবং বিশ্ব-অধিবাসী বাঙ্গালী। কাব্যের রসাত্মা-বিষয়ে তিনি প্রাচীন ঋষি-পুত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের শিষ্য; শিল্পতন্ত্রে বস্তু এবং ভাবের সামঞ্জস্যময় প্রমূর্ত্তন এবং প্রযোগের প্রণালীতে তিনি হোমরের এবং হোমরশিষ্য ইউরোপীয় মহাকবিগণের পথানুবর্ত্তী। তাই, তিনি হোমরের বস্তুনিষ্ঠ পথে মেঘনাদ রচনা করেন; এবং হোমরশিষ্য ভার্জ্জিলের 'ইনীদ্' পথে 'সিংহলবিজয়' সূচনা করেন। ইয়োরোপের আধুনিক কবিতার যাহা প্রধান ঝোঁক অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে কবির আত্ম-প্রচার এবং আত্মভাবুকতা—সে বিষয়েও তাঁহার স্বল্পমাত্র সহানুভূতি। 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' প্রভৃতি কবিতার অভ্যন্তরে ওইরূপে বায়রনী দীক্ষা এবং বায়রনী অহং-সম্পর্কের লক্ষণটাই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রয়োগকলার এই 'বস্তুগত' রীতি এবং গ্রীক-আদর্শ গতিকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী অথবা ব্রাউনীং-জাতীয় আত্মিকতা এবং ভাবুকতার সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র সহানুভূতি অথবা মমতা-পক্ষপাত নাই। সৌন্দর্য্যের বস্তু-দৃষ্টি এবং রসাবিষ্ট তন্ময়তা বিষয়ে তিলোত্তমাসম্ভবের কবিকে বরঞ্চ ইংরেজী সাহিত্যের সেই 'আধুনিক প্যাগান' কীটস্ কবিরই সমধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে। সুতরাং, প্রতিভার 'জাতি' নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি যে, কবিগণের কুলপঞ্জী

মধ্যে মধুসূদন 'গ্রীক'! জন্মতঃ ভারতীয় হিন্দু ও শাক্ত এবং স্বীকারতঃ খ্রীষ্টান হইযাও, মধুসূদন তত্ত্বতঃ গ্রীক এবং প্যাগান। নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য-বাদ, যাহার মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-বাতিক-গ্রস্ত দার্শনিকতা, ছায়াবাদিতা, রহস্যবিলাস অথবা ধর্ম্মধ্বজিতা নাই, কোনরূপ ভাবোন্মত্ততাও নাই, অথচ যাহা কোনদিকে দুর্নীত, দুর্বিনীত অথবা শিল্পপাতকী নহে,—যাহা অকুৎসিত-কর্ম্মা, প্রকৃতিস্থ রস-ভাবে এবং সত্য-তন্ত্রে সংযত এবং সুস্থির—তাহা শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাকুল গ্রীক লক্ষণ। যে গ্রীক জাতির মধ্যে কোনরূপ ধাম্মিকতা অথবা ধর্ম্মান্ধতা ছিল না, যাহাদের মধ্যে কোন 'বাইবেল' ছিল না, অথচ যাহারা আপনাদের সহজ ও সরল দৃষ্টি এবং শিল্প-দৃষ্টিব সৌভাগ্যেই জীবনে শিল্পে এবং সাহিত্যে অসুন্দর এবং কুৎসিত হইতে সুরক্ষিত ছিল! সংসার এবং জীবনের প্রতি আদিম বালক-দৃষ্টির সৌভাগ্যেই সত্য-শিব-সুন্দরকে চিনিয়াছিল! এই গ্রীক লক্ষণ যেমন ভারতে, তেমন বঙ্গদেশের সাহিত্যতন্ত্রেও নানাদিকে অভিনব; বাঙ্গালীর 'শাক্ত' আদর্শের সঙ্গেই উহার সান্নিধ্য এবং নানা-দিকে সামঞ্জস্য। মধুসূদনও নাকি অনেক সময় বলিতেন—"লোকে আমাকে চিনিতেছে না, my writings are three-fourths Greek!" *

মধুসূদনের মধ্যে কোন্‌দিকে কি-কি অভাব আছে, বিশ্বসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে সমস্তকে একে একে নিরূপণ করিবার জন্য ইহা স্থান নহে। উক্ত প্রকার আলোচনা হইতে হয়ত কোন সুফল ও প্রত্যক্ষ করা যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে অভাবাত্মক প্রণালীর বা "নেতি নেতি" প্রণালীর দ্বারা বিশেষ কোন লাভ হয় না বলিয়া,

* মধুসূদনের এই মূল্যবান উক্তিটি, ৪ মাস হইল, তাঁহার সমসাময়িক বন্ধু অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর মহাশয় হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। লেখক।

উহাতে আমাদের উদ্দেশ্যও হয়ত উজ্জ্বল হইবে না। দার্শনিকতার আদর্শে, মধুসূদনের হৃদয় হয়ত 'পূর্ণ অভিষেক' লাভ করে নাই; বিশ্বের এই বহির্ম্মুখী সৌন্দর্য্য-কায়ার অন্তরালে, এই ছায়াপটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য ক্ষমতাও হয়ত তাঁহার যথেষ্টমতে প্রবল নহে। মনুষ্যহৃদয়ের গুপ্তগভীর রহস্য-রাজ্যে, মনুষ্যের জীবন মধ্যে অবস্থা ও ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়ার নৈতিক দ্বন্দ্ব রাজ্যে, সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম মৃত্যু এবং অমৃতের ঘাতপ্রতিঘাতময় আন্তর-রাজ্যে হয়ত মধুসূদনের শিল্পবুদ্ধির সচেতন অধিকার, সবিতর্ক এবং প্রশস্ত গতিবিধি নাই; মনুষ্যত্বের অধ্যাত্মক্ষত সমূহের জন্যও হয়ত তাঁহার হস্তে সবিশেষ অমোঘ সুধা-লেপ নাই; মনুষ্যজীবনকে দিব্যনেত্রে পরিদর্শন পূর্ব্বক ভেষজ প্রয়োগ করিবার জন্য কোন স্বতন্ত্র দার্শনিক পথেও তিনি হয়ত চূড়ান্ত উপনয়ন এবং উপায়সিদ্ধি লাভ করেন নাই। কিন্তু, মধুসূদন শিল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধকুলীনের সন্তান, কবিকুলে বনীয়াদি ভাবজীবিতা এবং ভাবুকতা-রক্তের কৌলীন্য যে তাঁহার জন্মসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। না হইলে তিনি এই সহজসুন্দর এবং সঙ্গপাবন ভাবযোগ কোথায় পাইলেন? ভাবতত্ত্বে নির্ব্বিকল্প নিরায়াস পথে যুক্ত হইবার শক্তি—যে যোগ লাভকরিলেই কবি স্রষ্টা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারেন সেই শক্তি—অতর্কসিদ্ধ ভাবেই যেন তাঁহাকে পাইয়াছিল! উহার গতিকেই তাঁহার কাব্যের ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে, উহার ছন্দ মধ্যে, ভাষার বাঁধুনীর মধ্যে মন্ত্রশক্তি আছে, যাহার সংস্পর্শে অনির্ব্বচনীয় এবং অবিতর্কিত পথেই পাঠক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়; যাহাতে তিনি কবি, হৃদয়বান পাঠক মাত্রেরই ভজনীয় কবি! তাঁহার সংস্পর্শ গঙ্গাজল এবং মলয়বায়ুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় শক্তিতেই শীতল এবং অন্তরাত্মার স্ফূর্ত্তিকর! এই জন্মকৌলীন্যের গতিকেই হয়ত তিনি নিজের

বিতর্কবুদ্ধির অনধিকৃত, উচ্চতর এবং মহত্তর ক্ষেত্রেও পাঠককে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছেন। যে গুণে অরণ্যের আমজাম এবং কামরাঙ্গা নিত্যপবিত্রা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় বিশেষধর্ম্মেই, সহরতলীস্থ ময়রার দোকানের মিষ্টান্ন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্ররসে নিত্যকাল হৃদয়গ্রাহী হইয়া আছে! উহা যেন স্বভাবে স্থিত মানবাত্মার স্বভাবপ্রিয় সহজ ফল! যেন সহরের কৃত্রিম উপবন এবং 'গরম ঘরের' আমদানীও নহে। মধু ফিলজাফী ঘৃণা করিয়া থাকিলেও, সাহিত্যে দার্শনিকতার যাহা প্রধান শক্তি—পদার্থের প্রাণ-তত্ত্বে অভিনিবেশ লাভ ও পাঠককে তন্মধ্যে অভি-নিবিষ্ট কবার শক্তি—তাহা যে তিনি স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই পাইয়াছিলেন! তিলোত্তমাসম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, মেঘনাদ! ইহারা কবির ওই স্বতঃসিদ্ধ ভাব-যোগের সহজকৌলীন্যেই বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল মহার্ঘ আসন লাভ করিতে থাকিবে।

মধুসূদনের সকল মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত মাহাত্ম্য, বলিতে হয়, তাঁহার ছন্দোরীতি স্বচ্ছন্দে পরিস্ফুট তাঁহার ব্যক্তিত্বটি! মধুসূদনের ছন্দের মধ্যে যে একটা মহাপ্রাণতা, সবলতা এবং উচ্ছাসময়ী পূর্ণতা আছে, উহাকে আমরা স্বশক্তিতেই একটা 'মহাভাব' বলিয়া অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উহার মাহাত্ম্য কোথায়? আধুনিক নিয়মের কোন বুদ্ধিতন্ত্রীয় সূক্ষ্মতা, স্ত্রীপুরুষের মনোবিকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক কোনপ্রকার ভাবুকতা, বহিঃপ্রকৃতি বিষয়েও কোনপ্রকার সূক্ষ্মতারসিক অভিনিবেশ, কোনরূপ Sentimentalism হয়ত উহার মধ্যে নাই; তথাপি উহা আপনার ওজনেই সাহিত্যক্ষেত্রে একটা মহাশক্তি! একটা পরমগম্ভীর অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! অতুলনীয় কবিত্বেরই নিদর্শন! এ কবিতা পাঠ কর—তুমি হয়ত পরম আদরে মনস্থ বা মুখস্থ রাখার উপযুক্ত কোন ভাব বা কথা উহার মধ্যে পাইলে না, কিন্তু তুমি সমুদ্র স্নান

করিয়া উঠিলে! এই সমুদ্রস্নানের ফল কি? তোমার অন্তরাত্মা একটা পরমগভীর উদাত্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসের সংসর্গ লাভ করিয়াই সরল, সবল, পবিত্র এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল! তোমার বুদ্ধি উৎসাহিনী, উচ্ছ্বাসিনী হইয়া তোমার শিরা উপশিরা শক্তিশালী করিল! তোমার অধ্যাত্ম-দেহও পেশল হইয়া উঠিল—উহাই তোমার সমুদ্রস্নানের অতুল ফল! উহা সহৃদয়-বেদ্য এবং ভাল করিয়া উহাকে বুঝিতে-বুঝাইতে পারাটাই হয়ত শ্রেষ্ঠশ্রেণীর সাহিত্য-দার্শনিকের কার্য্য। মধু-সংসর্গী পাঠকগণ অন্তরে অন্তরে উহা অনুভব করেন, হয়ত বাক্যমুখে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেই পারেন না। জগতের মহাকবিগণ সকলে অন্তরে-অন্তরে মানবাত্মাকে এরূপ মহাভাবে স্নান করাইয়া, উহাকে উল্লাসী, নিবেশী, বলিষ্ঠ এবং দিক্‌দিগন্তদর্শী করিযা তুলিয়াই সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হাজার মনস্তত্ত্বদর্শী সূক্ষ্মতায় কিংবা প্রকৃতবাদিতায় এ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। এই দিক হইতে দেখিবেন, বঙ্গের কোন কবিই হয়ত এ যাবৎ মধু-আত্মার সন্নিহিত হইতে পারেন নাই। যে গুণে মিল্টন ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকগণের, বিশেষতঃ উহার কবিগণেরই চির-পূজ্যতা লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যাহার দরুণ হাজার তত্ত্ববাদী আধুনিকতাও তাঁহার মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে পারিতেছে না—মধুসূদন যাহাকে Divine বা দিব্য মাহাত্ম্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন—মধুসূদন ও সে-জাতীয় একটি অসঙ্গ এবং অগম্য মাহাত্ম্যেই বঙ্গসাহিত্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন!

এই কবির সকল রচনার মধ্যে, তাঁহার ভাবে ভাষায় ছন্দে এবং ভঙ্গীতে নির্ব্বিশেষে ওতপ্রোত হইয়া যেই শক্তি-পুত্র, যেই ভাবজীবী, দুঃখ-সুখে ধৈর্য্যশীল, উদার ছন্দ-বিলাসী এবং প্রশস্ত বীর-হৃদয় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, উহার সামঞ্জস্যময় এবং একতা-অনুভাবক ব্যক্তিত্বেই

মধুসূদনের প্রধান মাহাত্ম্য! তাহাই বঙ্গসাহিত্যে অনন্য-সুলভ, তাহাই দুর্লভ এবং মহার্ঘ। তাহাই বাঙ্গালী নিত্যকাল অমৃতবুদ্ধিতে পান করিয়া বলীয়ান্ হইবে—"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!" দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশার পুতনারাক্ষসী দিবারাত্রি চুমুকে-চুমুকে বুকের রক্ত পান করিতে থাকিলেও, যে অমর প্রতিভাশিশুর হৃদয়তল-বাহিনী সুধার উৎসধারা কোনমতে শুকাইয়া তুলিতে পারে নাই, সেইরূপ অবিমিশ্র, বিকল্পবিরহিত, মনুষ্যের সহজদৃষ্টি-সমক্ষে অনাদ্যসুন্দরী, মনুষ্যহৃদয়ের প্রত্যগনুভব-সমক্ষে নিত্য-মুগ্ধকরী, ভাবময়ী সুধা। এ স্থলেই বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের মধুশক্তিময় এবং মৃত্যুঞ্জয় মাহাত্ম্য!

সম্পূর্ণ।